"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com
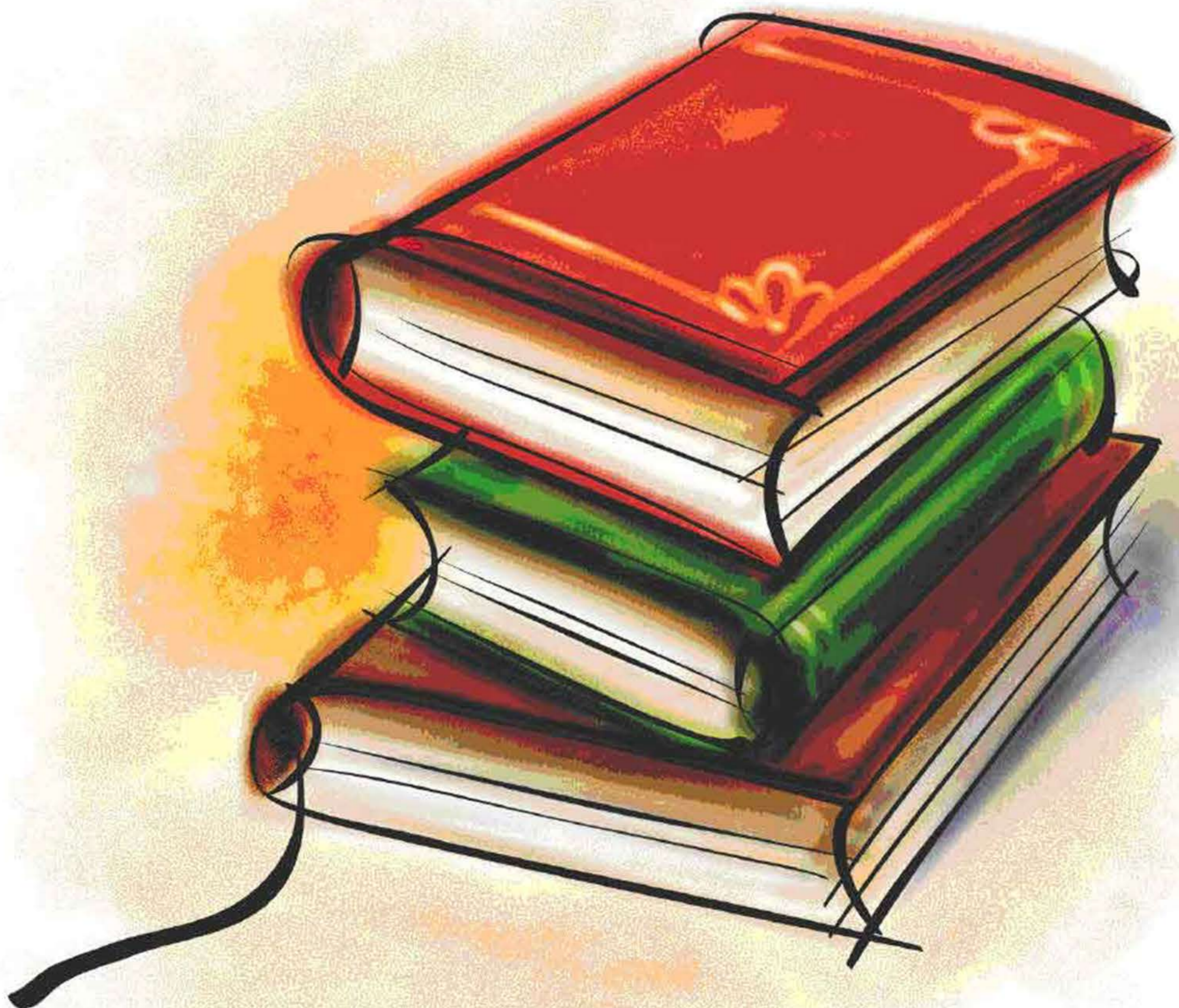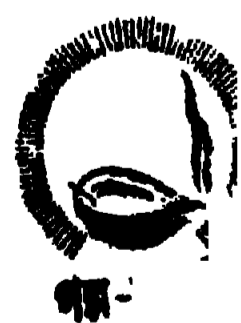
গল্প-ভারতী

ষোড়শ বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা । অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

বিশেষ আকর্ষণ—একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস : রবীন্দ্র-পাঠচক্র : রবীন্দ্র-যুগ : বাংলার চিত্রশিল্প (সচিত্র সংযোজন)

ভারতের গৌরব
ভারতের শাশ্বত প্রাণসত্ত্ব ও
সংস্কৃতি অন্তর্নিহিত আছে
তার শিল্পে, ভাস্কর্যে…
যা আজও বিশ্বের কোটি
কোটি নরনারীর মনে শ্রদ্ধা
ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪
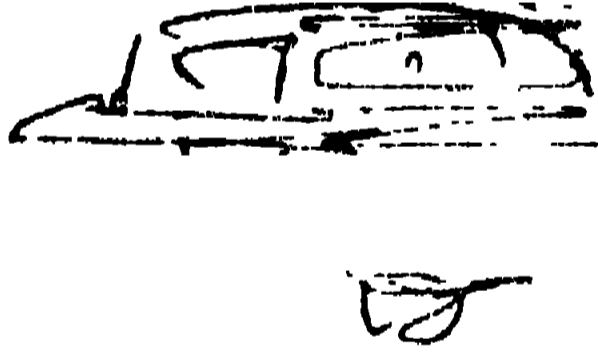
BHRINGOL
মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে
ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে,
ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

অগ্রহায়ণ—১৩৬৭

সম্পাদক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা! তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও … করে
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ

ঘরে ঘরে এর সমাদর

হাসিতে মুক্তা ঝরবে...

ডেন্টনিক

অ্যান্টিসেপ্‌টিক টুথপাউডার

দন্ত এবং মাঢ়ী সুস্থ ও সুদৃঢ় করিতে অদ্বিতীয়

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই
কানপুর

এই সংখ্যায় আছে

এই সংখ্যায় আছে

প্রসাধন জগতের গৌরব!
RANGA-JAVA
GLYCERINE
SOAP
রাঙ্গাজবা
গ্লিসারিন সাবান
• অপূর্ব্ব স্বচ্ছ
• সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
• অতুলনীয় সৌরভমণ্ডিত
অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ
সৌন্দর্য্য সাবান
GLYCERINE SOAP
রাঙ্গাজবা

শীত
কালেই
তো
সাজগোজ
৬.৯৫ - ৯.৯৫
জুপিটর
৭.৫০—১০.২৫
সাজগোজে মন দেবার সময় শীতকাল।
কোন পোশাকে ঠিক মানাবে,
কী রঙ হবে সেই পোশাকের,
তার সঙ্গে যাবে কোন ধরনের জুতো—
পরিপাটি পরিকল্পনার এই তো সময়।
নিজেকে রুচিবান বলে পরিচয় দিতে
এই তো সুযোগ। ফিটফাট সাজপোশাক—
নিমেষে এর আবেদন।
এরই উপর নির্ভর—
কি আশ্চর্য চোখে
লোকে আপনাকে দেখবে!
কমফর্ট
২২.৯৫
লংলাইফ
অক্সফোর্ড ১৫.৫০
ইরানী
১২.৫০
Bata
বাটা সু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

মেট্রিক পদ্ধতি

বহিঃশুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে
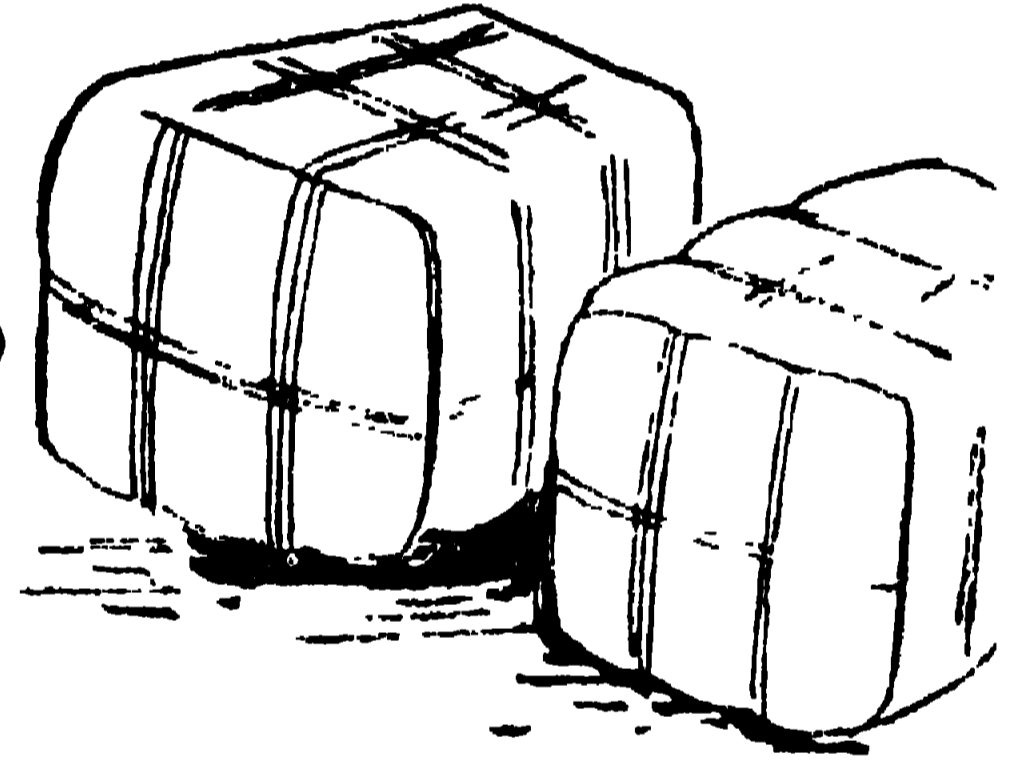
.... তারিখ থেকে বহিঃশুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপ কার্য্যকরী হবে। তখন থেকে মেট্রিক একক অনুযায়ী শুল্কের হার প্রকাশ করা হবে।

বর্ত্তমান হারকে যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী, সমতুল্য মেট্রিক এককে পরিবর্ত্তিত করা হবে।

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

DA 60/390

(GENERAL)
SOL'S-50'

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ
দি ওরিয়েণ্ট্যাল রিসার্চ্চ অ্যাণ্ড
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল
অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্যের
কর্তৃক 'হিমকল্যাণ'ই আপনার
কেশতৈল সমস্যা সমাধানে সক্ষম।
ইহার ব্যবহার গুণে যাবতীয় কেশরোগ
নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন
নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ
ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
HIMKALYAN
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা

ষোড়শ বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

//সম্পাদকীয়//

বিশ্ব-বৈঠক (United Nations) দিবস

U. N. পনের বছর পূর্ণ করে (১৯৪৫-৬০) সাবালকত্ব লাভ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে San Francisco-তে যে প্রথম বৈঠক আহূত হয়, সেখানে (তখনো ইংরেজ অধীন) ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দেন ভারত-গৌরব দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ। আজ তিনি কি সুখী হয়েছেন? আনুমানিক ৪৯ দিয়ে সুরু করে U.N.O.র সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯'র ধাক্কায়। Belgium তার ভূতপূর্ব জমিদারী বিশাল Congo ছেড়েও ছাড়ে না? তলে তলে Sabotage ও খণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে Congo'র স্বাধীনতা পণ্ড করতে। এই অবস্থার মধ্যেও কিন্তু সুযোগ্য ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল সব বিপদ উপেক্ষা করে মনোনীত সম্পাদক হয়ে কাজ করে গেছেন, সেই আমাদের গৌরব। ইন্দোনেশিয়ার জমিদারী ছাড়তে বাধ্য হয়ে Dutch-রাও ঠিক এইভাবে শয়তানী চালিয়েছিল। (১৯৪৭-৪৮) কিন্তু স্বাধীন ভারতের মুখ্যমন্ত্রী নেহেরুজীর সতেজ ভাষণে ও পূর্ণ সাহচর্যে, Soekarno ওলন্দাজদের হটাতে পেরেছেন। যদিও তারা এখনো New Guinea ছাড়েনি। আজ ভারত অযথা বিব্রত, মহাচীনের হিমালয়-সমস্যা ঘনিয়ে তোলার ফলে; কিন্তু এক্ষেত্রে জবাব-দিহি কেউ করলেন না, নেহেরুজীরও মুখ বন্ধ, কারণ কম্যুনিষ্ট চীন U. N. আইনের বাইরে; ৬০০ মিলিয়ন চীনাদের U. N. এর বাইরে outlaw করে রেখেছেন কারা? বর্তমান সীমান্ত সমস্যা থাকলেও চীনকে সদস্য করার তাগিদ ভারত কিন্তু বরাবর দিয়ে এসেছে।

ভারতের আর এক সুপরামর্শও ভেসে গেল, U. S. A. ও U.S. S.R. "ঠাণ্ডা-যুদ্ধে"র বরফ-প্লাবনে। দুই পক্ষ একবার মিলে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) কতটা এখুনি সম্ভব এটাই স্থির করুন—এই ছিল নেহেরুজীর অতি সংযত ও সুচিন্তিত মন্তব্য; কিন্তু তিনি Eisenhower-Khruschevকে মেলাতে পারলেন না এবং নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে এলেন। শুধু আমরা নই General Assemblyর বহু জাতিই নেহেরুকে সমর্থন করেছেন ও করবেন। ২৭শে জুন যে বৈঠক অকারণে ভেঙেছে, হয়ত—U. S. এর নূতন প্রেসিডেণ্ট Kennedy এসে আগামী বছর (১৯৬১) সেই নিরস্ত্রীকরণ আলোচনাই আবার সুরু করবেন। অস্ত্রের খাতে কোটি কোটি টাকার অপব্যয় হচ্ছে, অথচ মানবকল্যাণকর অনেক কাজই বাধাগ্রস্ত এই অর্থাভাবে।

নৈরাশ্যের মধ্যে আশা এই, যে বহু শতাব্দীর অত্যাচারের পর আফ্রিকা মহাদেশের বহু জাতি স্বাধীন হয়ে রাষ্ট্রসংঘের নূতন সদস্য-পদ লাভ করেছে ; শতাধিক বছর আগে লাইবেরিয়া স্বাধীন গণতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; আর হাবশী রাজ্য ইথিওপিয়া (একবার মুসোলিনী-আক্রান্ত হলেও) খ্রীষ্টান রাষ্ট্র রূপে স্বাধীন ছিল। ক্রমশঃ Egypt, Lybia, Ghana Tunisia, Morocco, Mali, Nigeria, Guinea প্রভৃতি কালো সদস্য বিশ্বরাষ্ট্র ভুক্ত হয়েছে। এই সব রাষ্ট্রসমূহই এশিয়া—আফ্রিকার মিলনবন্ধন ও মৈত্রী সুদৃঢ় করেছে। আজ শুধু ইউরোপ ও আমেরিকা তাদের কূটনীতি বা অর্থনীতির বলে সবাইকে দমাতে পারবে না, যদিও চেষ্টার ত্রুটি নেই, তার প্রমাণ প্রত্যহ আমরা পাই।

রাজনৈতিক জটিল সমস্যা বাদে, শিক্ষা ও সমাজগঠনের ক্ষেত্রে (U. N. ও U. N. E. S. C. O.) বহু কল্যাণকর কাজের সূচনা করেছেন। মানবের মৌলিক অধিকার (Human Rights) নারী ও শিশুদের দাবী ইত্যাদি নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে। শ্রমিক জগতের উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক শ্রম-পরিষদ (I. L. O.) বহুকাল কাজ করে আসছেন। শিশুদের অধিকার (Children Charter) প্রসারিত হয়েছে ও সামাজিক পরিষদে ৭৮টি রাষ্ট্রের ভোটে এবছর স্বীকৃত হয়েছে যে বর্ণ (Clour) জাতি, ধর্ম ও ভাষাদি নিয়ে মানুষের নির্যাতন দূর করতে হবে (আসামে এ খবর পৌছবে কিনা জানা নেই)। শেষে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করাই যে বিশ্ব নারীসঙ্ঘের প্রচার প্রচেষ্টার ফলে নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে চেষ্টা হোক্—এ শুভ প্রস্তাবটি এনেছিলেন পাকিস্তানী, আফগানী, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা।

নরনারীর সাধারণ জীবনের মান ও মর্যাদা বাড়াতে এইসব ক্ষেত্রে যত চেষ্টা চলেছে, U. N. O. এর পুস্তকাদি থেকে তার সংকলন ও পরিবেশন করা আশু প্রয়োজন। পত্রিকা-সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শুধু দিল্লীতে নয়, আমাদের বিশাল আন্তর্জাতিক কেন্দ্র কলকাতার স্কুল-কলেজে এইসব গঠন-মূলক কাজের বিবরণী প্রচার করা উচিত ; তবেই U. N.এর সাবালকত্ব, সার্থক হবে, এই কথাই এবছর মহাজাতি সদনের বার্ষিক ভাষণে বলেছিলাম।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৬০)

আচার্য প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Roy)-এর দৌহিত্র ও প্রবীণ I. C. S. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র Air Marshal সুব্রত মুখার্জি অকালে দেহত্যাগ করেন ; ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর তিন বিভাগ (Air, Sea & Land Forces) তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখান। তাঁর শেষ তর্পণে, দিল্লী থেকে আমি যোগদান করি ও তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি। তাঁর মত কর্তব্য-নিষ্ঠ ও সুদক্ষ কর্মচারী ভারত সরকার বহুদিন পাননি। তিনি আদর্শবাদী বাঙ্গালী ছিলেন, অথচ কঠিনতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বাংলার নয় সারা ভারতের তিনি মুখোজ্জ্বল করে গেছেন। ভগবান তাঁর পিতামাতা, পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে শান্তি দিন। "মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়"।

কালিদাস নাগ

একটি দিনের ইতিহাস

—মারিয়া কুঝ্‌মীএন্‌স্কা (পোলীয় হ'তে অনূদিত)

অনুবাদক : ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল

[প্রথম থেকে আমাদের একটি পরিকল্পনা ছিল যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আহরণ করে গল্প-ভারতীতে পরিবেশন করব। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তরের সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করেছিলাম। অনেকেই এ বিষয়ে আমাদের সক্রিয় ভাবে সাহায্য করে আসছেন।

গল্প-ভারতীর নূতন পাঠকেরা জেনে আনন্দিত হবেন যে গত কয়েক বৎসর ধরে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর হিরন্ময় ঘোষালের পোল সাহিত্যের সেরা গল্প উপন্যাসের অনুবাদ গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই পর্যায়ে তাঁর যেসব রচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে সমকালীন পোল সাহিত্যের একটি প্রতিনিধিত্ব মূলক রচনাগুচ্ছ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী এই রচনাগুলিকে নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কথা চিন্তা করছেন—এই সংবাদ নয়াদিল্লীর পোল দূতাবাসের তথ্যপত্রে (১-১৫ মে'র সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বেই গল্প-ভারতীতে আমরা এ কথা উল্লেখ করেছি। শারীরিক অসুস্থতা হেতু ডক্টর ঘোষাল কিছুকাল আমাদের কোন রচনা পাঠাতে পারেননি। সম্প্রতি তিনি একটি অনুবাদ গল্প পাঠিয়েছেন ও আরো পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। কাজেই পোল সাহিত্য সংগ্রহ আরো কিছুদিন চলবে। এটি শেষ করার পর আমরা চেক্‌, রুষ, ফরাসী, জার্মাণ ও অন্যান্য দেশের সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্ভার পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেব। এই বিরাট পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলের পূর্ণ সহযোগিতা প্রার্থনা করি।]

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের রাতে এমন গুমোট পড়েছে যে দম বন্ধ হয়ে আসে। হইনভ্‌স্কি—বনের চৌকিদার য়ুজেফ্‌ ভ্রন্‌কার কুঁড়ের ভেতর ঘামে সর্বাঙ্গ চট্‌চট্‌ করে। চৌকিদারের দশ বছরের মেয়ে ভ্লাদ্‌কা মেঝের ওপর খড় পেতে শুয়েছে। কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই। ঘরটার একদিকে খুপরীটার ভেতর পালকের লেপের তলায় তার তাতা * আর সংমা যে কী করে অমন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে, তাই বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। মাছিগুলো ভীষণ জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেওয়া মাত্রেই দ্বিগুণ গোঁ নিয়ে ভন্‌ভন্‌ করে ফিরে আসে। ঠোঁটের কোণদুটোয় ভিড় করে

---

* বাবা। সংস্কৃত : তাত :

জমা হয়। ঘামে ভেজা চুলগুলোর ভেতরে ভেতরে ঢুকে যায়। আর খালি পিঠের ওপর সুড়সুড়ি দেওয়া খুদে খুদে পাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পায়চারী করে বেড়ায়।

ভ্লাদ্‌কা ভাবছে কালকের ঘটনাটার কথা। তার তাতা আর সৎমার মধ্যে বেশ একটু বচসা হয়ে গেছে। ও যখন কুঁড়েতে ঢোকে তখন শুনতে পেয়েছিলো, ওর তাতা "বনের লোকগুলোর" কথা বলছে। কী নিয়ে বচসা, শুনতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সৎমা ওকে গোয়ালে যেতে বলে। কী একটা ভুলে গেছে এই ছুতো করে ফিরে এসেছিলো বটে, কিন্তু ওকে দেখা মাত্রেই সৎমার খ্যান্‌খেনে গলা হঠাৎ থেমে যায়। "বনের লোকগুলো" সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। কাল গুরুমশায়ের ছেলে, য়ানেক্‌, বলে, ওরা নাকি দেশভক্ত বীরের দল, কিন্তু ওর তাতা একটা ধমক দিয়ে বলেন, ছোটমুখে ওসব যা-তা বড় বড় কথা যেন আর না শোনেন। য়ানেকের বয়েস বারো পেরিয়েছে। তাই পরে শাসায়, সেও বনে চলে যাবে, কিন্তু ছেলেরা সবাই হাসাহাসি করে বলে, বনে দুধের বাচ্ছাদের করবার কিস্‌সু নেই। য়ানেকের জন্যে ভ্লাদ্‌কার মনে বেশ একটু দুঃখ হয়েছিলো। বন্ধু হিসেবে য়ানেক্‌ ভারী ভালো। ভ্লাদ্‌কার শিক্ষয়িত্রী, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর, বলেন, য়ানেক্‌ সত্যিকারের খাঁটি পোল্‌। শিক্ষয়িত্রী যা বলেন ভ্লাদ্‌কা সব বিশ্বাস করে, কারণ ভারী ভালো মানুষ তিনি।

ওর তাতা "বনের লোকগুলোকে" দেখতে পারে না। যাতা বলে গাল দেয়…তা হোক্… তাতা তো?… তাতার সম্বন্ধে কোনো মন্দ কথা ভাবতে ভ্লাদ্‌কার ভয় করে, কারণ তাহলে পাপ হবে। কিন্তু তাতার কথা বারণ মানে না, বারে বারে ফিরে আসে: তাতা আলেমানীদের পাহারার আড্ডায় যায়। সেখানে বসে বসে মদ টানে তাদের সঙ্গে।

পাঠশালার ছেলে-মেয়েরা ওর দিকে আড়চোখে তাকায়, ভ্লাদ্‌কার সঙ্গে তারা কথা কইতে চায় না, শুধু য়ানেক্‌ বলে, ভ্লাদ্‌কা "খাসা মেয়ে", বেশী বক্‌বক্‌ করে না, ওর ওপর নির্ভর করা চলে, আর অন্যগুলো, যা পেটে আছে সব ভলভল্‌ করে উগ্‌রে দেয়। ঐ একটা ভালো কথার জন্যে ভ্লাদ্‌কার মন য়ানেকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। ভাবে সেই কথা, ঘুম আসে না চোখে। কুঁড়ের ভেতর পাংশুটে একটু আলো দেখা দেয়। জান্‌লার কাঁচের ওপর খুব আস্তে টোকা দেওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। ভ্লাদ্‌কা কান পেতে শোনে, তারপর পা টিপে টিপে জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রাতপোহানোর ঘোলাটে আলোয় চোখে পড়ে দুটি নওজোয়ান: মাথায় বেসামরিক টুপী, কিন্তু কোর্তার কাটটা সামরিক, উঁচু পা-ঢাকা জুতো, তাদের ভেতর পাৎলুনের পায়াদুটো ঢোকানো, কোমরে আঁটা কোমরবন্ধ।

ভ্লাদ্‌কা জান্‌লাটা খোলে একটু। বহুদিন খোলা হয় নি, কব্জাগুলো ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌ করে ওঠে। ভ্রন্‌কার ঘুমের ঘোরে বিড়্‌-বিড়িয়ে বকুনি অল্পক্ষণের জন্যে থেমে যায়। তার মেয়ের গা শিউরে ওঠে, ভাবে ঘুম ভেঙে গেছে বোধ হয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে…তাতা, সৎমা, কেউ নড়ে না।

—কে তোমরা?—শুধায়।

—"বনের লোক"।

—এদিকে না আসাই ভালো—বলে মেয়েটি।

—চৌকিদার বাড়ী আছে?

ভ্লাদ্‌কা চুপ করে থাকে। ঠিক সেই সময়ে ভ্রন্‌কা জেগে ওঠে।

—কার সঙ্গে রেতে-বিরেতে বক্‌বক্‌ কচ্চিস্‌?—তেরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—"বনের লোক", তোমার কথা জিজ্ঞেস করছে।

ভ্রন্‌কা বিরক্তিভরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—যেও না ওদিকে—সৎমা বলে।

চৌকিদার বারণ না মেনে এগিয়ে যায়। ভ্লাদ্‌কা শোনে, জান্‌লার বাইরে চুপিচুপি কথা চলেছে, কী বলছে ওরা ধরতে পারে না, ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাতার জন্যে ভয় হয়, আর ওদের জন্যেও, কোনো একটা বিপদ না ঘটে। কিছুক্ষণ পরে "বনের লোকগুলো" চলে যায়।

ভ্রন্‌কা কুঁড়েয় এসে ঢোকে; তার মেজাজ বেগড়ানো, যা-তা বলে গালি পাড়ে। খুব তাড়াতাড়ি পোষাক বদ্‌লাতে লেগে যায়, সৎমাও উঠে কাঠ আনতে যায়, রান্নার ব্যবস্থা করে, তাতার কিন্তু তর সয় না, খাবার জন্যে দেরী করবার সময় নেই।

ভ্লাদ্‌কা খড়ের ওপর গিয়ে বসে, ঘাড়ের পেছনে রোদে-পোড়া হাতদুখানি রেখে দেওয়ালে ঠেস দেয়। তাতা কয়েকবার খড়ের ওপর হোঁচট খায়। জুতোর আগাটা ওর গায়ের খুব কাছ দিয়ে চলে গেলো। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে তাতাকে উঁচু মাথাটা বেশ একটু নোয়াতে হলো।

তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, চৌকিদারের দেখা নেই। কুঁড়ের ভেতর সব চুপচাপ, নিঝ্‌ঝুম। উনুনের আগুন নিবে গেছে, খাবার-দাবার যা রান্না হয়েছে জুড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কেউ তা মুখে তোলে নি। ছুটির সময়েও ভ্লাদ্‌কা পাঠশালায় যায়। শিক্ষয়িত্রী ছেলেমেয়েদের বই পড়তে দেন। আজ পাঠাগার খোলা। কিন্তু ভ্লাদ্‌কা তাতার ফেরার আশায় ঠায় ঘরে বসে আছে।

দুপুরের দিকে জুতোর মচ্‌মচানি শোনা যায়, ভ্রন্‌কা ফিরছে, টর মাতাল। মাথা নুইয়ে কুঁড়ের ভেতর এসে ঢুকলো, হাতে দু-জোড়া উঁচু পা-ঢাকা জুতো। ঘরের মাঝখানটায় নামিয়ে রেখে ধপ্‌ করে বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়লো।

—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?—শুধায় সৎমা।

—আলেমানীরা দিলো।

—ধরিয়ে দিয়েছো বুঝি!

—থাম্‌, বলচি!

—যুদাশ্‌! *

ভ্লাদ্‌কা হাত দিয়ে কানদুটো চেপে ধরতে চায়, কিন্তু চোখদুটোও যে খোলা। বুঝতে পারে না, কোন্‌টা বেশী অসহ্য: শোনা না দেখা।

তাতা নিকেল-করা একটা বড় ঘড়ী বের করে মেজের ওপর রাখে। ভ্লাদ্‌কা জানে, আগে এ ঘড়ী ছিলো না। ঘড়ীটা জোরে টিক্‌টিক্‌ করে চলে। ভ্লাদ্‌কার গায়ে পাক দিয়ে ওঠে। সকাল থেকে খায় নি বলে নয়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওরা, নিশ্চয়ই তাদের রক্তাক্ত দেহের ওপর মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে, আর ওদের জুতোগুলো ঘরের মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে রাখা। ভ্লাদ্‌কা আর সহ্য করতে পারে না, হুড়মুড় করে উঠে পড়ে গায়ের ওপর কোনো রকমে একটা ফ্রক্‌ ফেলে, একখানা বই তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। কুঁড়ে থেকে যতদূরে পারা যায়, শিগ্‌গির, শিগ্‌গির·· তাতা যেন ধরে ফেলতে

* বিশ্বাসঘাতক।

না পারে। চুলগুলো আঁচড়ে বাঁধা হয়ে ওঠে নি। উস্কো-খুস্কো, এলোমেলো একমাথা চুল নিয়ে সে পাঠশালার বেড়ার আগড় খুলে ঢুকে পড়লো।

শিক্ষয়িত্রী বসে আছেন একটা বেঞ্চির ওপর আর তাঁর সামনে ঘাসের ওপর বসে সপ্তমশ্রেণী; পাঠশালার সবচেয়ে উঁচু। শিক্ষয়িত্রী ওদের সব পাঠ শেষ করে দিতে চান্; কী একটা বই পড়ে শোনান্, ভ্লাদ্কার পক্ষে অবোধ্য ভাষায় অর্থ করেন, তারপর সরল কথায় ভাবটা বুঝিয়ে দেন।

ভ্লাদ্কা কী করবে বুঝতে পারে না, ওর দিকে অতগুলো চোখ তাকিয়ে রয়েছে। শিক্ষয়িত্রী তার অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করে ডাকেন নিজের কাছে:

—তুইও শুন্‌বি, ভ্লাজ্যা? বইখানার গোড়ারদিকটা অবিশ্যি জানিস না। তাহোক্, এমন চমৎকার বই, আরো অনেকবার পড়বি নিশ্চয়। এ শ্চেঙ্কোভিচ্-এর "ক যাসি"। †

ভ্লাদ্কা বিশ্ববিখ্যাত লেখকের লেখা "বাজনদার য়াকোঁ পড়েছে। শিক্ষয়িত্রী যে ওকে থাকতে বললেন তাতে ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। বাড়ী ফেরবার ওর সাহস নেই। ঘাসের ওপর বসলো একপাশে।

—কোন্‌খানটায় থেমেছিলাম আমি?—শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞেস করেন।

—ঐ সেই বিশ্বাসঘাতকটার কথা হচ্ছিলো।—য়ানেক্ বলে।

—হীলন্ হীলনীদেস্-এর কথা—যোগ করে আন্তশ্।

"হে প্রভু, আমার অনিষ্টের প্রতিশোধ দিন"—শিক্ষয়িত্রী হীলন্ হীলনীদেস্-এর কথা পড়ে চলেন—"আর আমি আপনার কাছে ওদের সবাইকে ধরিয়ে দেবো, প্রধান শিষ্য পীতর, লীনুস্, ক্লেৎ, গ্লাউক্, ক্রীস্প্, সবচেয়ে বড় পাণ্ডাদের, তারপর লীগিয়াকে, উর্সুস্‌কে, ওদের শত শত হাজার হাজার ধর্মাবলম্বীদের, দেখিয়ে দেবো ওদের প্রার্থনা-মন্দির, ওদের কবরস্থান, আপনাদের সমস্ত কারাগার খালি করে দিলেও ওদের জায়গা হবে না।"

—বিশ্বাসঘাতক—পুনরুক্তি করে য়ানেক্।

ভ্লাদ্কা এখানে এসেছিলো তার সৎমার মুখের "যুদাশ্", এই কথাটা কিছুক্ষণের জন্যেও মন থেকে দূরে রাখবার জন্যে। কিন্তু তা হলো না। যুদাশ্-এর মূর্তি হীলন্ হীলনীদেস্ আর ভ্রন্‌কার সঙ্গে মিলে এক হয়ে গেলো। শিক্ষয়িত্রীর পড়ায় বাধা দিতে তার সাহস হয় না, অথচ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে, তার পক্ষে ও গল্প শোনা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। ছাড়া ছাড়া কতকগুলো কথা তার কানে ধরা পড়ে। শিক্ষয়িত্রী পড়ে চলেন। ভেন্তীনুস্ বলছে হীলনুকে:

"প্রতিহিংসার বহ্নি কি এখনো তোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে?"

হীলন্ উত্তর দেয়, "না, কিন্তু সামনে আমার নীরন্ধ্র রাত্রি।"

ভ্লাদ্কা উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের রুমালটা গায়ে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে নিলো, যেন ঐ গুমোট গরম দিনে তার গা সির্‌সির্ করছে। চলে যাচ্ছিলো, এমন সময়ে শিক্ষয়িত্রী পড়া থামিয়ে ওকে পাঠশালার ভেতর নিয়ে গেলেন। ভ্লাদ্কার মুখে পাণ্ডুর, রক্তহীন।

—তোর অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি রে? শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞেস করেন।

—না। হীলনীদেস্-এর শেষ পর্যন্ত কী হলো?

---

† Henryk Sienkiewicz-এর "Quovadis".

—খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করলো। সন্ত পল্ ওকে দীক্ষা দেন। শেষ পর্যন্ত যথার্থ ঈশাঈর মত নিগৃহীত হয়।

এইবার ভ্লাদ্কার মনে য়ুদাশ ও হীপনীদেস্ পৃথক্ হয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করলো। সে ভেবে স্থির করতে পারে না। তার তাতাকে কোন দিকে স্থান দিতে পারা যায়।

বই নিয়ে মাঠের আল ধরে কী ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলে গেলো। চৌকিদার বাড়ী নেই, শুধু সৎমা মেজের কাছে বসে মাথাটা দুহাতের ওপর অসহায়ভাবে ভর করে জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। ভ্লাদ্কা সঙ্গে আনা বইটা পড়তে বসলো। সন্ধ্যে হবার একটু পরে চৌকিদার ঘরে ফিরলো। দেখলেই বোঝা যায় উত্তেজনায় সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। সৎমা খাবার গরম করতে চড়িয়ে দিলো। ভ্লাদ্কা কুঁড়ের এককোণে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ভ্রন্কা ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে যেন তাকেই খোঁজে।

—ভ্লাদ্কা—তাতা বললো—একটু অন্ধকার হয়ে গেলেই পাহারার আড্ডায় গিয়ে আমি যা বলবো বলে আসবি।

ভ্লাদ্কার বুকটা কেঁপে ওঠে। একবার বলতে চায়, সে পারবে না। কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে তার কথা বেরয় না।

—বাচ্চা মেয়েটারে ওদের ঘরের পাহারার আড্ডায় পাঠানো! না, ওরে যেতে হবে নে।—সৎমা বলে।

ভ্রন্কা বেঞ্চি থেকে উঠে ঘুষি পাকিয়ে স্ত্রীর দিকে তেড়ে গেলো। সৎমা ঘুষি এড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভ্লাদ্কা, এই শুনছিস, পাহারার আড্ডায় গিয়ে বল্‌বি—চৌকিদার মেয়েকে ডেকে বলে—বল্‌বি, যেন ওরা খুব আস্তে আর সাবধানে যায় ভারেৎস্কির বড় রাস্তার দিকে, তারপর যেন পুরোনো খাতগুলো পেরিয়ে, চারা-বনটার উদিক দিয়ে উঁচু ঢিপিটার ওপর চলে যায়, বাদবাকী সব ওরা বুঝে নেবে। যা বল্‌তে হবে ভুলবিনি তো?

ভ্লাদ্কা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা, বল্‌চি।

ভ্লাদ্কা বেরিয়ে গেলো। অন্ধকার নেমে এসেছে। গোলাঘর পেরিয়ে যেতেই কয়লার গাদার পেছন থেকে সৎমার ছায়ামূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালো।

যাস্‌নে ভ্লাড্ড্যু। ও যেমন য়ুদাশ, নিজেই যাগ্‌না।

ভ্লাদ্কা উত্তর দিলো না, সটান বেরিয়ে গেলো। বেশ খানিকটা পথ যাবার পর যখন কুঁড়েটাকে আর দেখা যায় না, তখন সে দৌড়তে সুরু করলো। মেঘলা রাত। জুলাই মাস হলেও গোধূলি ছাপিয়ে অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছে। পাঠশালার কাঠের বেড়াটার কাছে এসে থামলো ভ্লাদ্কা। তখনো লোক চলাচল বন্ধ হয়নি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। খানিক পরে মনে হলো, যেন য়ানেক্ তাদের বাড়ী থেকে বেরলো।

—য়ানকু—ডাকলো খুব আস্তে। ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সে গলার স্বর চিনতে পেরেছে।

—কী চাই রে, ভ্লাড্ড্যু, এত রাত্তিরে, ভয় করে না?

—না। খুব জরুরী একটা কথা তোকে বল্‌তে এলাম।

য়ানেক্ জানে, ভ্লাদ্‌কা যা-তা আবোল তাবোল বকবার মেয়ে নয়। আগড়টা সরিয়ে কাছে এগিয়ে এলো। ভ্লাদ্‌কা তাকে বনের ধারটায় নিয়ে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে চল্‌লো। তার বুকের ওপর যে কথাগুলো ভারী হয়ে চেপে বসেছিলো সেগুলো একটা একটা করে নামিয়ে দিলো। ঐ ছেলেটাকে সব বলা যায়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর সে নিজে আকাশ পাতাল ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলো না। শুধু জানতো, সে পাহারার আড্ডায় যাবে না কথনো। বাড়ী ফেরার পর তার তাতা যদি কেটেও ফেলে তাহলেও নয়। য়ানেক্ বড়দের মত ভারিক্কী ভঙ্গীতে সবকথা শুনলো, তারপর বল্‌লো :

—বাড়ী ফিরে যা, বলিস্‌নি কিন্তু যে পাহারার আড্ডায় যাস্‌নি।

ভ্লাদ্‌কা ভয়ে ভয়ে বাড়ীর পথ ধরে চল্‌লো, অথচ তার মনে গভীর আনন্দ। "বনের লোকগুলো" যে কোথায়, সে কথা জানিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যথন বাড়ী পৌছলো, তথন তাতা আর সৎমা ঘুমিয়ে পড়েছে। খড়ের ওপর গিয়ে শুলো ভ্লাদ্‌কা। ভাবে য়ানেকের কথা : ও চলে আসার পর সে কী করলো কে জানে, হয়ত "বনের লোকগুলোকে" খবরটা দিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে একটা অজানা ভয় বারে বারে হানা দিতে লাগলো—"বনের লোকগুলো" যদি জানতে পারে যে তাতা বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে, তথন তার অবস্থা কী হবে! য়ানেকের কাছে দৌড়ে যাবার সময়ে এ বিপদের সম্ভাবনার কথা তার মনে আসেনি।

রাত যথন এগারোটা তথন শুনতে পেলো, তাতা বেরিয়ে গেলো। সে যে বাড়ী নেই সেকথা মনে করে নিজেকে ওর অনেকটা হাল্কা বোধ হলো। আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে সৈনিকদের ভারী পা-ফেলার আওয়াজ আর হিড়ির-বিড়ির করে বলা আলেমানী ভাষা কানে এলো। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তারা দরজার ওপর ঘা দিচ্ছে। ভারী বুটের আওয়াজে ঘর কাঁপিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে ঘরে এসে ঢুকলো। সৎমা আলোটা উস্কে বাড়িয়ে দিলো।

—ভ্রন্‌কা কোথায়?

—বনের দিকে গেচে।

—পাকড়াও করবো ব্যাটাচ্ছেলেকে! দেওয়ালের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাছাধনকে। *

—কেন, কি করেছে? সৎমা শুধালো।

কী করেছে? রাগে মুখে ফেনা তুলে ভেঙালো কর্পোরাল্—আমাদের খবর দেয়নি যে বনের ভেতর "গুণ্ডার" দল লুকিয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের আক্রমণ করেছিলো। আমাদের একজন মারা পড়েছে। তার জন্যে জবাবদিহী করতে হবে ভ্রন্‌কাকে।

—তাতা আমাকে আপনাদের খবর দিতে বলেছিলো—স্থিরভাবে বললো ভ্লাদ্‌কা।

কর্পোরাল্ অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। ঐ একরত্তি পটকা একটা মেয়ের দোষে একজন পাহারাওয়ালার জান্ গেছে। তার আশ্চর্যভাব ক্রমে অন্ধরোষে পরিণত হলো। কড়া আলেমানী বুট-শুদ্ধ পা দিয়ে ধাঁই করে একটা লাথি মারলো মেয়েটার মুখে। ভ্লাদ্‌কার ভাঙা দাঁত ছাপিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। তবু সে একটু শব্দ মাত্র করলো না। মাটির ওপর বসে পড়লো। সৎমা থানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করতে লাগলো।

* অর্থাৎ গুলি করে মারা হবে।

—বল্ সত্যি করে—কর্পোরাল হুমকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কাকে খবর দিয়েছিলি যে তোর বাপ তোকে পাহারার আড্ডায় যেতে বলেছিলো?

—কাউকে নয়। বনের ধারটা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিলাম। খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। ফিরে দেখি তাতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

—রক্তাক্ত মুখ দিয়ে কোনো রকমে টেনে টেনে বললো ভ্লাদ্‌কা।

আলেমানীরা উঠে দাঁড়ালো। তারপর আপন ক্ষমতা ও শান্তিহীনতার মর্যাদা যথাসম্ভব বজায় রেখে মাথাগুলো খাড়াখাড়াভাবে একটু নামিয়ে দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সৎমা মেজের কাছে বসে হাতের ওপর মাথাটা রাখলো। আলেমানীদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না। কুঁড়ের সামনেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়। উত্তেজনা-স্তব্ধ কাটে কয়েকটি মুহূর্ত। ভ্লাদ্‌কা তার বনের সন্তানের সূক্ষ্ম শ্রুতিশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারে তাতার পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

.. তাতা আসছে—বলে আস্তে আস্তে।

পায়ের শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে।

—কে রে, লন্‌কা নাকি?—কর্পোরাল্ হাঁকলো।

উত্তর শোনা গেলো না। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ ঠাঁই করে উঠলো। সৎমা হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। ভ্লাদ্‌কা লক্ষ্য করলো, তার শ্রম-বিকৃত হাতদুটো থরথরিয়ে কাঁপছে।

ভ্লাদ্‌কার মুখ ছাপিয়ে ক্ষীণ রক্তের প্রস্রবণ বহে চলেছে। তার আর অন্ত নেই……

ঝ. (সবিন্দু ঝ, বিপরীত রেফ্-চিহ্ন যুক্ত)=ফরাসী *j*, যৎসামান্য i-যুক্ত।

ঞ=n (ইস্পানী)।

ফ=f.

ভ=v.

ল=ইং w.

ভ্র=vr.

ভ্ল=vw.

সংখ্যাতত্ত্ব

পরিসংখ্যানের মজাই এই যে তা নিখুঁত সত্যি কথা বলে ফেলে। উদাহরণ—যদি একটা চাষীর ছেলে এক ঘণ্টায় তোলে পাঁচ সের পটল আর একটা মেয়ে তোলে চার সের তাহলে—জিজ্ঞেস করুন কোনো পরিসংখ্যানবিদকে—তিনি টকাস করে বলে দেবেন, দুজনে একত্রে এক ঘণ্টায় তুলবে ন' সের পটল।

এবার খোদ চাষীকে জিজ্ঞেস করুন, তিনিও তার মত করে যোগ কষবেন এবং কষে বলবেন, ওরা দুজনে একটাও পটল তুলবে না, আড়ালে আবডালে স্রেফ গল্প চালাবে।

শ্রুতি স্মৃতি

শ্রীকালিদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নাটোররাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় শেষ জীবনে ‘শ্রুতি-স্মৃতি’ সুরু করে অসমাপ্ত রেখে গেছেন। তার বহু যুগ পরে আমরা কবি-সান্নিধ্য পেয়েছি কিন্তু তবু আমাদের রবীন্দ্র শ্রুতি-স্মৃতির পশরাও কম নয়, এ স্মৃতি অলিখিত থেকে যাবে। তরুণদের তাগিদে মৌখিক কিছু কিছু বলেছি কিন্তু লেখা হয়নি, গল্প-ভারতীর তাড়ায় যদি কিছু লেখা হয় সুখী হব।

প্রবেশিকা-ফটকে পৌঁছতে তখনও চার বছর বাকি, ১৯০৪ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছি, ১৪ বছরের বড় "দাদা"দের দল আমাদের শোনায় চাঞ্চল্যকর "দেশের কথা" টেনে নিয়ে যায় তাদের আখড়ায়, দেখি ডন বৈঠক ছোরাছুরি ও লাঠি খেলা থেকে সুরু করে অনেক কিছু খেলা চলছে।

মাষ্টারদের মধ্যে যাকে সব চেয়ে ভালবাসি তিনি রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র থেকে কবিতা আবৃত্তি শোনান 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।' "ভারতসঙ্গীত" থেকে পড়ে চলেছেন, মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। হঠাৎ তিনি ক্লাসের পড়া থামিয়ে আমাদের নিয়ে যেন সভা করলেন, বহুক্ষণ ধরে পড়ে শোনালেন, রবি ঠাকুরের "স্বদেশী সমাজ" :

"আসুন, আমরা মনকে প্রস্তুত করি। ক্ষুদ্র দলাদলি কুতর্ক পরনিন্দা সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া, অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে, চিত্তকে উদার করিয়া, কর্ম্মের প্রতি অনুকূল করিয়া......আমাদের সমাজপতিকে অভিভাবক করি; শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গল প্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি..."

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তখন অনেক কিছু বুঝিনি কিন্তু ভাষার মধ্যে যে সুর বেজে উঠছে সেটি প্রাণকে মাতিয়েছিল। তখন থেকে কবির গান ও কবিতা নিত্যসঙ্গী হল কিন্তু কবিকে দেখেছি, কিছু পরে, (১৯০৫) স্বদেশী সভার ভিড়ে এবং (১৯০৬) কলকাতা কংগ্রেস মণ্ডপের স্বদেশী মেলায়; সভাপতি দাদাভাই'এর 'স্বরাজ' মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ গান ও রবীন্দ্রনাথের "মরা গাঙ্গে বান ডেকেছে জয় মা বলে ভাসাই তরী।"

শিবপুরের স্কুল থেকে ক্লাস পালিয়ে হেঁটে কংগ্রেস মণ্ডপ (ভবানীপুর পোড়াবাজার) আবার

শ্যামবাজারে 'পান্তির মাঠে' লাঠি তলোয়ার খেলা দেখতে যাওয়া অতি সহজ ছিল, দূরত্ব মনেই হত না। কখনও আবার চলেছি, একা নয়, সদলবলে নতুন শেখা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগত-জনের হৃদয় জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহরে।

তখনো জানিনা এইটি রবীন্দ্রনাথের গান, শুধু মুগ্ধ হয়ে আমরা গেয়েছি।
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

এইপ্রাণমাতান রামপ্রসাদী সুরের গানও তাঁরই, এই গানটি রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের উপলক্ষে রচনা করেন।

১৯০৯ সালে পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে (Metropolition নাম তখন) প্রবেশ ; শুধু শিক্ষাই নয় কঠিন জীবন পরীক্ষারও প্রবেশিকা। England's Work in India রচয়িতা ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী লেখক) তখন অধ্যক্ষ, আমাকে ভর্তি করান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শ দীপ্ত সহকর্মী পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর সুদক্ষ সংস্কৃতি পঠন ও প্রেরণা দিয়ে আমাদের ধন্য করেন। ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর স্বর্গারোহণ করেন; তার একযুগ পরে আমরা কলেজে এসে তাঁর দীর্ঘজীবনের তাৎপর্য্য কিছু পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-চরিত পড়ে :

"আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার সাগর বলিয়াই জানি... কিন্তু এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব...ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ; তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

কবির পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১৮১৭—১৯০৬) বিদ্যাসাগরের কালে (১৮২০—৯১ দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী সুহৃদ ছিলেন, তাই বিধবা বিবাহ প্রস্তাব যখন কেউ ছাপতে ভরসা পাননি, তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ছেপে নারীর অধিকার সুদূর রামমোহন যুগ (১৭৭২—১৮৩৩) থেকে আধুনিক যুগে প্রসারিত করে দেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন দেহত্যাগ করেন (১৯০৬) তার আগেই চোখের বালি (১৯০৩) প্রকাশিত হয়েছে ; রবীন্দ্রনাথের এই সামাজিক উপন্যাস বাঙ্গলা সাহিত্যে শুধু নব্য রীতি নয়, নবযুগের সূচনা করে ; সেকথা গল্প-সম্রাট শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নিজ মুখে শুনেছি। ৪১ বছরে বিপত্নীক হয়ে রবীন্দ্রনাথ নব-পর্য্যায় বঙ্গ-দর্শনে নৌকাডুবি এবং চোখের বালি প্রকাশ করেন। এ দুখানি বই শরৎ সাহিত্যের সূচনা করে—শরৎচন্দ্রের উদয়ের আগেই। তার-পরে গোরা উপন্যাস আমরা পাই ও 'প্রবাসী'তে উদ্‌গ্রীব হয়ে মাসে মাসে পড়ি। গোরা—স্বদেশী যুগের গদ্য মহাকাব্য ; সেটি শেষ হল যখন, তখন দূরত্ব ঘুচিয়ে কবিগুরু কাছে ডাকলেন। শুধু আমরা ছাত্ররাই নই—প্রাচীন অভিভাবক দলকেও 'গোরার" তর্কে উত্তেজিত দেখেছি।

অথচ সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে যে সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুগ্ধ করেন তখন তাঁর পারিবারিক জীবনে মৃত্যুর

করাল অন্ধকার! সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবী (১২৮০—১৩০৯) ১৯০২ সালে মাত্র ৩০ বছরে বিদায় নেন; চিহ্ন তার অমর হয়ে আছে 'স্মরণে'র পংক্তিতে। দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা (১৮৯০—১৯০৩) ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র (১৮৯১—১৯০৭) দু'জনেই পিতার হৃদয় শূন্য করে অকালে পিতাকে ছেড়ে যান। সে যুগের চাপা-কান্না প্রচ্ছন্ন আছে গীতাঞ্জলীর মধ্যে, সেকালের নাট্য রচনায়; কবির কাছে সে সব কথাও পরে শুনেছি—

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।

ত্রিশ বছরের স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় বসে যে বেদনা কবিপ্রাণকে মথিত করে তার সাক্ষী এই গানটি 'স্মরণ' কবিতায় এ যুগের মানুষ পাবেন।

"মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই (শমীন্দ্র) তখন চক্রবর্ত্তী-সম্রাট ছিল। সেই জন্য লিখতে গেলেই খোকা ও খোকার মার ভাবটুকু সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে। সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে' আমার অশ্রুবাষ্প এ রকম খেলা খেলেছে, তাকে নিবারণ করতে পারিনে।"

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' গল্প থেকে সুরু করে, অমর নাট্য ডাকঘরের (১৯১২) অমল এবং 'শিশু', "শিশু ভোলানাথ" ও 'পুনশ্চ'র (১৯৩২) শিশু (অল্পায়ু দৌহিত্র নীতিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গীত), পর্য্যন্ত কত রচনায় রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব শিশুতত্ত্ব প্রচার করে গেছেন: তার সাক্ষী "জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।" ১৯০৭ সালে ছোট ছেলে শমী কলেরা হয়ে হঠাৎ মুঙ্গেরে মারা গেল; সে মর্ম্মান্তিক আঘাতের কথা কবির অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে বসে শুনেছি। অমলের মৃত্যুশয্যার পাশে কবি 'ঠাকুর্দ্দা' যখন বসেছেন তখন আমাদের শমীর কথা মনে হল। ১৯১৭ কলকাতা কংগ্রেস সেরে গান্ধিজী জোড়াসাঁকো ভবনে বসে সে দৃশ্য দেখেছেন। প্রেক্ষা-গৃহের পাশ থেকে সুর এসে সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল—

জীবনে যত পূজা হলনা সারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

শোকের দাহন প্রচণ্ড অথচ কবি শান্ত। তিনি অসীম ধৈর্য্য ও একাগ্রতা দেখিয়ে বিচিত্র রচনায় বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন: রাজা প্রজা থেকে সুরু করে, সমূহ ও স্বদেশ, শিক্ষা ও সমাজের অপূর্ব্ব গদ্য রচনা ১৯০৮ পর্য্যন্ত আমরা পেয়েছি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি যেমন গড়ে তুলেছেন সেই সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে গভীর স্বাধ্যায় করেছেন তার সাক্ষী অপূর্ব্ব গদ্যকাব্য "শান্তিনিকেতন" (১ থেকে ১০ গত ১৯০৯-১১; ৫০ জন্মতিথি পর্য্যন্ত); রবীন্দ্রনাথের গানে উপাসনা, 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) নবযুগের অগ্রদূত। সেই সঙ্গে অভিনয়ের জন্যও তিনি শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০),

ডাকঘর ও অচলায়তন (১৯১২) নাটকগুলি আমাদের শুনিয়ে তৃতীয়বার সমুদ্র-পাড়ি দিয়েছিলেন (১৯১২-১৩)। তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি ও যুগনায়ক রূপে ত্রিশ বছর দেশে ও বিদেশে, বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতি প্রচার করে গিয়েছেন। এ রহস্যময় জীবনী তাঁর এখন মনে হয় অলিখিত মহাকাব্য; তা'র ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন, তাঁর বিপুল পত্রাবলীতে আর 'জীবনস্মৃতি' 'ছিন্নপত্র' ও 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি স্মরণীয় রচনায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তিনি যুগান্তর এনেছেন 'গোরা' লিখে, তার মূল্য নির্দ্ধারণ করে গেছেন পাকা জহুরী শরৎচন্দ্র। তারপর বঙ্গদর্শনে 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ থেকে সুরু করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও প্রবাসীতে কি অপূর্ব্ব গদ্যসাহিত্যের বিস্তার দেখেছি: তপোবন ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' আমাদের তরুণ শিক্ষার্থী জীবনে এতবড় প্রেরণা দিয়েছে যা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পাইনি।

সেই পঞ্চাশ বছর আগে (১৯১০-১১) ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও আদর্শ ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে অমোঘ ইঙ্গিত আমাদের দিয়েছিলেন তা থেকেই বাঙলায় ও নিখিল ভারতে "বৃহত্তর ভারত" (Greater India) আমরা সুস্পষ্ট ও সার্থক ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র বলে চিনেছিলাম! রবীন্দ্রনাথের দান আমাদের কাছে অবিস্মরণীয়। আমার 'ভারতমৈত্রী মহামণ্ডল ও Discovery of Asia (১৯৫৫) Greater India (১৯৬০) প্রভৃতি রচনার প্রতি ছত্রে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র "পুরোধা", বৈদিক যুগের পথিকৃৎ ঋষি-নেতা। এই যুগে আরও স্মরণীয় রবীন্দ্রনাট্য এক অভিনব রূপক ধারা (Symbolism)।

মাত্র ১১ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে বোলপুর গ্রামে আসেন (১৮৭৩)। সেখানে গাছের তলায় বসে "পৃথ্বীরাজ পরাজয়" নামে এক নাট্যকাব্য লেখেন; সেটি লুপ্ত হলেও অন্য রচনার মধ্যে তার সন্ধান কিছু বেরিয়েছে ও জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে যে (১৮৮১) "রুদ্রচণ্ড" নাট্যকাব্য তারই রূপান্তর। কবির রচিত সেই প্রথম নাটকখানি উৎসর্গ করেন 'নটের গুরু' তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরকে। এই দাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নটভূমিকায় অনেকবার নেমেছেন: গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' "বাল্মীকি প্রতিভা" (১৮৮১-৮২) পর্য্যন্ত। ১৮৮৭তে লেখা রাজর্ষি উপন্যাস থেকেই কবি ১৮৯০ সনে তাঁর বিখ্যাত নাটক "বিসর্জ্জন" লেখেন ও নিজে রঘুপতি-ভূমিকায় আশ্চর্য্য অভিনয় করে 'ভারত সঙ্গীত সমাজে' ও অন্যত্র অভিনেতা রূপে শ্রেষ্ঠ সম্মান পান। ১৮৮৩ সালে রচিত 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে, বহু পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) ও 'পরিত্রাণ' নাটক লিখে অভিনয় করান। ১৮৮৯ সালে লেখা 'রাজা ও রাণীতে' নাম ভূমিকায় তিনি যুবারূপে নেমেছেন।

বালক অবস্থায় 'অলীকবাবু'তে অভিনয় করে যখন সবাইকে রবীন্দ্রনাথ অবাক করেন তখন কেউ জানতেন না যে ফরাসী হাস্যরসিক Moliere এর অতি সূক্ষ্ম হাস্যরসের অবতারণা কবি রবীন্দ্রনাথই করে যাবেন। তার প্রমাণ রয়েছে 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) তথা 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) ও 'চিরকুমার সভা'—যা আজও ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করে। ১৯০৭ সালে 'হাস্য-কৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' রচনা দুইটি প্রকাশিত হয়।

প্রাণাধিক পুত্র শমীন্দ্রের অকাল মৃত্যুর (১৯০৭) পর নাটকের মধ্যে যেন 'চোখের জলে লাগল

জোয়ার'; প্রথম ঋতু-নাট্য শারদোৎসবের মধ্যে যখন 'ঋণ শোধ'এর আভাষ পাই, সেই সঙ্গে দর্শক আমরা চোখের জলে ভেসে শুনেছি—

সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধার
জননী গো গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার॥

দুখের অশ্রুধার রবীন্দ্রনাথের নিজের ঘরে যখন বয়েছিল, সে যুগেই সুরু হল বাঙালী তরুণদের মরণ-যজ্ঞ; আত্মাহুতি দিল কত শত ছেলে মেয়ে আজও তার পুরো হিসাব মেলেনি: ক্ষুদিরাম কানাই সত্যেনের ফাঁসি থেকে সুরু হয়েছিল মা বোনদের অশ্রুপ্লাবন; নীরবে তারা সহ্য করে গেছেন চরম দুঃখ; "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে (১৯০৯) পেলাম কবিকে ধনঞ্জয় বৈরাগী রূপে। তিনি জনতার মাঝে দিব্য-প্রেরণায় গাইছেন

আগুন আমার ভাই আমি তোমারি জয় গাই।

আবার বাউল সুরে সবাইকে মাতিয়েছেন—

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি
বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে ধন্য হরি রাজ্যপাটে
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে ধন্য হরি ধন্য হরি॥

হরিজনদের কল্যাণমিত্র গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকায় Passive Resistance সুরু করার আগেই, কবিতা ও গানের রূপকে—বিশেষ "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে—রবীন্দ্রনাথ অহিংস-সংগ্রাম সুরু করেন, সেকথা আজ অনেকে বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। নিষ্ঠুর রাজশক্তির সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমিকের সংঘাত অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ এ সত্য বহুদিন থেকে প্রচার করে এসেছেন; কবির অর্ঘ, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানিকতলা বোমার মামলা, বারীন ঘোষের ফাঁসির হুকুম, পরে দ্বীপান্তর চালান, বাঙলার সর্ব্বত্র ধরপাকড়, রাজা-কর্ম্মচারী ও প্রজা-দলের হত্যা-পর্ব্ব সব আমরা ছাত্রাবস্থায় যেমন দেখেছি, তেমনি তাদের বিরাট সাহিত্যিক পটভূমিকায় কবি 'গোরা' রচনা করে ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশ করেছেন। পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে এলেও রবীন্দ্রনাথ এযুগে শুধু কবি নন বিরাট জন-নায়ক। তাই ১৯১২ সালে, বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে, তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে তিনি দিয়ে যান—

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে, স্নেহময়ী তুমি মাতা
জনগন দুঃখ, ত্রায়ক জয়হে—ভারত ভাগ্য বিধাতা! জয়হে জয়হে জয়হে—!

অমৃতকথা ও কাহিনী

যীশুখ্রীষ্টের কথা—

—"শিষ্যেরা যীশুর নিকটে এসে বললে, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তখন যীশু একটি শিশুকে আপনার কাছে এনে বললেন, আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি, তোমরা যদি না ফের ও শিশুদের মত না হয়ে ওঠ তবে কোনমতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই যে কেউ নিজেকে শিশুর মত নত করে সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যে কেউ এর মত একটি শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের মধ্যে একজনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবিয়ে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল। বিঘ্ন প্রযুক্ত জগৎকে ধিক! কেননা, বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হয়, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে যার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আর তোমার হস্ত কিম্বা চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তা কেটে ফেলে দিও। দুই হস্ত কিংবা দুই চরণ নিয়ে অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিংবা নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তা উপড়িয়ে ফেলে দিও। দুই চক্ষু নিয়ে অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। দেখো এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করোনা। কেননা আমি তোমাদিগকে বলছি, তাদের দূতগণ সব সময় আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ স্বর্গে সবসময় দর্শন করেন। কোন ব্যক্তির যদি একশত মেষ থাকে, আর তাদের মধ্যে একটি হারিয়ে যায়, তবে কি সে অন্য নিরানব্বইটি ছেড়ে পর্ব্বতে গিয়ে ঐ হারান মেষটির অন্বেষণ করে না? আর যদি সে কোনক্রমে সেটি পায় তবে আমি তোমাদের সত্য বলছি, যে নিরানব্বইটি হারিয়ে যায় নাই, তাদের অপেক্ষা সেইটির জন্য সে বেশী আনন্দ করে। সেইরূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একজনও যে বিনষ্ট হয়, তোমার স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।"

* * * *

—"যীশু বললেন তাঁর শিষ্যদের যে, তোমার ভাই তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে তবে যাও, যখন কেবল তুমি ও সে থাক তখন সেই দোষ তাকে বুঝিয়ে দিও। তা যদি সে শোনে তাহলে তুমি আপন ভাইকে লাভ করলে। কিন্তু যদি সে তা না শোনে, তবে দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তাতেও যদি না কাজ হয় তবে মণ্ডলীকে বল। আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে তাহলে সে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর মত হবে। আমি তোমাদের সত্য করে বলছি, তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু বদ্ধ করবে তা স্বর্গে বদ্ধ হবে। এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গে মুক্ত হবে। পৃথিবীতে তোমাদের দুজন যা কিছু যাচ্ঞা করবে, সে বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্তৃক তাদের জন্য তা করা যাবে। কেননা যেখানে দুই কি তিনজন আমার নামে একত্র হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে আছি।"

* * * *

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

—"আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়। আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। মানুষ প্রতিমা, শালগ্রাম, সকলের ভিতরই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না। অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়ত একটার জন্য আটকে গেল। পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায় অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া ঘুঁটি আর পড়ল না। হারজিত তার হাতে। তাঁর কার্য কিছু বোঝা যায় না। দেখনা ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি। এদিকে পানিফল জলে থাকে, গরম গুণ। মানুষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।"

অনন্যপূর্ব্বা
উপন্যাস
শ্রীসীতা দেবী

অনন্যপূর্ব্বা

শ্রীসীতা দেবী।

সরোজিনী রোজ যেমন ভোরে উঠিয়া দিনের কাজ আরম্ভ করেন, সেদিনও তাহাই করিতেছিলেন। চায়ের যোগাড় করা, বাজারের পয়সা বাহির করিয়া রাখা প্রভৃতি করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মাথাটা ভয়ানক ঘুরিয়া গেল। একটা চেয়ার ধরিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন এবং অজ্ঞানই হইয়া গেলেন।

ভাগ্যে কর্ত্তা বিনোদবাবু সেদিন কি মনে করিয়া সকালেই উঠিয়াছিলেন। পতনের শব্দে তিনি ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহার পর বাড়ীতে রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। সবাই উঠিয়া পড়িল, ঝি চাকর ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। সরোজিনীকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া বিছানায় আনিয়া শোওয়ান হইল।

ডাক্তার আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি গৃহস্বামীর বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে, যদিও বয়সে কিছুটা ছোট। বিনোদবাবুর ছোটভাইয়ের সঙ্গে এককালে কলেজে পড়িয়াছিলেন। নামডাক আছে, পসারও ভাল। বয়স চল্লিশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ভদ্রলোক এখনও বিবাহ করেন নাই।

সরোজিনীর জ্ঞান হইয়াছিল, দু একটা কথাও ক্ষীণস্বরে বলিতেছিলেন। কথা যেন একটু জড়াইয়া বলিতেছেন। বাঁদিকটাও তাঁহার একটু অস্বাভাবিক লাগিতেছে। বাড়ীর কাজ কিভাবে চলিবে বলিয়া ক্রমাগত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেয়ে স্বপ্না বলিল, "তুমি থাম ত বাপু, যেমন করে হয় হবে। ঝি চাকর রয়েছে ত, তারা দু চারটে দিন চালাতে পারবে না?"

সরোজিনী বলিলেন, "ওরা ছাই পারে। না দেখলে কোন কাজ হয়? চাকরটা পারে শুধু চুরি করতে আর ঝি ত গুণের ধুকড়ি, পারে শুধু বাসন ভাঙতে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ওগো অত কথা বোলো না। ডাক্তার হরেন এসে গিয়েছেন। অত কথা বলছ শুনলে রাগারাগি করবেন।"

ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ সেন আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ভদ্রলোক দেখিতে বেশ ভালই, তবে রগের কাছে দু চার গাছা চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। দৈর্ঘ্যে মাঝারি, তবে দেহ সুগঠিত ও মেদবর্জ্জিত হওয়ায় তাঁহাকে লম্বাই দেখায়। অন্যসময় ফিট্‌ফাট্ সাহেব সাজিয়াই থাকেন। এখন খুব তাড়াতাড়িতে আসিতে হইয়াছে বলিয়া ধুতি পরিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি বাধালেন আবার? এত করে বলি যে বয়স বাড়ছে, সেটা একটু মনে রাখুন। তা মনে রাখেন উল্টো দিকে। বয়স বাড়ছে, অনিয়মও বাড়ছে, খাটুনিও বাড়ছে।"

সরোজিনী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাড়ীর গিন্নীর বিশ্রাম কোথায়? এই ত শুয়েছি, তা বাড়ীর লোকের না হয়েছে চা খাওয়া, না হয়েছে ভাঁড়ার দেওয়া বা বাজারে পাঠান।"

ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "কেন স্বপ্না কিছু পারে না? সে ত মস্ত মেয়ে হয়ে গেল। এর পর ত নিজের সংসারই দেখতে হবে।"

স্বপ্না কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। ফরসা মুখখানা লাল করিয়া বলিল, "আমাকে কিছু করতে দিলে ত? মায়ের কারো কাজ ত পছন্দই হয় না। না করে ত আর শেখা যায় না?"

ডাক্তার বলিলেন, "করতে আবার দেবে কে? বাড়ীর কাজ নিজে জোর করে নিয়ে করবে।"

সরোজিনীর blood pressure মাপা প্রভৃতি সব রকম পরীক্ষা হইয়া গেল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন আর গিন্নীগিরি করার চেষ্টা করবেন না। অল্পের উপর দিয়ে গেল, এর চেয়ে ঢের বেশী serious হতে পারত। একেবারে চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে, বেশ কিছু দিন। কোনো অজুহাতেই উঠ্‌বেন না। নার্স আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে দেখবে, বাড়ীর কাজেও স্বপ্নাকে সাহায্য করবে। সংসারের কাজ না হয় একটু লণ্ডভণ্ড করেই হবে। এই prescription-টা আমি নিয়েই যাচ্ছি। সঙ্গে একজন লোক দিন, সে ওষুধটা নিয়ে আসবে। আর স্বপ্না মাকে দেখবে, নিয়মমত যেন ওষুধ খান, আর একেবারেই যেন না ওঠেন।"

স্বপ্না মুখ ভার করিয়া বলিল, "কি করে যে কাজ চলবে, তাই ভাবছি। আমি সত্যিই কোনোদিন কিছু করিনি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শিখতে আরম্ভ করতে হবে ত কোনো সময়? এই সুযোগ বা দুর্যোগ যাই বল, ঐটাকেই কাজে লাগাও। আচ্ছা, চলি এখন, নার্স আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন, বাড়ীর একমাত্র চাকর বিধু তাঁহার পিছন পিছন চলিল।

হরেন্দ্রনাথের ডিস্‌পেন্‌সারি বড় ট্রাম রাস্তার উপরেই। গাড়ী থামাইয়া সেইখানে নামিয়া দেখিলেন দুজন কম্পাউণ্ডার দুইরকম কাজে ব্যস্ত। বড় বীরেন একজন খরিদ্দারের জন্য ঔষধ গুছাইতেছে। ছোট ঋষিকেশ একখানা সিনেমা সংক্রান্ত মাসিকপত্র লইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছে।

হরেন্দ্রনাথ ঢুকিতেই সে ধড়মড় করিয়া বই ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল। হরেন্দ্র বলিলেন, "তুমি এই চিঠি দুটো নিয়ে যাও। হাসপাতালেই এঁদের এখন পাবে। এখনই হয়ত লোক পাওয়া যাবে না, দু চার ঘণ্টা দেরি হতে পারে। চিঠিতে সব লিখে দিয়েছি। তোমায় আর কিছু করতে হবে না, শুধু চিঠিগুলো ঠিক জায়গায় পৌছেছে, এই খবর তুমি নিয়ে আসবে। এখানে আমাকে না পাও, বাড়ী গিয়ে খবর দেবে।" ঋষিকেশ জুতায় পা গলাইতে গলাইতে চিঠি দুখানা লইয়া বাহির হইয়া গেল। ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া হরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ রোগী দেখিলেন, ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ দিলেন। তাহার পর উঠিয়া বাড়ী চলিলেন। নাওয়া খাওয়া ও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করা ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁহার বিশেষ নাই। তিনি অবিবাহিত, মা বাবা দেশে থাকেন। ভাই বোনেরা নিজের নিজের সংসারে আছেন। বাড়ীখানা তাঁহার নিজের। একলা মানুষের অতবড় বাড়ীর কোনো প্রয়োজন হয় না, তাই একতলার অধিকাংশ ঘর ভাড়া দেওয়া আছে, একটি ঘর শুধু তিনি রাখিয়াছেন, রোগী দেখার জন্য। উপরে তিনি থাকেন ও তাঁহার এক খুড়তুতো ভাই রমেশ থাকে। সেও ডাক্তারী পড়িতেছে। আত্মীয়-স্বজন কলিকাতায় আসিলে মাঝে মাঝে বাড়ীর অন্য ঘরগুলি ভরিয়া ওঠে, বেশীর ভাগ সময় বাড়ী চুপচাপ নিস্তব্ধ পড়িয়াই থাকে।

বাড়ীতে গিয়া স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার চিঠির উত্তর আসিল।

নার্স তখনই পাওয়া যায় নাই, তবে বারোটার মধ্যেই পাওয়া যাইবে বলিয়া একজন ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। আর একজন লিখিয়াছেন যে কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি লোক জোগাড় করিয়া দিবেন। বিনোদবাবুর বাড়ীর পরিস্থিতি ভাবিয়া হরেন্দ্রনাথের হাসি পাইল। বিনোদবাবু খুব কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ নয়, গৃহিণীই তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেন। আর স্বপ্না ত কোনো কাজে হাত দিতেই ভয় পায়, এবং নিজের অকর্ম্মণ্যতার জন্য মা-ই যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী এইটা প্রমাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। তাহারা বোধহয় এতক্ষণে মাথার চুল ছিঁড়িতেছে। তাহাতে কোনও আপত্তি ছিল না, তবে সরোজিনী পাছে সকলের দুরবস্থা দেখিয়া উঠিয়া পড়েন, এই ভাবিয়া হরেন্দ্রনাথ একটু শঙ্কিত হইলেন।

বিনোদবাবুদের বাড়ীর অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। কোনোমতে ঠাণ্ডা চা খাইতেই আটটা বাজিয়া গেল। তাহার পর চাকর ঔষধ লইয়া ফিরিতে দেরি করিল, সুতরাং বাজার করা, রান্না করা সব কাজেই অনেক দেরি হইল। দুপুরের খাওয়া সারিতেই বেলা গড়াইয়া গেল। স্বপ্না যখন প্রায় কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে, তখন ঝি আসিয়া বলিল, "একজন মেয়েলোক এয়েছে দিদিমণি। বলছে ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

স্বপ্না ছুটিয়া গেল, দরজার কাছে। একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, বছর বাইশ তেইশ বয়স হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, বেশ বড় চোখ, নাকমুখের কাট বেশ ভাল। মুখখানা স্বপ্নার ভাষায় "বেশ bright," তবে মুখখানা গম্ভীর। খোঁপাটাও বেশ উঁচু হইয়া আছে, মাথার কাপড়ের তলায়। কিন্তু সাজসজ্জা বিধবার মত। হাতে কোনো গহনা নাই, শাদা ব্লাউস ও ফিতা পাড় শাড়ী পরা। পাড়ের রংটাও কাল। হাতে খুব ছোট একটা স্যুট্‌কেস্।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি নার্স? ডাঃ সেন পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

মেয়েটি বলিল, "হ্যাঁ, আমিই নার্স। ডাঃ সেন পাঠাননি ঠিক, তিনি ডাঃ গুপ্তকে চিঠি দিয়েছেন, তিনি আমায় পাঠালেন।"

স্বপ্না বলিল, "ভিতরে আসুন। আপনি খেয়ে এসেছেন ত?"

মেয়েটি বলিল, "খেয়েই এসেছি।" বলিয়া স্বপ্নার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সরোজিনীর ঘরের সামনে দাঁড়াইল। স্বপ্না তাহাকে ঘরে ঢুকিতে বলাতে পায়ের স্যাণ্ডাল্ খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ঘরের এক কোণে নিজের সুটকেস্ নামাইয়া রাখিল। বিছানার কাছে আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ?"

স্বপ্না বলিল, "Blood pressure বেশী, আজ সকালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু ত একেবারে শুইয়ে রাখতে বলেছেন। আচ্ছা, আপনার নাম কি? কি বলে ডাকব?"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম বিনতা।"

সরোজিনী এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিনতাকে দেখিতেছিলেন। অতিশয় অল্পবয়সী, স্বপ্নার চেয়ে বড় জোর তিন চার বৎসরের বড় হইবে। দেখিতেও ত ভালই বলিবে লোকে। গৃহিণীর মেজাজটা একটু খারাপ হইয়া গেল। এত অল্প বয়সী মেয়ে কাজ করিতে বেশী পারিবে না, বা পারিলেও চাহিবে না। ঘর-সংসারে সাহায্য করিতে পারিবে ডাক্তারবাবু বলিলেন, কিন্তু এ কি জানে কিছু? আজকালকার মেয়েরা ঘাড়ে সংসার যতদিন না চাপিয়া বসে, ততদিন কিছু শেখে না, কিছু করিতে চায় না। আরো কথা এই যে, মেয়েটির স্বভাব চরিত্র কেমন কে বা জানে? গৃহিণী একটু সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। বাড়ীতে বড় ছেলে

আছে, কর্ত্তা স্বয়ং আছেন। দুজনেই এখনও বিপদে পড়িবার বয়সের গণ্ডির মধ্যেই আছেন। তবে পোষাকে-আশাকে মেয়েটি অতিশয় সাদাসিধা। বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নার্সের কাজ কতদিন করছ?"

বিনতা বলিল, "তা এক বছরের উপর হয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সব কাজ জান?"

বিনতা বলিল, "সবই শিখে নিয়েছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "সংসারের কাজকর্ম্ম?"

বিনতা বলিল, সে সমস্তই জানি। যা করতে বলবেন, সবই পারব।"

সরোজিনী বলিলেন, আজ সকাল থেকে যে কি আথান্তর, তা তোমায় কি বল্‌ব বাছা। নাওয়া, খাওয়া, রান্না, বাজার কোনো কিছু কি ঠিক মত হয়েছে? আমার দশা দেখ। চান না করে পড়ে আছি সকাল থেকে। কি যে খেয়েছি তা ভগবান জানেন।"

বিনতা বলিল, "দেখি, আমি কতটা করে উঠতে পারি।" সে ক্ষিপ্র হাতে ঘরখানা গুছাইতে লাগিল। স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা সব জানিয়া লইল। সময় হইয়াছে দেখিয়া একদাগ ঔষধ খাওয়াইয়াও দিল। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ আছে জানিয়া জল গরম করিতে বসাইয়া দিয়া আসিল। স্বপ্না অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল যে এই মেয়েটি যেন তাহার মায়ের চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং বেশ পরিপাটি করিয়া করে। ঘণ্টা দেড়ের ভিতর বাড়ীর চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল। রোগিণী ঔষধ পথ্য সেবন করিয়াছেন। তাঁহার গা মোছান, কাপড় ছাড়ান, চুল বাঁধা সবই হইয়া গিয়াছে। ঘরটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সরোজিনীর মুখের ভাবেও একটু প্রশান্তি আসিয়াছে। বাড়ীর আর সকলে এখন চা খাইতে বসিয়াছে। দেরি হইয়া যাওয়ার খালি এইটুকু চিহ্ন অবশিষ্ট আছে, যে জলখাবারটা আজ বাড়ীতে তৈয়ারী নয়, কিনিয়া আনা হইয়াছে।

সকলের জন্য চা ঢালিয়া দিয়া বিনতা বলিল, "আমি তাহলে আমার চা-টা নিয়ে শোবার ঘরে যাই, মায়ের যদি কিছু দরকার হয়?"

স্বপ্নার ইচ্ছা ছিল যে বিনতা তাহাদের সঙ্গেই বসিয়া খায়। সে একবার বিনোদবাবুর দিকে তাকাইল। তিনি কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া সেও ভয়ে কিছু বলিল না। মায়ের আবার যা জাত-বিচারের ঘটা, বিনতা কি জাত তাহা স্বপ্না জানে না। সুতরাং সে টেবিলে বসিয়া সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খাইলে জাত যাইবে কিনা তাহাও সে বলিতে পারে না। বিনতা চা লইয়া চলিয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে ডাক্তারের গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। বিনোদবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। ধীরে-সুস্থে চা জলখাবার শেষ করিয়া স্বপ্না তাহার পিছন পিছন চলিল।

হরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে ঢুকিয়াই বলিলেন, "কি খবর?"

বিনোদবাবু বলিলেন, "খানিকটা ভালই ত বোধ হচ্ছে।"

"নার্স পেয়েছেন?"

কর্ত্তা বলিলেন, "পেয়েছি, বেশ ভালই কাজ করছে।"

হরেন্দ্রনাথ রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন যে ঘরখানির চেহারা এবং রোগিণীর মুখের চেহারা একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। রোগিণীর মাথার কাছে একটি মেয়ে বসিয়াছিল, হরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইল ও নমস্কার করিল। এই নাকি নার্স? এত কম বয়স? দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবে কি?

সরোজিনীকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন এবেলা?"

"অনেকটা ত ভাল মনে হচ্ছে।"

"ওষুধ পথ্য সব ঠিক ঠিক খাচ্ছেন ত? উঠবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করেন নি?"

সরোজিনী বলিলেন, "যা দশা হয়েছিল সকালে, তাতে উঠে পড়বারই কথা। তবে দুপুরে বিনতা এল, তখন থেকে কাজ ঠিক মতই হচ্ছে।"

ডাক্তার বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার গুপ্ত পাঠিয়েছেন আপনাকে?"

বিনতা বলিল, "হ্যাঁ।"

"উনি আপনাকে আগে আগেও কাজে পাঠিয়েছেন?"

বিনতা বলিল, "হ্যাঁ, তিন চারবার উনি আমাকে কাজ দিয়েছেন।"

"আপনি কতদিন নার্সের কাজ করছেন?"

বিনতা বলিল, "দেড় বছরের কাছাকাছি হবে।"

হরেন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এইবার ত তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে হচ্ছে। স্বপ্নার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, "স্বপ্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, এই কথা শুনিবামাত্র সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

সরোজিনী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "ওমা তাই নাকি? এই ত সত্যিকারের বন্ধুর কাজ। আমার ত মুখে পোকা পড়ে গেল বকতে বকতে, কিন্তু কে শুনছে কার কথা? তা কোথা থেকে সম্বন্ধ এল শুনি একটু! ও বাছা বিনতা, তুমি যাও ত ওকে একটু এঘরে আসতে বল, একসঙ্গেই শুনি। সত্যি যা আমার দশা হয়েছে, এখন মেয়ের বিয়ে-টিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। হট্ করে কোনদিন চলে যাব, তখন কর্ত্তা যে কি করবেন, তিনিই জানেন।"

বিনতা ঘর হইতে বাহির হইতেই হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়েটি বেশ ভাল কাজ করছে?"

সরোজিনী বলিলেন, "কাজ ত খুব ভাল করছে। যেমন আপনি বলেছিলেন, ঘরের কাজও করছে আমার কাজও করছে। তবে বড় ছেলেমানুষ যে?"

ডাক্তার বলিলেন, "তাতে আর এসে গেল কি? অল্পবয়সে মানুষের খাটবার ক্ষমতা বেশী থাকে।"

সরোজিনী বলিলেন, "তা থাকে বটে, তবে কাজ করার ইচ্ছাটা থাকে না। আর তা ছাড়া ছেলেমানুষ মেয়ে বাড়ীতে রাখতেও ভয় করে আমার। নানারকম লোকজন আসছে যাচ্ছে ত?"

হরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন "নাঃ, আমাদের দাদাকে আপনি একেবারেই বিশ্বাস করেন না দেখছি। ভদ্রলোকের মাথার চুল পেকে গেল, এখনও তাঁকে চোখে চোখে রাখতে চান? আর ছেলের বয়স ত নগদ ষোলো, তার জন্তেও আপনার ভয় আছে নাকি?"

"আহা ওদের জন্তে ভয় করে তাই কি আর আমি বলছি? তবে মেয়েটির বিষয় কিছুই ত জানি না আমি? কাদের মেয়ে কি বিত্তান্ত? এই যে সংস্কৃতে বলে না যে অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়ীতে রাখতে নেই, তাই আর কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "রাখুন ত আপনি। একেই কাজের লোক পাওয়া যায় না, তার উপর আবার

যদি স্বভাব চরিত্রের সার্টিফিকেট চাইতে হয়, তাহলে লোক আর পাওয়াই যাবে না। ডাক্তার বা নার্স নিজের কাজটা ভালমতে জানে কিনা, এটাই জিজ্ঞাস্য, তা'র স্বভাব চরিত্র যেমনই হোক। এই যে আমি মাসে পঞ্চাশবার হুট্হাট্ করে ঘরে ঢুকি, আমার বিষয়েই বা আপনি কি জানেন?"

সরোজিনী বলিলেন, "কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনি আর অন্য লোক? নিজের ভাই বা দেওর যদি হতেন, তাহলেও ত এর চেয়ে বেশী বিশ্বাস করতে পারতাম না।"

এমন সময় বিনতা ও বিনোদবাবু আসিয়া ঢোকাতে তাঁহাদের এমন মুখরোচক আলোচনাটা থামিয়া গেল।

বিনোদবাবু একটু ব্যস্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, না জানি ডাক্তার সরোজিনী সম্বন্ধে কি বলিবেন। তবে ঘরে ঢুকিয়াই শুনিলেন যে হরেন্দ্রনাথ স্বপ্নার জন্য একটা বিবাহের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, শুনিয়াই তাঁহার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম, শুনি একটু। পাত্রটি কে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'পাত্রটি আমারই আত্মীয়, তবে খুব নিকট আত্মীয় নয়। দূর সম্পর্কের এক মামাতো ভাইয়ের ছেলে। এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, চাকরিও পেয়েছে। বাপ মা বর্ত্তমান, এবং ওর উপর নির্ভর করেন না। ভাই বোন যারা আছে, তারা এর চেয়ে বড়, কাজেই এর কোনো ঝামেলা নেই। সুতরাং মনে হল, পাতে দেওয়া চলতে পারে।"

বিনোদবাবু এবং তাঁহার পত্নী দুজনেই সমস্বরে বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়ই, কোনোদিক দিয়েই মন্দ শোনাচ্ছে না। তা তাঁরা মেয়ে কেমন চান? ছেলের বয়স কত?

"বয়স হবে ছাব্বিশ সাতাশ। মেয়ে অবশ্য তাঁরা আশ্চর্য্যরকম কিছু চান না। সাধারণতঃ লোকে যা চায় তাই আর কি? দেখতে মোটামুটি ভাল, লেখাপড়াও খানিক জানে, এবং বাপের অবস্থা কাজ চলা গোছ সচ্ছল। তবে ছেলেটির একটু ফরসা বউ লাভের আগ্রহ আছে, তাই স্বপ্নার কথা চট্ করে মনে হল। ওর বয়স হল কত?"

সরোজিনী বলিলেন, "আঠারো।"

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ইয়ারে পড়ছে?"

বিনোদবাবু বলিলেন, "এই ত সেকেণ্ড ইয়ার শেষ হল, সামনের মাসে টেষ্ট্।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহলে এঁদের যদি মেয়ে পছন্দ হয়, এবং যদি দরে আপনাদের বনে তাহলে পরীক্ষা দেওয়া অবধি অপেক্ষা করবেন, না আগেই দিয়ে দেবেন?"

সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওমা অপেক্ষা আবার কেন করতে যাব? ঠিক হলে বিয়ে দিয়েই দেব। বিয়ের পর কত মেয়ে পরীক্ষা দেয়, ও তাই দেবে না হয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি ত আন্দাজে অনেক কিছু বলে দিলাম তাদের, এখন যাচাই করে নিতে হবে যে আমার কথাগুলো ঠিক কিনা। চেহারা ত ঠিকই বলেছি, পড়াশুনোর কথাটাও ঠিকই বলেছি। আচ্ছা, গান করে না ও? ওদের ত আমি বলে দিলাম গান জানে মেয়ে। অনিল, মানে আমার ঐ ভাইপোটির, একটু গানের বাতিকও আছে।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "গান জানে বলা চলে, তবে খুব যে ওস্তাদ গাইয়ে তা কিছু নয়। মাষ্টার ত এখনও হপ্তায় দুদিন এসে শেখাচ্ছে। তা বসে খান দুই গান শুনিয়ে দিতে ও পারবে।"

সরোজিনী কাজের কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "তা ওঁরা ত মেয়ে দেখতে চাইবেন একবার? এখানেই আছেন ত সব?"

ডাক্তার বলিলেন, "ছেলে আর তার বাবা ত আমার বাড়ীতেই এসে উঠেছেন। মেয়ে দেখতে চাইবে বই কি? আমার কথার আর মূল্য কি বলুন? যে মানুষটা নিজে এত বয়স অবধি একটা বউ জোটাতে পারল না, সে আর বউয়ের ভাল মন্দ কি বুঝবে? নিজেরাই দেখে যাক্।"

গৃহিণী বলিলেন, "আর আমি রইলাম এখন চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে, এখন এ সবের ব্যবস্থা করে কে? মেয়ে দেখানোর জোগাড়-জাগাড় ত আছে? চারটিখানি কথা ত নয়?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই বলে আপনি যেন এখনি উঠে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবেন না। তাহলে আমি ওদের ভাগিয়ে দেব। আমি তাদের বলেইছি যে মেয়ের মা এখন সম্প্রতি অসুস্থ আছেন। কাজেই খুব formally, ঘটা করে মেয়ে দেখা এখন হবে না। এমনি যেন বেড়াতে আসছি, এমনি ভাবেই একদিন তাদের নিয়ে আসব। আমি আসব, ওরা বাপ বেটা দুজনে আসবে, আর ছেলের প্রাণের বন্ধু একজন থাকে এখানে সেও আসবে হয়ত। এই চারজনের বেশী না। আপনারাও স্বপ্নার দু একজন বন্ধু ছাড়া আর কাউকে ডাকবেন না। একটু চা জলখাবার খাবে, গান শুনবে, গল্প করবে চলে যাবে। আমি খুব বেশীক্ষণ তাদের এখানে বসে বক্ বক্ করতে দেব না। জলখাবার যদি আপনি বাজার থেকে কিনে এনেও খাইয়ে দেন ত তারা কিছু মনে করবে না। ও সব খুঁত মেয়েরাই বেশী ধরে, তা এদের সঙ্গে মেয়ে কেউ আসছে না।"

সরোজিনী বলিলেন, "ঐ ফাঁকে দিলেন শুনিয়ে আমাকেও একটা কথা। তা বাজারের জলখাবার খাওয়াব না একেবারে। আমার চাকর অনেক দিনের, জলখাবার খানিক খানিক করতে জানে। বলে দিলে পারবে। যেদিন আসবেন আপনারা, তার দুদিন আগে জানাবেন যেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়। আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে সব plan করুন, আনন্দের আতিশয্যে যেন এখনি উঠে বসবেন না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

২

ডাক্তার বাহির হইয়া যাইবামাত্র বাড়ীর আর যে যেখানে ছিল, সবাই আসিয়া ঘরে ঢুকিল। স্বপ্না নিজে, তাহার ছোট ভাই নীরেন ও সর্ব্বকনিষ্ঠা বীণা। বাড়ীর ঝি চাকর দুইজনও আসিয়া জুটিল, তবে স্বপ্নার বাবা এই সময় কি কাজে বাহির হইয়া গেলেন।

স্বপ্না ঢুকিয়াই বলিল, "খুব বলে দিলে গান গাইতে পারে, আমার সঙ্গে বাজাবে কে? আমার ত সঙ্গে বাজনা না থাকলেই scale ভুল হয়ে যায়। নিজেও বাজিয়ে গাইতে পারি না। আর মাষ্টার মশায় ত দু হপ্তার জন্যে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন।"

সরোজিনী বলিলেন, "এই নাও সারল এখন। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই যে বাজাতে পারে?

"হ্যাঁ আমার বন্ধুরা ত সাক্ষাৎ তানসেন, বাজাতে জানেই না কেউ।"

নীরেন বলিল, "বরকেই বাজাতে বলিস দিদি।"

সরোজিনী বলিলেন, "নাও আর কাজলামি করতে হবে না। আমি মরছি ভেবে, এখন উনি এলেন রস করতে।"

বিনতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "অত বেশী কথা বলবেন না আপনি, ওতে pressure বেড়ে যেতে পারে।

সরোজিনী বলিলেন, "আমাকে চুপ করতে দিচ্ছে কে? এমন একটা ভাল সম্বন্ধ এল, তা গোড়াতেই প্রতিবন্ধক দেখ। গান ভালবাসে ছেলে, অথচ মেয়ে যদি প্রথমে সেটাই না পারে, তাহলে ওর মন খিচ্‌ড়ে যাবে না?"

বিনতা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কি গান করেন আপনি? রবীন্দ্র সঙ্গীত না classical?"

স্বপ্না বলিল, "classical গাইবার মত গলা আমার নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতই শিখছি এখন। আধুনিক গান বাবা বড় অপছন্দ করেন, তাই ওটা শিখি না।"

বিনতা বলিল, "রবীন্দ্র সঙ্গীত হলে আমি সঙ্গে বাজিয়ে দিতে পারি, অভ্যাস আছে আমার। যেদিন গাইবেন, তার আগের দিন বলবেন, আপনার সঙ্গে একটু প্র্যাক্‌টিস্ করে নেব।"

সরোজিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, "কোন গুণটা যে তোমার নেই বাছা তাই ভাবি। যাক, এখন অন্যদিকে মন দিতে পারব।"

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিতেই সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা মেয়ে দেখতে আসার দিন কিছু কি ঠিক করলেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অসুখ-বিসুখ সব ভুলে গেছেন বুঝি? এখন শুধু ঐ এক চিন্তা? আসব এখন পরশু বিকেল বেলা।" বলিয়া বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওষুধপত্র ঠিক মত খাচ্ছেন ত? অনিয়ম কিছু করেননি?"

বিনতা বলিল, "ওষুধ ঠিকই খেয়েছেন, অনিয়ম কিছু করেননি।"

সরোজিনী বলিলেন, "যা কড়া নার্স পাঠিয়েছেন, পান থেকে চুন খসবার জো নেই ওর কাছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "ঐ বয়সের অন্য মেয়ের পক্ষে যা নিন্দে, নার্সের পক্ষে তাই প্রশংসা।"

সরোজিনী হঠাৎ বিনতার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বয়স কত হয়েছে গা মেয়ে? আমার স্বপ্নার চেয়ে বড়ই ত হবে?"

বিনতা বলিল, "ওঁর চেয়ে আমি অনেক বড়, আমার বয়স তেইশ।"

হরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "অত বড়ও ত দেখায় না। বোধহয় মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যে বাড়িয়ে বলছে।"

তিনি অতঃপর উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আপনি ত আস্তে আস্তে ভালর দিকেই এগোচ্ছেন, আমার দুবার আসবার কোনো দরকার নেই। কাল সকালে আসব না, সন্ধ্যার সময় আসব। আপনাকে ভাল হাতে রেখে যাচ্ছি, অসুবিধা কিছু হবে না। তবে দরকার মনে করেন ত খবর দেবেন", বলিয়া বিনতার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

সরোজিনীর তখনই কিছু কাজ ছিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি যাও না বাছা, ছাদ থেকে একটু ঘুরে এস স্বপ্নার সঙ্গে। সারাদিন ঘরে বন্ধ হয়ে আছ। ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে যাস্ ত রে স্বপ্না।"

স্বপ্না বাবাকে ডাকিয়া দিয়া বিনতাকে লইয়া চলিল। উঠিতে উঠিতে বলিল, "আচ্ছা বিনতাদি, আপনি লেখাপড়াও অনেক করেছেন নাকি?"

বিনতা বলিল, "না ভাই ; গরীবের মেয়ে আমি, বেশী পড়াশুনো করবার অবকাশ পেলাম কোথায় ? বাড়ীতে পড়ে কোনোমতে ম্যাট্রিক পাস করেছি। তারপর নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে আসতে হল, আর রোজগার করতে ঢুকতে হল আর পড়াশুনা করতে পারিনি। যখন কাজে থাকি না, তখন ঘরে পড়বার চেষ্টা করি, কিন্তু আর পরীক্ষা দিতে পারব কিনা জানি না।"

স্বপ্না চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বিনতাই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পরশু কি গান গাইবেন, ঠিক করেছেন কিছু ?"

স্বপ্না বলিল, "অনেক বেশী গান ত এখনও শিখিনি। ভাবছি একটা শরতের গান গাইব আর একটা হেমন্তের গান গাইব। বেশ সহজ সুর দেখে বেছে নেব।"

"তাই নেবেন", "বলিয়া হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তুলিল বিনতা, জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ডাক্তারবাবু আপনাদের আত্মীয় নাকি ?"

স্বপ্না বলিল, "না, আমার কাকার সঙ্গে কলেজে পড়েছেন কিনা, তাই দাদা বলেন বাবাকে। অসুখ-বিসুখ হলে উনিই দেখেন আমাদের। মায়ের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসাও করেন, তবে এমনিতে একটু বেশী গম্ভীর বলে আমরা তাঁর ধারে কাছে বেশী ঘেঁসি না।

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "বর যিনি আসছেন দেখতে, ওঁরই আত্মীয় ত তিনি ?"

স্বপ্না মাথা সঞ্চালনে জানাইল, তাহাই বটে। তাহার পর অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

পরের দিনটা আগাগোড়া হৈ-চৈ করিয়া কাটিয়া গেল। কি জলখাবার করা হইবে, স্বপ্না কি পরিবে, কে তাহাকে সাজাইবে, কি গান গাহিবে সে ইত্যাদি। সরোজিনী ক্রমাগত কথা বলিয়া চলিলেন, বিনতা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে থামাইতে পারিল না। তবে উঠিতে সে তাঁহাকে কিছুতেই দিল না এবং ঔষধ পথ্যও যথাসময়ে খাওয়াইয়া ছাড়িল।

তার পরের দিন কনে দেখার পালা। বিধু বাজারে গেল বেশ কিছু টাকা লইয়া। তাহার মাথার ভিতরটা গজগজ করিতে লাগিল, সরোজিনীর অসংখ্য নির্দ্দেশে। স্বপ্না এবং বিনতা মিলিয়া বসিবার ঘরটা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিল। স্বপ্নার দুই সখীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান হইল। তাহারা এই পাড়াতেই থাকে, কাজেই বেশীদূর যাওয়া করিতে হইল না, তাহাদের জন্য। কাপড় জামা, মায়ের নির্দ্দেশমত স্বপ্না বাহির করিয়া রাখিল, এবং বিনতার সঙ্গে বসিয়া গান দুইটিও একবার অভ্যাস করিয়া লইল। সকলেই শুনিয়া বলিল সে নির্ভুলভাবেই গাহিতে পারিবে। দুপুর বেলার খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সারিয়া সকলে বিকালের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রান্নাঘর হইতে নানারকম খাবারের সুগন্ধ ত বীণা ও নীরেনকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

স্বপ্নার বন্ধুদের আগে আগে আসিতে বলা হইয়াছিল। তাহারা ত উৎসাহের আতিশয্যে তিনটার সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাড়াহুড়া করিয়া স্বপ্নাকে গা ধোওয়াইয়া সাজাইতে বসিয়া গেল। এসব পর্ব্ব চলিতে লাগিল সরোজিনীর শোবার ঘরেই, কারণ তিনি সব কিছু দেখিতে চান। স্বপ্নাকে কাপড় পরান হইতেছে এমন সময় তাহার মা বলিলেন, "আচ্ছা বিনতা, তুমিও ত বসবে ওদের সঙ্গে ? তা এ রকম সাদা কাপড় পরে যেও না, সবাই সেজেগুজে এসেছে। স্বপ্নার একখানা ভাল শাড়ী বার করে দিক তোমার জন্যে ?"

বিনতা কি একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, "থাক মা, অনেক ভেবে-চিন্তে ও সব ছেড়ে দিয়েছি, আর ধরব না। আমি পিছনেই থাকব।"

কনেকে সাজান হইয়া গেল। বিধু আসিয়া খবর দিল খাবার করা হইয়া গিয়াছে এবং সে সমস্ত জিনিস জাল আল্‌মারীতে তুলিয়া রাখিয়াছে। সরোজিনীর নির্দ্দেশমত বরপক্ষের চারজনের জন্য খাবার প্লেটে করিয়া সাজাইয়া রাখা হইল। বাড়ীর লোকদের পরে যেমন তেমন করিয়া দেওয়া যাইবে এখন। বসিবার ঘরে ছোট-খাট একটা ফরাস পাতিয়া দেওয়া হইল। মেয়েরা এখানেই বসিবে, গান বাজনা করিবে।

বরপক্ষ আসিতে কিছু দেরি করিল না। হরেন্দ্রনাথ অতিশয় সময়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, সর্ব্বদা ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া চলেন। অন্দরের বিনোদবাবু অভ্যর্থনা করিয়া বাহিরের ঘরে বসাইলেন। ডাক্তার চলিলেন রোগিণীর ঘরে তাঁহাকে দেখিবার জন্য। সেইখানেই কনে, তার বন্ধু-বান্ধব সকলকেই পাইলেন। স্বপ্নাকে বলিলেন, "বাঃ, দিব্যি দেখাচ্ছে, তোমাকে ঠিক পছন্দ করবে। গানটা ঠিকমতো কোরো।" সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উৎসাহের চোটে কোনো অনিয়ম করেননি ত?"

সরোজিনী বলিলেন, "বিশ্বাস না হয়, বিনতাকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার নার্স আপনাকে মিথ্যাকথা বলবে না।"

হরেন্দ্রনাথ তাহার দিকে তাকাইতেই বিনতা বলিল, "ওষুধ পথ্য সব ঠিক ঠিক খেয়েছেন। বিছানা থেকে নামেননি।"

ডাক্তার উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল, আর কয়েকটা দিন এই রকম লক্ষ্মী হয়ে থাকুন, তাহলেই এবারকার মত উৎরে যাবেন। এখন তোমরা চল ত সব বসবার ঘরে। তোমার বাবা সেখানেই আছেন।"

মেয়ের দল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। বিনতাকেও তাহাদের সঙ্গে যেতে দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইলেন, তবে কিছুই বলিলেন না।

বিনোদবাবু একটু আড়ালেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে চা দিয়ে দেব নাকি?"

"অত তাড়াতাড়ি কি দরকার? একপালা চা ত খেয়েই বেরিয়েছে, যাবার আগে আর একবার খাবে এখন। আলাপ পরিচয় করুক আগে, গানটান শুনুক।" হরেন্দ্রনাথ নিজেই সকলের সঙ্গে স্বপ্নার আলাপ করাইয়া দিলেন, "ইনি আমার দাদা, রসিকলাল, এই তাঁর ছেলে অনিল, এইটি অনিলের বন্ধু মৃগাঙ্ক। আর এটি যে স্বপ্না তা সকলে বুঝতেই পারছেন।"

স্বপ্না রসিকলাল ও হরেন্দ্রকে প্রণাম করিল, যুবকদ্বয়কে নমস্কার করিয়া সঙ্গিনীদের মধ্যে বসিয়া পড়িল। রসিকলাল তাহাকে মামুলি গোটাকয়েক প্রশ্ন করিলেন, সে সন্তোষজনক উত্তরই দিল।

তাহার পর ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি বেশ গান কর শুনেছি, আমাদের দু একটা শুনিয়ে দাও?"

স্বপ্না পিছনে উপবিষ্ট বিনতার দিকে চাহিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া হারমোনিয়মের সামনে বসিল। গান আরম্ভ হইল।

স্বপ্না প্রথমে গাহিল, "শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।" কোনো ভুল না করিয়া গান শেষ করিল, তবে গলা খুব উঠিল না। আর একটি গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া এবার গাহিল "হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলি", এটাও চলনসই একরকম হইল। উপরি উপরি দুবার গাহিয়া স্বপ্না একেবারে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এবার অন্য একজন গাও, ও একটু বিশ্রাম নিক্।"

অনেক ঠেলাঠেলিতেও স্বপ্নার বন্ধুরা রাজী হয় না। স্বপ্না তখন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "বিনতাদি, তুমি ভাই একটা গাও, নইলে কি মনে করবেন ওঁরা?"

সম্মতিসূচক একটু ঘাড় নাড়িয়া বিনতা আবার হারমোনিয়ম টানিয়া লইল। মুখের ভাবটার উপর আরো যেন একটু বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। তার পর মধুর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে গান ধরিল, "এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে।"

হরেন্দ্রনাথ হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া, সোজা হইয়া ব'সলেন। এই বয়সে এমন গান কেন? মুখের ভাবই বা এমন কেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুন্দর গলা। ইহার গান ত একটা শুনিয়া তৃপ্তি হয় না? স্বপ্ন'র জন্ম তাঁহার একটু ভাবনা হইল। এমন গানের কাছে ত তাহার ছেলেমানুষী গান দাঁড়াইতে পারে না। যুবকদ্বয়ের দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখিলেন। তাহারা একেবারে তন্ময় হইয়া শুনিতেছে।

একটা গান শেষ হইবামাত্র চারজন শ্রোতাই সমস্বরে আর একবার গান গাহিবার অনুরোধ জানাইলেন। এবারে সে আর রবীন্দ্র সঙ্গীত না করিয়া মীরাবাইয়ের একটি ভজন গান ধরিল।

গান শুনিবার আরো ইচ্ছা ছিল সকলের, তবে হরেন্দ্রনাথই থামাইয়া দিলেন। ইহাকে একটানা এখানে এতক্ষণ বসাইয়া রাখা উচিত নয়। সরোজিনীর কিছু প্রয়োজন হইতে পারে। আর স্বপ্নার দিক হইতে সকলের মন যদি একেবারে সরিয়া যায়, সেটাও ঠিক নয়। কাজেই দ্বিতীয় গান শেষ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "আপনাকে আর বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। আপনার patient বোধ হয় একেবারে impatient হয়ে উঠেছেন।" বিনতা সকলকে একটা সমবেত নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর সাধ্য-সাধনা করিয়া বীণাকে দিয়া একটা গান করান হইল। সে ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতই গাহিল। অতঃপর জলখাবার আসিল, চা আসিল। খাইতে খাইতে গৃহকর্ত্তার সহিত বরকর্ত্তা ও হরেন্দ্রনাথের খানিক কথাবার্ত্তা হইল। ঘণ্টাদেড়েকের বেশী তাঁহারা বসিবেন না, বলিয়া হরেন্দ্রনাথ কথা দিয়াছিলেন, দেড়ঘণ্টা হইতে না হইতেই তিনি সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

বিনোদবাবু স্ত্রীর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "দেখে ত গেল, এখন পছন্দ হল কিনা কে জানে?"

সরোজিনী বলিলেন, "কালই খবর পাব ডাক্তারের কাছে। তোমার কি মনে হল, দেখে-শুনে পছন্দ হয়েছে?"

"দেখে ত পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল, তবে শোনার কথা বলতে পারি না। যা গান শোনাল তোমার বিনতা তার পরে আর কারো গান পছন্দ হবার কথা নয়।"

সরোজিনী বলিলেন, "সত্যি, কি গলা মেয়ের! এঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। কোন দুঃখে যে নার্সের কাজ করছে জানি না। কোন গুণটা নেই মেয়ের? এক গায়ের রংটা ধবধবে নয়। এরই মধ্যে কপাল পুড়ল, ভগবানের কি বিচার!"

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়েটি বিধবা নাকি?"

"তাইত মনে হয় পোষাক-আসাকে। জিগ্‌গেস তো আর করা যায় না।"

বিনতা আসিয়া পড়ায় তাহাদের কথা থামাইতে হইল।

হরেন্দ্রনাথ দলবল সহ বাড়ী ফিরিয়া কাপড়-চোপড় বদলাইয়া দোতলার সামনের বারান্দায় গিয়া বসিলেন। বাড়ীর ভিতর এই স্থানটিতে সবচেয়ে বেশী হাওয়া। বাড়ীতে যখন মানুষ থাকে, সন্ধ্যাটা এই-খানেই কাটায়, কেহই এখান হইতে নড়িতে চাহে না। হরেন্দ্রনাথ সাধারণতঃ এ সময় বাহিরেই ঘোরেন, তবে ক'দিন বাড়ীতেই এখন আছেন, আত্মীয়-বন্ধু সমাগমে। রসিকলালের একটু আফিং খাওয়া অভ্যাস, সন্ধ্যাকালে তিনি তাড়াতাড়ি নিজের শয়নকক্ষে প্রস্থান করিলেন। যুবক দুজন আসিয়া হরেন্দ্রনাথের কাছে বসিল।

হরেন্দ্রনাথ বয়সে অবশ্য বেশ কয়েক বৎসরের বড়, তবু অনিল তাঁহার সঙ্গে মন খুলিয়াই গল্পগাছা করিত, কাকা বলিয়া তফাৎ হইয়া থাকিত না। বসিয়াই বলিল, "কাকা, গান কেমন শুনলেন আজ ?"

কাকা মুখের সিগারেটটা 'অ্যাশ্-ট্রে'তে নামাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "কার গানের কথা বলছ ?"

অনিল বলিল, "ঐ যে বিধবা মেয়েটি গান করল," "এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আশ্চর্য্য সুন্দর গলা। লোকে সাধারণতঃ মেয়েদের পাখীর মত গলাই খুব পছন্দ করে, আমার কিন্তু একটু ভারি গলা বেশী ভাল লাগে! ভারি expressive"

পাশ হইতে মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলিল, "মেয়েটি কিন্তু মোটেই বিধবা নয়।"

হরেন্দ্রনাথ চট করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন, বলিলেন, "তুমি ওকে চেন নাকি ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই, তবে ওর বিষয় অনেক কথা জানি। আমার মামার বাড়ীর গ্রামের মেয়ে। ওর নাম বিনতা রায় ত ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রায় কিনা জানি না, তবে নামটা বিনতাই বটে। কি জান ওর বিষয় ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "আমার মামার বাড়ীর গ্রামে যেতাম মাঝে মাঝে। ঐ গ্রামেরই একটি ছেলের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল, কলেজে একসঙ্গে পড়েওছি। বছর চার কি সাড়ে চার আগের কথা বল্‌ছি। তখন সবে বি. এ. পাস করেছি! শুনলাম শীতলের বিয়ে হচ্চে, যাবার জন্যে চিঠি লিখেও পাঠাল। এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে, বিয়ে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন খাওয়াও হবে, আবার মামার বাড়ী বেড়ানোও হবে, ভেবে তল্পি-তল্পা বেঁধে ত যাত্রা করলাম। মামাবাড়ীর আদর-যত্ন খুবই উপভোগ করলাম, কিন্তু বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েই বাধল বিপদ।"

কন্যাপক্ষ, বরপক্ষের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল, জানি না। দেনা-পাওনা নিয়ে মহা গোলমাল বেধে গেল। মেয়ের বাবা নেই, মামা একজন কন্যাকর্তা হয়ে বিয়ে দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না। প্রথমে তর্কাতর্কি, তারপর বকাবকি, গালাগালি এবং শেষে মারামারির হবার উপক্রম হল। বরকর্তা বর উঠিয়ে নিয়ে বীরদর্পে বাড়ী ফিরে এলেন।

আমি বিরক্ত হয়ে বাড়ী চলে গেলাম। মেয়েটির কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিয়ের আসরের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে কেমন স্থির পাথরের মূর্তির মত বসেছিল। বেশ সুশ্রী মুখ, তাতে ভয় বা উত্তেজনার কোনো চিহ্ন নেই। বাড়ীতে বসে মনটা ছটফট করতে লাগল, এই নারকীয় নাটকের কি সমাপ্তি হল, জানবার জন্যে। তবে তখনই কোনো খবর নেবার চেষ্টা করলাম না। নিজে যেতে ইচ্ছা করল না। বরযাত্রীর দলে ছিলাম, কেউ যদি চিনে ফেলে আবার চেঁচামেচি করে সেটা বিশ্রী হবে। ঘণ্টা তিন চার পরে, বাড়ীর একটা ছোক্‌রা চাকরকে পাঠালাম খোঁজ নিতে। সে ফিরে এসে যা বলল, তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম। শীতল চলে আসার পর চারিদিকে আর একটা বর খোঁজার জন্যে ছুটোছুটি আরম্ভ হয়, এবং গাঁজাখোর গোছের একটা অকর্ম্মা ছোড়াকে ধরেও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মেয়ে হঠাৎ বেঁকে বসল। বল্‌ল, "আমি ঐ গাঁজাখোরকে বিয়ে করব না। আমাকে কি তোমরা কাঠের পুতুল পেয়েছ ? আমি বরং লোকের বাড়ী ঝি-গিরি করে খাব, এই বলে সেই রাতেই সেই বাড়ীর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। কিছু পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সে ষ্টেশনে গিয়েছিল, এবং একটা পান বিড়িওয়ালার কাছে রূপোর চুড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে টিকিট কিনে একেবারে কলকাতা চলে গেছে।

মৃগাঙ্ক থামিবামাত্র অনিল বলিল, "তুমি নিজেই কেন বরের আসনে গিয়ে বসলে না, তাহলে ত মেয়েটা রক্ষা পেত।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রক্ষা ত এমনিতেই পেল। অন্য লোকে রক্ষা করার চেয়ে যে নিজের জোরে রক্ষা পায়, তার রক্ষা পাওয়াটারই দাম বেশী।"

মৃগাঙ্ক বলিল, "সে রকম ইচ্ছা একবার হয়েছিল বটে, তবে কন্যাপক্ষের কেউ কেউ আমাকে চিনতেন। আমি শীতলের বন্ধু, এই নিয়ে পাছে আবার হৈ-চৈ হয়, সেই ভয়েই আর গেলাম না।"

অনিল বলিল, মেয়েটি অনন্যপূর্ব্বা হয়ে গেল তবে?

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি পদার্থ?"

অনিল বলিল, "কাকা, আপনি একবার বিলেত গিয়ে একেবারে চিরকালের মত সাহেব হয়ে গেছেন। অনন্যপূর্ব্বা হল সেই মেয়ে যার বিয়ের আসর থেকে বর উঠে যায় এবং সেই রাতেই যাকে আর পাত্রস্থ করা যায় না। পাড়াগায়ে এসব মেয়ের আর বরই জোটে না।"

কাকা বলিলেন, "অতি চমৎকার।"

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর মেয়েটির কি হল আর জানতে পারনি কিছু?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "বছর দুই পরে আবার মামার বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম মেয়েটি কলকাতায় থেকে কাজকর্ম্ম করে খাচ্ছে। কি কাজ ঠিক শুনিনি। যে মামার বাড়ী ওরা ছিল, তাঁকে নিয়ে অনেক হাঙ্গামা হয়। বিনতার মা আর ভাইকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দিয়ে, অনেক নাক কানমলা খেয়ে তবে তিনি নিষ্কৃতি পান। অতঃপর আর ও গ্রামে যাই নি, মেয়েটির কথা ভুলেও গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ দেখে চমকে গেলাম।

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরেন্দ্রনাথ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া টান দিতে লাগিলেন। হঠাৎ অনিল বলিল, আমার বাড়ীর সকলে যে এই সব বুজরুকিতে বড় বেশী বিশ্বাস করে, না হলে আমিই বিনতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করতাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ও যত মিষ্টি গানই করুক, তোমার মা বাবা রাজী হবেন বলে মনে হয় না। বলত কথাটা তোমার বাবাকে বলে দেখতে পারি।"

অনিল বলিল, "নাঃ থাক। অতদূর নিজের খেয়ালে এগোনো ঠিক নয়। বাবা মায়ের আবার দাবী অনেক রকম ত? এ ক্ষেত্রে ত সে সব কিছু মিটবে না। তার উপর আবার ঐ সামাজিক অনুশাসন। যাক্ গে ওরা যা ভাল বোঝেন করুন। আর ঐ মেয়েটি যে বিয়ে করতে রাজী হবেন, তারই বা স্থিরতা কি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রাজী না হবারই কথা। পুরুষ মানুষের যা পরিচয় উনি পেলেন, তাতে উৎসাহ করে আবার কাউকে বরণ করতে এগোবার কথা নয়। তবে কোনো বিশেষ মানুষকে পছন্দ করে ফেললে, সে ক্ষেত্রে এগোতে পারেন বটে।"

অনিল বলিল, "তা ঠিক। এ সব নিয়ম হয়েছিল যখন তখন কনেদের বয়স হত দু বছর, চার বছর। এখনকার সব বড় বড় মেয়ে নিয়ে এসব খেলা খেলতে চাইলে চলবে কেন? সেইটাই যে আমাদের পণ্ডিতরা বোঝেন না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, এখন অন্য কথা তুলি একটা। আসলে যাকে দেখতে গিয়েছিলে, সে মেয়েটিকে লাগল কেমন?"

অনিল বলিল, "দেখতে ত ভালই। অন্য সব দিকেও ভাল বলেই মনে হল।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল ওদের বাড়ী গেলেই ত ওরা ছেঁকে ধরবেন, মতামত জানতে চাইবেন। কি বলব ?"

অনিল বলিল, "আমার কথায় ত আর কাজ হবে না? বাবাকে জিগ্‌গেস করুন। এসব ক্ষেত্রে আমরা বাঙালী ছেলেরা ত বাপের সুপুত্তুর সবাই।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে তাই জেনে নি। আর কোনোদিকে বাধা কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবে স্বপ্নার বাবা বেশী বড়লোক নয় কিছু। সাধারণ ছাপোষা গৃহস্থ। টাকাকড়ির দাবী খুব বেশী করলে, তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে মেয়েটি মোটামুটি ভাল, পরিবারটাও ভাল। খুব সাহেবী নেই, অথচ অজ পাড়াগেঁয়েও নয়, বিয়ে করলে ওখানে ঠকবে না।"

এমন সময় হরেন্দ্রনাথকে কে ডাকিতে আসিল। তিনি উঠিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। যুবকদ্বয় আর খানিকক্ষণ সেইখানে বসিয়া বসিয়া গল্প করিল। তারপর মৃগাঙ্ক নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। অনিল এক-খানি বই লইয়া পড়িতে বসিল!

৩

সকাল হইতেই স্বপ্নাদের বাড়ীর তিনজন লোক অন্ততঃ হরেন্দ্রনাথের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। বিনোদবাবু আর সরোজিনী ত বটেই, স্বপ্নারও জানার আগ্রহ কম ছিল না যে বরপক্ষ তাহাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে কিনা। নিজে সে দেখিতে ভালই এই ধারণাই তাহার ছিল, আর লেখাপড়া, গান, সেলাই সবই ত সে জানে? বাবা যে তাহাকে কিছু দিবেন না, এমনও নয়। সুতরাং না পছন্দ হইবার কি আছে? কত কনে দেখার সভায় সে গিয়াছে, তাহার চেয়ে সর্বাংশে খারাপ কনেও লোকে পছন্দ করে দেখিয়াছে। এক বিনতাদি তাহাকে গানে হারাইয়াছে, নইলে গানও তাহার মন্দ হয় নাই।

সুতরাং বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময় যখন হরেন্দ্রনাথের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলেই উদগ্রীব হইয়া উঠিল। বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীর শয়নকক্ষে আসিয়া ঢুকিলেন, এবং স্বপ্না গিয়া ঢুকিল পাশের ঘরে।

সরোজিনী বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর আনলেন, বলুন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন 'মেয়ে দেখে ত সবাই ভালই বল্‌ছে, এখন আপনাদের সঙ্গে দরে বনে তবে ত? আমার ত প্রায় বরের বাড়ীর পিসী আর কনের বাড়ীর মাসির অবস্থা, কাজেই আমি আর এর ভিতর মাথা গলাচ্ছি না। কাল রসিকদাদা আসবেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে, আগে আগে যদি ব্যাপার চুকিয়ে ফেল্‌তে চান, তাহলে বরং আপনিই চলুন আমার বাড়ী সন্ধ্যাবেলা। সে সময় আমি বাড়ী থাকি।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "তাই যাব, বসে বসে খালি মাথামুণ্ডু ভেবে কিছু লাভ নেই।"

এমন সময় বিনতা সরোজিনীর চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ইহারই মধ্যে সে স্নান সারিয়া আসিয়াছে। খোলা চুল হাঁটু ঢাকিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, মুখখানা আরো ছেলেমানুষের মত দেখাইতেছে। সরোজিনী চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া বলিলেন, "আমি আর কিছু খাই আর নাই খাই, চা বার পাঁচেক না খেয়ে পারি না। আপনাকে এনে দেবে এক পেয়ালা চা?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার অত চা খাবার সময় কোথায়? দু বার যা ধরা আছে, তার বেশী খাই না।" বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কোথায় গান গাইতে শিখেছিলেন আপনি? কাল কি চমৎকার গাইলেন। নার্সিংএ না ঢুকে গানের লাইনেই গেলে পারতেন। কম খাটুনি হত।"

বিনতা বলিল, "দেশে যতদিন ছিলাম, বাবার কাছে শিখেছিলাম। তিনি খুব ভাল গাইতেন। তারপর কলকাতায় এসে এক পিস্‌তুতো বোনের কাছে মাঝে মাঝে শিখেছি। তবে গান শেখাতে হলে যে ভাবে গান শেখা দরকার, তা ত আমি শিখিনি? কাজেই ওটা career করতে পারতাম না।"

সকাল বেলাটায় কাজের তাড়া বেশী, কাজেই হরেন্দ্রনাথ আর বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোজিনীকে বলিলেন, "আর সাত আটদিন শুয়ে থাকলেই আপনার শাস্তির অবসান হবে। তবে মেয়ের বিয়ের জন্যে অতিরিক্ত হৈ-চৈ করে আবার পড়বেন না যেন। বিয়ে ঠিক হলেও ত এখন দু তিন মাস দেরি হবে, কারণ হিন্দু শাস্ত্রমতে এখন দিন নেই। সেই অগ্রহায়ণ মাসে হবে হয়ত।"

সরোজিনী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়েটা হবে আপনার মনে হচ্ছে?"

"মনে ত হচ্ছেই। বরের পছন্দ হয়েছে মোটামুটি, আর বরের বাবার পছন্দ হয়ে যাবে এখন, ভবিষ্যৎ বেয়াই যদি একটু হাত দরাজ করেন।"

তিনি চলিয়া যাইতেই বাড়ীতে আবার কোলাহল লাগিয়া গেল। বিবাহ এখনও পাকাপাকি স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কিই বা আসে যায়?

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বিনোদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন হরেন্দ্রনাথের বাড়ী। কথাবার্ত্তা চলিল খানিকক্ষণ। হরেন্দ্র বসিয়া থাকায় দুই পক্ষই একটু রাশ টানিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন, এবং ব্যাপারটা ভালয় ভালয় চুকিয়াই গেল। এখন ত আর কয়েকদিন মাত্র শ্রাবণ শেষ হইতে বাকি। ইহার ভিতর কোনো পক্ষই জোগাড় করিয়া উঠিতে পারিবে না। সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইবে, এই রকমই কথাবার্ত্তা হইয়া রহিল।

সরোজিনীকে পর দিন দেখিতে গিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি ত ভালই আছেন দেখছি। আর দিন সাতের বেশী আপনার নার্সের দরকার হবে না। যদি না অবশ্য বাড়ীর কাজের জন্যে রাখেন, স্বপ্নার বিয়ে অবধি।"

সরোজিনী বলিলেন, "কি যে আপনি বলেন তার ঠিক নেই। আমি যেন টাকার ছালার উপর বসে আছি। মাসে নব্বুই টাকা দিয়ে ঘরের কাজের জন্যে লোক রাখব। বড় জোর একটা ঝি বেশী রাখতে পারি। টানাটানি চিরকালই, এখন আরো বেশী হবে, মেয়ের বিয়েতে ত অল্পে নিষ্কৃতি পাব না?"

"কে বা পায়? ছেলের বিয়েতে পুষিয়ে নেবেন। আচ্ছা ডাকুন দেখি বিনতাকে, ওর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

বিনতা রান্নাঘরে কি একটা কাজ করিতেছিল, ডাক শুনিয়া সরোজিনীর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সরোজিনী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু কি বলছেন শোন।"

বিনতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইল। তিনি বলিলেন, "আপনার এখানকার কাজ ত আর সাত আট দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তার পরে অন্য কোথাও কাজ কি ঠিক করা আছে?"

বিনতা বলিল, "এখন ত ঠিক নেই কিছু। কাল একবার ছুটি নিয়ে মিসেস্ রক্ষিতের বাড়ী যাব। উনিই আমাকে বেশীর ভাগ কাজ দেন। যদি কেউ লোক চেয়ে থাকে, তাহলে সেখানে গিয়ে ঠিক করবার চেষ্টা করব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনাকে যেখানে পাঠান হয়, সোজা সেখানে চলে যান? কোনো খোঁজ-খবর নেন না?"

বিনতা বলিল, "সে করলে ত আমার চলে না? মাসে দুটো দিন বসে থাকলেও আমার অনেক ক্ষতি। কাজেই যেখানেই কাজ পাই যেতে হয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ কাজের পক্ষে আপনি বড় বেশী ছেলেমানুষ। যাক্, অবস্থা বৈগুণ্যে অল্প-বয়সেও কাজ অনেক রকম করতে হয়। একটা কাজেরই কথা বলছি এখন। কাজটা আমারই বাড়ীতে।"

সরোজিনী বলিলেন, "আপনার আবার এখানে কে আছে যে নার্স লাগ্‌বে?"

"বাড়ীটাতে জায়গা বড় বেশী, কাজেই অনেকের চোখ আছে সেটার উপরে। একটি ভাগ্নী খুব অসুস্থ হয়েছেন, সন্তান সম্ভাবনা। ইচ্ছা করলে নার্সিং হোমে যেতে পারতেন, পয়সা কড়ি একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু এমন মামার বাড়ী থাকতে সেটা তিনি করবেন কেন? কাজেই আমার বাড়ীতেই আসছেন, অন্ততঃ এক মাসের জন্যে। এখন আমার বাড়ীতে ত স্ত্রীলোক কেউ নেই, ঝি-ও নাই একটা। একে সারাদিন আগ্‌লাবে কে? বয়স বেশী নয়, কলকাতায় কোনোদিন থাকেও নি। সুতরাং আপনার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। এখানকার কাজ হয়ে গেলেই আপনি আমার ওখানে যাবেন।"

বিনতা বলিল, "যখন বল্‌বেন তখনই যাব।"

সরোজিনী বলিলেন, "আপনি যখনই বল্‌বেন, তখনই আমি ওকে ছেড়ে দেব, আমার সত্যিই এখন কোনো কাজ নেই। বহুকাল এত আরামে থাকিনি, তাই মনটা একে ছাড়তে চাইছে না। আগে আগে যখনই নার্সের হাতে পড়েছি, তখনই খালি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে প্রাণটা, যে কতক্ষণে আবার উঠে দাঁড়াব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এতবড় সার্টিফিকেট সহজে কেউ কাউকে দেয় না, লিখে দিন, তাহলে ওঁর কাজে লাগবে।"

সরোজিনী বলিলেন, "এই ত আপনাকে বলেই দিলাম মুখে, আপনিই ত নিচ্ছেন ওকে আমার পরে।"

ডাক্তার বলিলেন, "অন্যদের জন্যে বলছি আর কি? আমার কাছে ত সার্টিফিকেটের দরকার ছিল না, আমি ত ওকে এতদিন ধরে দেখছি। আচ্ছা, চলি এখন। রোজ আসবার এখন দরকার নেই, টেলিফোনে খবর দেবেন প্রয়োজন হলে", বিনতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর আমার প্রয়োজন হলে, আমিও তখনই খবর দেব।"

বিনতা বলিল, "আচ্ছা।" হরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

স্বপ্না বলিল, "বাবাঃ, বিনতাদি এরপর মস্ত বড়লোকের বাড়ী যাবে। কত আরামে থাকবে।"

বিনতা বলল, "যাচ্ছি কি আরাম করতে? কাজই ত করতে হবে?"

স্বপ্না বলিল, "তাহলেও অতবড় সুন্দর সাজান বাড়ী, গাড়ী, টেলিফোন কত কি? কিছু ত ভাগ পাবে?"

বিনতা হাসিল, কিছু বলিল না।

দিন পাঁচ পরেই বিনতার ডাক আসিল। হরেন্দ্রনাথ নিজেই আসিয়া তাহাকে বলিয়া গেলেন। বলিলেন, "স্বর্ণ কাল দুপুরে আসছে, আপনি সকালে উঠেই যাবেন আমার ওখানে। তার জন্যে ঘরটর ঠিক করতে হবে। সংসারে ত স্ত্রীলোক নেই, কাজেই তাঁদের জন্যে কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে, তা বুঝতে পারা শক্ত। আমি সকালেই গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার আরামের অবসান হল এরপর। আবার কোমর বেঁধে কাজে লাগুন।"

সরোজিনী রাত্রেই বিনতার হিসাবপত্র চুকাইয়া রাখিলেন। হরেন্দ্রনাথের যেমন ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া চলা অভ্যাস, হয়ত ভোর রাত্রেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিনতাও নিজের সামান্য জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিল।

বেশ সকাল সকালই গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। বিনতা সকলের কাছে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। স্বপ্না চুপি চুপি বলিল, "এস কিন্তু ভাই, ঠিক সে সময়।"

বিনতা বলিল, "খবর পেলেই আসব। হয়ত বরযাত্রী হয়েই আসব, যদি বেশী দিন ও-বাড়ীতে থাকি।"

অল্পক্ষণের পথ, দেখিতে দেখিতে গাড়ী গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেল। চাকর বাহির হইয়া আসিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া লইল এবং গৃহকর্ত্তা স্বয়ং বাহির হইয়া আসিলেন তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে। তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "বড় তাড়াতাড়ি গাড়ী গিয়ে পড়েছে না? আমি ড্রাইভারকে সকালে যেতে বলেছিলাম তা সে ঘুম ভ'ঙতেই চলে গেছে। আপনার চা-টা খাওয়া হয়েছে?"

বিনতা বলিল, "না, হয়নি, ওদের বাড়ীতে একটু দেরিতেই চা হয়। এখানে খেয়ে নেব এখন। কিন্তু দেখুন।"

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কি বলছেন, বলুন?"

বিনতা বলিল, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি কত ছোট আপনার চেয়ে।"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ওটা বলতে বেশী অসুবিধে হবে না, 'আপনি' টা বলতেই বরং অসুবিধা লাগছিল। স্বপ্নার সমানই ত প্রায়।"

বিনতা বলিল, "কোন ঘরে জিনিষগুলো রাখব?"

ল্যাণ্ডিংএর উপরেই একটি মাঝারি গোছের ঘরের দরজা পায়ের এক ঠেলায় খুলিয়া দিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই ঘরে রাখ। খাট একটা আছে, আল্‌নাও আছে। আর কি লাগবে বল?"

বিনতা বলিল, "আর কিছু লাগবে না।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "একটা আয়নারও দরকার নেই?"

বিনতা বলিল, "ছোট আয়না একখানা আছে বাক্সের মধ্যে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "প্রয়োজন জিনিষটাকে একেবারে উড়িয়েই দিয়েছ দেখছি। আচ্ছা, চা দিয়েছে চল, আগে চা-টা খেয়ে নাও, তারপর স্বর্ণের ঘর ঠিক করবে। সে কিন্তু তোমার মত মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা নয়, তার প্রয়োজন অনেক রকম।"

বিনতা ভাবিল, "ইনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমি তাঁর বাড়ীর অতিথি। আমিও যে একটা মানুষ, তা ত বহুবৎসর ভুলে গিয়েছি।"

খাইবার ঘরে চাকর চা সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার চাকরটির চা ঢালা জিনিষটা আয়ত্তের মধ্যে নেই। ঢালতে গেলেই চা পেয়ালায় যতটা না পড়ে, তত পড়ে পিরীচে আর টেব্‌ল্ ক্লথে। কাজেই চা আমি নিজেই ঢেলে নিই।

বিনতা পেয়ালাগুলি টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি ঢেলে দিচ্ছি। তিন পেয়ালাই ঢালব ?"

গৃহস্বামী বলিলেন, "তাই ঢাল। আর একজন বাসিন্দা আছেন বাড়ীতে, এখনই চোখ মুছতে মুছতে হাজির হবেন।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বাইশ তেইশ বৎসরের যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখে বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। রোজ চাকর ডাকাডাকি করিয়া এই সময় তার ঘুম ভাঙাইয়া দেয়, কারণ তাহার উপর এই রকম আদেশ আছে। বিনতার আসার কথা সে জানিতই বোধ হয়, কারণ তাহাকে দেখিয়া কিছু বিস্ময় দেখাইল না। হরেন্দ্রনাথ পরিচয় করাইয়া দেওয়াতে, বিনতাকে নমস্কার করিয়া নীরবে খাইতে লাগিল।

বিনতা দেখিল এ বাড়ীতে খাওয়ার ঘটা বেশ আছে। আর নাই বা হইবে কেন বড় মানুষের বাড়ী ?

হরেন্দ্রনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তুমি নিজে যে কিছুই খাচ্ছ না ?"

বিনতা বলিল, "সকালে বেশী কিছু খাই না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশী ত খাচ্ছ না, কমও যে কিছু খাচ্ছ না ? ফলটল অন্ততঃ একটা নাও ?"

রমেশ একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাইল। কাহারও খাওয়া লইয়া এত মাথা ঘামাইতে দাদাকে ত দেখা যায় না ? মেয়েটি চেনা কেউ নাকি ?

বিনতা অগত্যা একটা আপেল তুলিয়া লইল। হরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে তাহার বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাহার রোগিণী যিনি হইবেন, তিনিও মামার বাড়ী আসিতেছেন, সেও কি মামার বাড়ীই আসিয়াছে ? এত আদর ত বিগত ছয় সাত বৎসরের ভিতর কেহ তাহাকে করে নাই ?

খাওয়া হইয়া গেল। রমেশ নিজের ঘরে প্রস্থান করিল।

হরেন্দ্রনাথ বিনতাকে লইয়া স্বর্ণের ঘর ঠিক করিতে চলিলেন। তাহাকে যে ঘর দিয়াছিলেন, তাহার পাশের একটা ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই ঘরে ও থাকবে। দেখ এখানে খাট দুটো আছে, যদি এখানে তোমাকে শুতে হয় ত অসুবিধা হবে না। আল্‌না আছে, ড্রেসিং টেব্‌ল্ আছে। আর কি দরকার ?"

বিনতা বলিল, "বেশী আর কি দরকার হবে ? ড্রেসিং টেব্‌ল্ ড্রয়ার রয়েছে কাপড়-চোপড় তাতেই রাখবেন। একটা easy chair গোছের কিছু দিয়ে রাখলে হয়, কখনও যদি বসে থাকতে চান।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এধার ওধার অনেক ছড়ান আছে চেয়ার, দুটো পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ঘরে একটা রেখে নিও। আর ত কিছু চাই না ? আচ্ছা আমাকে এখন বেরতে হচ্ছে। ঘণ্টা কয়েক তোমাকে একলা থাকতে হবে। ঘর দোর গোছাও, আমার শোবার ঘর ঐটা। ওখানে বই আছে ঢের, যদি সময় না কাটে বই নিয়ে পোড়ো। আমি একেবারে স্বর্ণকে নিয়ে আসব।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

গোলক নামক এক চাকর আসিয়া জুটিল। সাহেব তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন নার্স দিদিমণিকে

সাহায্য করিতে। তাহার সাহায্যে ঘর দুইখানিকে সে ঠিকঠাক করিয়া, ঝাড়িয়া, মুছিয়া, ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিল। দোতলায় দুইটি বাথরুম আছে। তাহাদের শুইবার ঘর সংলগ্ন যেটি, সেটিও সে ভাল করিয়া পরিষ্কার করাইল। নিজে স্নান করিয়া লইল। তাহার পর বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কতকাল সে শুষ্ককণ্ঠে মরুভূমির উপর দিয়া হাঁটিতেছে। কত বিপদ, কত অপমান, তাহার তরুণ জীবনকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। বাবা যে দিন হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তখন হইতে তাহাকে কেহ ত মানুষ মনে করে নাই, এমন কি মাও নয়। তিনিও তাহাকে নিজের জীবনের মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করেন। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া যে তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেছে, তাহার জন্য কোনো কৃতজ্ঞতাই তাঁহার মনে নাই। ইহা যেন করিতে বিনতা বাধ্য।

রমেশ খাইয়া কলেজে চলিয়া গেল। বাড়ী একেবারে শূন্য। নীচের তলায় চাকররা কাজ করিতেছে। বসিয়া বসিয়া তাহার ঘুম পাইতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ বাড়ীর সামনে গাড়ী থামার ও গাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ শোনা গেল। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া বিনতা দেখিল ডাক্তারের গাড়ীই বটে। তিনি নিজে আসিয়াছেন, একটি মেয়ে নামিয়াছেন, এবং এক রাশ জিনিস নামান হইতেছে। বিনতা সিঁড়ির মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ইহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য।

হরেন্দ্রনাথ স্বর্ণকে লইয়া উপরে উঠিলেন। মেয়েটি বিনতার সমবয়সীই হইবে, এক আধ বৎসরের বড় বা ছোট হইতে পাবে। কাপড়-চোপড় পরা, কথাবার্ত্তা, ধরণধারণ কোনো কিছুতেই নাগরিকতার ছাপ নাই।

উপরে উঠিয়াই হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই স্বর্ণ, আর এই বিনতা। স্বর্ণ ইনি থাকবেন তোমার সঙ্গে, দেখাশোনা করবেন। যখন যা দরকার একে বলবে। ঘর ত ঠিক আছে, না?"

বিনতা বলিল, "ঠিকই আছে, এই যে এদিকে আসুন।"

স্বর্ণ ও হরেন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। স্বর্ণ ত আনন্দে আটখানা! বলিয়া উঠিল, "বাঃ, কি সুন্দর ঘর! তা হবে না কেন? মেজমামা ত বড়মানুষ। দিন কতক আরাম করে নিই।"

"তা কর আরাম। তবে শরীরটাকে ঠিক রেখো। কাল তোমায় দেখতে একজন ডাক্তার আসবেন। তিনি যেমন বলবেন ঠিক তেমনি ভাবে চলবে। বিনতা অবশ্য তোমাকে ঠিক পথেই রাখবেন, অত্যন্ত কড়া নার্স বলে তাঁর সুনাম আছে।"

স্বর্ণ বলিল, "এরই মধ্যে এত কড়া হয়ে গেছেন? আমার বয়সীই ত হবেন? আমি ত একটা কড়া কথা শুনলে এখনও কেঁদে ফেলি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মত আদুরে ত সবাই হয় না? তোমাকে বাপের বাড়ীর সবাই মিলে মাটি করেছেন, এখন আবার স্বামীরত্ন মাটি করছেন, সকলের ত সে সুবিধা থাকে না?"

"মেজমামা যে কি বল তার ঠিক নেই। বাবারে আমার যা গা ঘিন্ ঘিন্ করছে সারাদিন ট্রেনে চড়ে, একটু স্নান করতে পারলে হত।"

বিনতা বলিল, "স্নানের ত সবই ঠিক আছে। আপনার কাপড়-চোপড় কোন বাক্সে আছে বলুন, বার করে দিচ্ছি।"

স্বর্ণ বলিল, "সব কি এক জায়গায় আছে? এই তিনটে বাক্সে ছড়ান! তিনটেই খুলতে হবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা স্নান-টান সেরে নাও চট্‌পট্, নইলে খাওয়ার দেরি হয়ে যাবে। বিনতা একে নিয়ে একেবারে খাবার ঘরে এস, এঁর স্নান হয়ে গেলে," বলিয়া তিনি নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্ণ বাক্স হইতে কাপড়-চোপড় টানিয়া বাহির করিতে করিতে বলিল, "আপনার কি মেজমামার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ?"

বিনতা বলিল, "না খুব অনেক দিন নয়, মাসখানেক হবে।"

স্বর্ণ বলিল, "আচ্ছা, স্নানটা আগে সেরে আসি। বাক্সগুলো একটু গুছিয়ে দিন না ভাই, ততক্ষণ। আমার হেঁট হয়ে কাজ করতে ভাল লাগে না।" বলিয়া সে স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বিনতা বসিয়া বাক্স গুছাইতে লাগিল। খানিক গুছাইয়া ভাবিল, থাক এত গুছাইয়া কাজ নাই, বাহির করিয়া দেরাজেই গুছাইয়া রাখা ভাল। তাহা হইলে আর বাক্স টানাটানি করিতে হয় না সারাক্ষণ। কিন্তু স্বর্ণ আগে স্নান সারিয়া আসুক, তাহার পর এসবের ব্যবস্থা হইবে। মেয়েটি বয়সের পক্ষে অত্যন্ত ছেলেমানুষ অন্ততঃ কথাবার্ত্তায়। তবে কার্য্যত হয়ত গৃহিণীপনা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছে। কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে মানুষকে অপ্রস্তুতে ফেলিবে বলিয়াই বোধ হয়।

স্বর্ণ বাহির হইয়া বলিল, "বাক্সগুলো বন্ধ করেন নি যে?"

বিনতা বলিল, "ভাবছি সর্ব্বদা পরবার কাপড়-চোপড়গুলো দেরাজেই রেখে দিই, তাহলে আর সারাক্ষণ হেঁট হয়ে বাক্স খুলতে হয় না।"

স্বর্ণ বলিল, "তাই রাখুন তাহলে। আর দেখুন ভাই, আপনি ত বড় নয়, কিছু আমার চেয়ে, অত 'আপনি আজ্ঞে' করতে পারব না আমি। আমিও 'তুমি' বলি, আপনিও 'তুমি'ই বলুন। নার্স থাকবে শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম যে খুব ভারিক্কি বুড়ো মানুষ হবে। কথাই বুঝি বলতে পারব না, তার সঙ্গে। আমি আবার বুড়ো-টুড়ো ভালবাসি না।"

বিনতা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, অনেকেই চারপাশে ছেলেমানুষই পছন্দ করে। তা চল, আগে খাওয়াটা সেরে আসি, তোমার মামা হয়ত অপেক্ষা করছেন।"

খাবার ঘরে যাইবামাত্র হরেন্দ্রনাথও আসিয়া প্রবেশ করিলেন, চাকরাও খাবার লইয়া আসিল। স্বর্ণ বলিল, "ওরে বাবা, এইরকম সাহেবী কায়দায় খেতে হবে নাকি? ওসব আমি জানি-টানি না।"

তাহার মামা বলিলেন, "চেয়ারটায় বোস ত, তারপর যেরকম খুশি খাও। নিজে তুলে নিতে অসুবিধা হয় ত বিনতা তোমাকে দিয়ে দিবেন। ওঁর নিজের খেতে একটু দেরি হয়ে যাবে, তা হোক। সেবার কাজ যারা নেয়, তাদের অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয়।"

বিনতা বলিল, "ঐটুকু দেরিতে আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আপনাকেও দিয়ে দিই?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা দাও। এক যাত্রায় পৃথক ফল আর কেন?"

বিনতা দুইজনকে পরিবেশন শেষ করিয়া তবে নিজে খাইতে বসিল। স্বর্ণের খাওয়া শেষ হইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মেজমামা, টেবিলে যারা একসঙ্গে খেতে বসে তারা একসঙ্গেই ওঠে নাকি, আমাদের দিশী নিয়মে যেমন [illegible] না [illegible] হয়ে যায়, সে তেমন উঠে যায়?"

মেজমামা বলিলেন, "তুমি গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এস ত, তারপর এখানে বসে গল্প কর, যতক্ষণ না আমাদের খাওয়া শেষ হয়। তাহলেই যথেষ্ট নিয়ম পালন হবে।"

স্বর্ণ উঠিয়া গেল, গোলক তাহার ব্যবহৃত প্লেট গেলাস সব উঠাইয়া লইয়া গেল। বিনতা বলিল, "উনি এই প্রথম কলকাতায় এলেন বুঝি? সব জিনিষই ওর নতুন লাগছে?"

"বাল্যকালে যদি এসে থাকে, আমি যখন বিলেতে ছিলাম। তারপর আর নিশ্চয়ই আসেনি। কিন্তু তুমি এখনও ত কিছু খাচ্ছ না? এত কম খেয়ে এতক্ষণ খাট কি করে? এ বয়সে আরো একটু বেশী খাওয়া উচিত।"

বিনতা একটু হাসিয়া বলিল, "বাবা মারা যাবার পর আর কিছুই খেতে পাব কিনা তার ত ঠিক ছিল না? তাই কত অল্প হলে চলে, তারই অভ্যাস করছিলাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন ত নিজে রোজগার করে খাচ্ছ, এখন আর ত সে ভাবনা ভাববার কথা নয়? এখন খাওয়াটা আস্তে আস্তে বাড়াও।"

স্বর্ণ হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল। বসিয়া বলিল, "বাবাঃ, মেজমামা, তুমি কি আস্তে আস্তে খাও। এই না সবাই বলে তোমার ভয়ানক প্র্যাক্‌টিস্, মরবার সময় নেই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মরবার চেষ্টা ত করিনি এ পর্য্যন্ত, কাজেই সময় হবে কিনা জানি না। তবে নাইবার, খাবার সময় একটুখানি হাতে রেখেছি, নইলে চল্‌বে কেন?"

সকলের খাওয়া হইয়া যাওয়াতে, যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

৪

দিন সাত আটের ভিতরই স্বর্ণের বেশ মন বসিয়া গেল। ডাক্তারের আদেশ অনেকগুলি পালন করিতে হইত, এই যা ছিল তাহার বিরক্তির কারণ। আর স্বামীর চিঠি ঠিক সময়মত না পাইলে সে তৎক্ষণাৎ পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া যাইত, এই ছিল আর এক বিপদ। বিনতা তাহাকে বুঝাইয়া, ঠাট্টা করিয়া কোনোমতেই থামাইতে পারিত না। এমন কি হরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিও তাহাকে আত্মসম্বরণ করাইত না। একদিন বকুনি খাইয়া মামাকে বলিয়া বসিল, "নিজের ত ও আপদ নেই, তুমি কি বুঝবে আমার কষ্ট?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একেবারে প্রতাপের বাণী?" কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী?" বুঝি না হয়ত তবু এটুকু বুঝি যে এরকম করলে তোমার শরীর খারাপ হবে, এবং আর একটি প্রাণীরও অনিষ্ট হবে।"

তিনি বাহির হইয়া যাইতেই স্বর্ণ জিভ কাটিয়া বলিল "মেজমামার সঙ্গে ওরকম করে কথা বলা ঠিক হয়নি না?"

বিনতা তাহার কথায় একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। গুরুজনের সঙ্গে লোকে এইরকম করিয়া কথা বলে নাকি? স্বর্ণের কথার উত্তরে বলিল, "ঠিক হয়েছে তা বলতে পারি না ভাই।"

স্বর্ণ বলিল, "এ রাম, কিছু যদি মনে করে?"

বিনতা কিছুই বলিল না। বলিলেই কি? হরেন্দ্র কিছু মনে করিবেন, কি করিবেন না, তাহা বুঝিবে কিরূপে?

খানিক পরে বলিল, "যে সেলাইটা করছিলে সেটাই কর না খানিকক্ষণ? শুধু মুখ ভার করে বসে থেকে কি হবে?"

স্বর্ণ বলিল, "আমার এখন সেলাই-মেলাই কিছু ভাল লাগছে না। একটু গড়িয়ে নিই।"

ছুমিনিট শুইয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই, মেজমামাকে বলে একটা ঝি রাখিয়ে দিতে পার আমার জন্যে ?

বিনতা বলিল, "আমিই ত রয়েছি, আবার ঝি কি করবে ?"

"না ভাই তোমাকে সব কাজের কথা বলা যায় না। ঝি থাকলে একটু পা-টা টিপে দিত, একটু আমাদের পাড়াগাঁয়ের গল্পস্বল্প করত, রাত্রে যখন ঘুম হয় না তখন মাথায় হাত বুলোত।"

বিনতা বলিল, "এ সবই ত আমি করতে পারি। মানুষে নার্স রাখে ত এই সব কাজের জন্যেই ?"

স্বর্ণ বলিল, "না ভাই, তোমাকে আমি পা টিপতে বলতে পারব না। তোমাকে মেজমামা এত খাতির করে চলেন যে তোমাকে নার্স-টার্স কিছু মনেই হয় না। আমি যেমন এক ভাগ্নী এসেছি, তুমিও যেন আর একজন এসেছ।"

বিনতা ভাবিল সত্যই তাই। এখানে আসার পর একদিনের জন্যও মনে হয় নাই যে পয়সার পরিবর্ত্তে সেবা করিতে আসিয়াছে। যেন নিজের অতি নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতেই সে আছে। যে আদর, যে সম্মান সে পায়, তাহা নিজের মা বাবার ঘরেও সে পায় নাই। সেবার কাজ তাহাকে কিই বা করিতে হয় ? স্বর্ণকে সমস্তদিন যথা নিয়মে স্নানাহার, নিদ্রা, ঔষধ সেবন প্রভৃতি করান অবশ্য কম কাজ নয়। তাহাকে নার্সের বদলে শিক্ষয়িত্রীর কাজই বেশী করিতে হয়। আর সংসার চালানোর ভারটাও কেমন করিয়া যেন তাহারই হাতে আসিয়া পড়িতেছে। চাকররা ধরিয়া লইয়াছে যে তাহাকেই সব বিষয় জিজ্ঞাসা করা উচিত, এবং গৃহকর্ত্তা এমন সানন্দে তাহাতে সম্মতি দিতেছেন যে ইহাই পাকাপাকি নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বর্ণের কথার উত্তরে বলিল, "তোমার মেজমামার মত ভদ্রলোক জগতে কটা জন্মায় ভাই ? পৃথিবীতে কারো সঙ্গে বোধ হয় তিনি কখনও খারাপ ব্যবহার করেন নি। তা, চা খাবার সময় আমি বল্‌ব তাঁকে, তারপর তিনি যা স্থির করেন।"

স্বর্ণ বলিল, "রেখেই দেবেন দেখো। টাকা পয়সা ত ওর কাছে খোলামকুচি। আমার বিয়ের এক কথায় এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন সাহায্য বলে।"

চা খাওয়ার সময় স্বর্ণ নিজেই কথাটা পাড়িল। বলিল, "মেজমামা, আমার জন্যে একটা ঝি রেখে দেবে ?"

মেজমামা বলিলেন, "এখনই কেন ? যথাকালে হবে।"

স্বর্ণ বলিল, "আঃ কি যে বল ! এই আমার পা-টা টিপে দেবে, গল্প স্বল্প করবে। এর মাইনেটা আমি দিতে পারি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সারাদিন গড়াগড়ি দিয়ে কাটাও, তাই হাত পা ব্যথা করে। তোমার এখন রোজ মাইল দুই হাঁটা উচিত। তা এমন বৃষ্টি যে বাড়ীর বার হওয়া যায় না। তা রাখ ঝি, শেষে ভাববে যে মামার বাড়ী এসে যথেষ্ট আদর পাওয়া গেল না। মাইনের কথাটা এখন নাই বা ভাবলে ? গল্প কি বিনতার সঙ্গে চলে না ?"

স্বর্ণ বলিল, "ও আমাদের সব পাড়াগাঁয়ের গল্প জানলে ত ?"

হরেন্দ্র নাথ বলিলেন "ওঁর বাড়ীও ত পাড়াগাঁয়েই ?"

স্বর্ণ বলিল, "সে কবে ছিল, এখন আর সেখানের কথা মনে নেই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে ত ঝি সর্ব্বাগ্রে দরকার। একে ত বাবাজীবন যথা সময়ে চিঠি লেখেন না, তার উপর যদি আবার গল্প করার লোকও না থাকে, তাহলে ত জীবন দুর্ব্বিসহ।"

স্বর্ণ কি একটা কাজে উঠিয়া গেল। হরেন্দ্রনাথ তখনও চা খাওয়া শেষ করেন নাই। বিনতা বলিল, ওঁর জন্যে যদি ঝিই রাখতে হয়, তাহলে আর আমাকে রাখার দরকার ত নেই! ওঁর এখনকার যা কাজ তা ত দু একদিন দেখিয়ে দিলে ঝিই পারবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পাগল নাকি তুমি? স্বর্ণর সব কাজ করবে ঝি? ঝিয়ের একটা কথাও ও শুনবে? আর আমাদের দেশের ঝি ত? তাঁদের গুণপনা আমার অজানা নেই। সমস্ত মাটি হবে একদিনের মধ্যে। আর ওর খেয়াল ত, আজ ঝি দরকার, কাল ঝিয়ের বদলে রাঁধুনি দরকার। তুমি পালাতে ব্যস্ত মনে হচ্ছে? এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে?"

বিনতা বলিল, "না, না, একেবারেই তা নয়। পালাতে ব্যস্ত হব কেন? এতদিন কাজ করছি, কোথাও কোনো বাড়ীতে আমি এত নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারিনি। আমি যে ভদ্রলোকের মেয়ে তাও বিশেষ কোথাও স্বীকার করেনি কেউ। glorified ঝিয়ের মতই থেকেছি। অবশ্য আমার কাজটাও অনেকটা সেইরকম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে ত মা মাসীকেও ঝি ভাবতে হয়, তাঁরাও ঐ কাজই করেন। আচ্ছা, তোমাকে কতগুলো personal কথা জিগ্‌গেস করি, কিছু মনে কোরো না। তোমার জীবনের ইতিহাসের খানিকটা আমি শুনেছিলাম একটি ছেলের কাছে। স্বপ্নাকে যেদিন দেখতে যাওয়া হয়, সেদিন সে গিয়েছিল বরের বন্ধুরূপে। তোমায় চিনতে পেরেছিল। তার কাছে তোমার কথা শুনলাম, যদিও সব কথা detail-এ সে জানে না সেই বীভৎস বিবাহ সভায় সে উপস্থিত ছিল। তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ?"

বিনতা বলিল, "না, বিরক্ত হব কেন? আমি ত নিজে অপরাধ কিছু করিনি? শুধু অনাবশ্যক কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে অবশ্য নিজের দুঃখের কথা আমি কাউকে বলিতে চাই না। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সে জন্যে জানতে চাইছেন না?"

"না তা নয়। তবে সেদিন থেকেই ভাবছি যে তোমাকে কোনোদিক দিয়ে যদি কিছু সাহায্য করা যায়, তাহলে হয়ত ভাল একটা career তোমার হতে পারে। অত অল্প বয়সে তোমার যে রকম মনের জোর তুমি দেখিয়েছ, তাতে বোঝা যায় যে তোমাকে সাহায্য করলে সেটা বিফল হবে না, যা করতে তুমি চাইবে, তা তুমি পারবে।"

বিনতা অনেক কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করিল। সহানুভূতি বা সমবেদনা সে জীবনেই কখনও পায় নাই বোধ হয়। একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি জানতে চান বলুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পড়াশুনো কতদুর করেছ?"

বিনতা বলিল, "বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর কাছে পড়ে ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম। পাসও করেছিলাম। তারপর অবসর পেলেই একটু-আধটু পড়েছি, তবে পরীক্ষা দিতে হলে যতটা তৈরি হওয়া দরকার তা হতে পারিনি।"

"এ লাইন বেছে নিলে কেন?"

বিনতা বলিল, "টীচারি করতে গেলে যা পেতাম, তাতে আমার মা, ভাই আর আমার নিজের খাওয়া-পরা চলত না। এতে সামান্ত কিছু বেশী পাই, সারা মাস কাজ করলে।

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাক তুমি ?"

বিনতা বলিল, "এখানে একজন পিসীমা আছেন, তাঁর বাড়ী থাকি। মা আর ভাই গ্রামে থাকেন, আমার মাসিমার সঙ্গে।"

"মামার বাড়ীর গ্রাম থেকে, এঁরই কাছে তুমি পালিয়ে এসেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, আই. এ. দিতে যদি চাও, তাহলে ক'মাস সময় দরকার হবে তোমার তৈরি হয়ে নেবার জন্তে।"

"মাস ছয় হলে পারি।"

হরেন্দ্রনাথ এইবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ভেবে দেখি কি হলে সুবিধা হয়।"

বিনতাও খাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। তাহার চোখ দিয়া ক্রমাগত কেন যে জল পড়িতে লাগিল, তাহা অন্ত কেহ বুঝিত না, নিজেও সে পুরোপুরি বুঝিল না।

ঝি একজন পরদিনই উপস্থিত হইল। নাম মোতী, গোলকের দূরসম্পর্কের পিসীমা হয়। মাঝবয়সী, বিধবা মানুষ। অন্তকাজ যত পারুক বা নাই পারুক, পাড়াগাঁয়ের গল্প করিতে খুব ভাল পারে, এবং পা টিপিতে বলিলে কোনো আপত্তি করে না। কাজেই স্বর্ণ তাহাকে অবিলম্বে অত্যন্ত পছন্দ করিয়া বসিল।

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বর্ণ, ঝি পেয়ে খুব খুশি ত ?"

স্বর্ণ বলিল, "হ্যাঁ মেজমামা, ভারি চমৎকার মানুষ; কত গল্প করেছি কাল রাতে। ঘুমতে বারোটা বেজে গেল।"

হরেন্দ্রনাথ কিছু বলিবার আগেই রমেশ বলিল, "তোমার যে শুধু বারোটা বাজল তা নয়, আমারও বাজল। যা ভ্যান্‌ভ্যান্‌ করেছ। আমার ঘর থেকে আবার তোমার ঘরের প্রায় সব কথাই শোনা যায়।"

স্বর্ণ বলিল, "এ রাম, তাই নাকি ? তবে ত আস্তে আস্তে কথা বলতে হবে।"

তাহার মেজমামা বলিলেন, "কথাটা না বললেই ভাল রাত্রিবেলা। তোমার ত নটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়া উচিত। আচ্ছা বিনতা, তুমি ত এখন অনেক সময়ই free থাকবে। পড়াশুনোটা কর না কিছু কিছু ? বইটই এখানে নিয়ে এসেছ কি ?"

বিনতা বলিল, "আনিনি কিছু। তা আজ বিকেলে গিয়েই নিয়ে আসতে পারি। যাব তাই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিকেলে চা খাবার পর যেও, তখন গাড়ীটা দিতে পারব।"

বিনতা বলিল, "গাড়ীর আর কি দরকার ? ট্রামেই যাব।"

"আবার একটা বোঝা ঘাড়ে করে ট্রামে-বাসে ওঠবার কি দরকার ? গাড়ীতেই যেও", বলিয়া হরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

অন্তদিন যে সময়ে ফেরেন, হরেন্দ্রনাথ তাহার আগেই আজ ফিরিয়া আসিলেন। চা খাইবার সময় টেবিলে বসিয়া শুধু এক পেয়ালা চা খাইলেন।

স্বর্ণ বলিল, "তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন মেজমামা ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চারদিকে যা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, আমারও ছোঁয়াচ্‌ লেগেছে বোধ হয়। জর আসবেই

মনে হচ্ছে। আর দেখ স্বর্ণ, যদি আমি শুয়েই পড়ি, ঘটা করে আমায় দেখতে এস না। Infection লাগান এখন তোমার একেবারে চল্‌বে না। ছায়াই মাড়াবে না আমার ঘরের।" বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বইগুলো নিয়ে এস গিয়ে তাড়াতাড়ি, আর ফিরবার পথে আমার ছোট কম্পাউণ্ডার ঋষিকেশকে অমনি ডেকে নিয়ে আসবে।" তিনি প্রস্থান করিলেন, স্বর্ণ এবং বিনতাও খাবার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিনতা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া পিসীমার বাড়ী চলিল। খুব বেশী দূর নয়। দেড়তলা মতন স্থানে, দুটি ছোট ছোট খুপরির মত ঘর। একটিতে পিসীমা থাকেন, আর একটিতে বিনতা থাকে, যখন তার কাজ থাকে না। পিসীমার ঘর সামান্য একটু বড়, তবে জিনিসপত্রে ঠাসা। বিনতার ঘরে একখানা ছোট তক্তাপোষ আছে আর একটি বেতের চেয়ার। কাপড়-চোপড় রাখার জন্য দেয়ালে আটকান আল্‌না। পিসীমার একটি মেয়ে আছে, সে বিবাহিতা। যখন মায়ের কাছে বেড়াইতে আসে, তখন রাত্রে বিনতার সঙ্গেই শোয়, মায়ের ঘরে জায়গা হয় না।

বিনতা তাড়াতাড়ি নিজের খাতা বই প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে ঋষিকেশকে সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। উপরে গিয়া নিজের ঘরে সেগুলি গুছাইয়া রাখিল। মোতীকে বলিল, "আজ আমার বিছানাটা আমার ঘরেই করে দিও ত।" তাহার পর হরেন্দ্রনাথের ঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি খাটে বসিয়া ঋষিকেশের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, সে নাকে কাপড় দিয়া সঙের মত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া বিনতার গাটা বিরক্তিতে জ্বলিয়া গেল। ঋষিকেশ বাহির হইতেই সে-ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি জ্বর সত্যিই এসেছে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "এসেইছে মনে হচ্ছে। তুমি ঘরে যে ঢুকছ, যদি আবার তোমার হয়? স্বর্ণও ত তাহলে বিপদে পড়বে?"

বিনতা বলিল, "ওর ঘরে আজ আর যাবই না আমি। মোতী ওর কাজ করছে করুক, ওকেই স্বর্ণের বেশী পছন্দ। আপনাকে কে দেখবে, সবাই দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকলে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "আমার অসুখ-বিসুখ করে এতই কম যে আমার দেখাশোনা করার লোক বিশেষ কেউ নেই। ভাবছিলাম ঋষিকেশটাকে একটু কাজে লাগাব, তা তার নাকে কাপড় দেওয়ার ঘটা দেখে আর ভরসা হচ্ছে না, ভয়েই মরে যাবে।"

বিনতা বলিল, "আমি করে দিচ্ছি আপনার সব কাজ। নাকে কাপড়ও দেব না, ভয়েও মরব না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি পুরুষ patient-এরও কাজ করেছ নাকি?"

বিনতা বলিল, "করেছি, দুতিন জনের। একেবারে শয্যাগত রোগী নয় অবশ্য। তাঁরা কাজে সন্তুষ্টই ছিলেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অসন্তুষ্ট আর হবেন কোন দুঃখে? অন্য দেশেও সব রকম patient-এর কাজই মেয়ে নার্সরা করে। আমাদের দেশেই নানা বাধা আছে। যাক্ কেমন থাকি আগে দেখি। আচ্ছা, থার্ম্মোমিটারটা দাও ত ঐ দেরাজ থেকে।"

বিনতা থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া জ্বর দেখিল, ইহারই মধ্যে ১০২০-এর উপরে উঠিয়াছে। হরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া আবার থার্ম্মোমিটার সরাইয়া রাখিল। মোতী ঝি বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি জানতে চাইছেন মামাবাবুর কি সত্যিই জ্বর হয়েছে?"

বিনতা দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "সত্যিই জ্বর হয়েছে, বেশ বেশী জ্বর। দিদিমণি যেন এদিকে না আসেন।"

হরেন্দ্র শুইয়া শুইয়া একখানা মাসিকপত্র উল্টাইতেছিলেন। বলিলেন, "অসুখের সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে যে করবার কিছু থাকে না। মানুষ ভয়ানক ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে যায় এতে।"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু পড়ে শোনাব?"

"শোনাও। গান অত সুন্দর কর, পড়তেও নিশ্চয়ই ভাল পার। একটু কবিতা পড়ে শোনাও, প্রায় গানের মতই লাগবে।"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বই থেকে শোনাব?"

"ঐ আলমারিটা খোল, ওতে কাব্যগ্রন্থ আছে সবগুলো। ওর থেকে "যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" কবিতাটা শোনাও।"

বিনতা বই বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। চেয়ারটা খাটের খুব কাছে টানিয়া লইল। মৃদুকণ্ঠেই পড়িতে লাগিল। খুব বড় কবিতা নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পড়াটাও দেখি গানের মত ভাল আসে তোমার। আচ্ছা, এইবার "স্বর্গ হইতে বিদায়"টা পড় দেখি।"

বিনতা পাতা উল্টাইয়া কবিতাটি বাহির করিল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাঁড়াও ঘরের ঐ বড় আলোটা নিভিয়ে দাও ত। এই কোণের আলোটা জ্বাল, বইয়ের উপর ঠিক আলো পড়বে, আমার মুখে পড়বে না।"

নির্দ্দেশমত আলো জ্বালিয়া ও নিভাইয়া বিনতা আবার পড়িতে বসিল। এ কবিতাটি শেষ হইলে হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "যেতে নাহি দিব" পড়তে পারবে?"

বিনতা একটু থামিয়া বলিল, "ওটা জোরে জোরে পড়তে আমি পারি না, চোখে জল এসে যায়। বড় বেশী বাবার কথা মনে পড়ে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থাক তাহলে, একটু বিশ্রাম করে নাও। ভাগ্যে ছিলে বাড়ীতে, না হলে ঋষিকেশকে সম্বল করে এই রোগের দুস্তর সাগর কি করে পার হতাম জানি না। আর যাই করুক, এমন সুন্দর করে কবিতা পড়ত না। তুমি রবীন্দ্রনাথের সব বই পড়েছ?"

বিনতা বলিল "সব বই ত হাতে পাইনি? যতগুলি পেয়েছি, পড়েছি, অনেকবার করে পড়েছি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার খুব ভাল লাগে ওঁর লেখা?"

বিনতা বলিল, "ওঁর লেখা ভাল না লাগাও সম্ভব নাকি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সম্ভব না হবে কেন? আমাদের দেশ ত ভর্ত্তি এই সব অসম্ভব সম্ভাবনায়।"

বিনতা বলিল, "আপনি বারবার চুলের ভিতর আঙুল চালাচ্ছেন, আপনার নিশ্চয় মাথা ব্যথা করছে। আমি টিপে দিই?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাও টিপে। তবে বিছানায় উঠে বসতে হবে, অত দূর থেকে টেপা যাবে না।"

বিছানায় উঠিয়া বসিয়াই বিনতা তাঁহার মাথা টিপিতে লাগিল। মাথাটা বেশ উত্তপ্ত, জ্বর আরো বাড়িয়াছে বোধহয়। একটু পরে হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি থেকে তো আমায় বাঁচালে, কিন্তু তোমার

নিজের ত বিপদ ঘটতে পারে। আমি দুই একদিনে উঠব না, বুঝতেই পারছি। ক'দিন তোমার এই জ্বরের রুগী নিয়ে বসে থাকতে হবে তার ঠিকানা নেই। তারপর যদি তুমি রোগে পড়, তখন তোমায় দেখবে কে ?"

বিনতা বলিল, "বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।"

"বাড়ীতেই বা তোমাকে দেখবে কে ? ঐ বৃদ্ধা পিসীমা ?"

বিনতা বলিল, "আর কেউ যদি না থাকে আমার ত কি আর করা যাবে ?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "কেউ না থাকলেও সেবা-যত্ন হওয়া সম্ভব, তা দেখতেই পাচ্ছ। তোমারও ঐরকম করে হবে, যদি দরকার হয়।"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিনতা বলিল, "কি নার্সের জন্যে আর একটা নার্স রেখে দেবেন ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি নার্স এইটেই কি তোমার একমাত্র পরিচয় ?"

বিনতা বলিল, "তা নয়। তবে অন্যলোকে ত আমার আর কোনো পরিচয় স্বীকার করেনি, তাই আমিও সেগুলো ভুলে যেতে বসেছিলাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিজে যে মানুষ, সে পরিচয়টা যে ভোলেনি, তার প্রমাণ ত পাচ্ছি। কিন্তু তোমার কি আজ খাওয়া-দাওয়ারও দরকার নেই, রাত বেশ হয়েছে না ?"

বিনতা বলিল, "না, বেশী কিছু রাত হয়নি। আমার খাবার তুলে রাখতে বলে আস্‌ছি, পরে খাব এখন। আপনি কি খাবেন বলুন, তৈরি করতে বলে আসি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বার্লিওয়াটার ছাড়া আর কিছু আমার খাওয়া চল্‌বে না এখন। তাই করতে বল।"

বাহির হইয়া গিয়া বিনতা প্রয়োজনমত নির্দ্দেশ দিয়া আসিল। ঋষিকেশ এই সময় কতগুলি ওষুধপত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। টেবিলে সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া ও হরেন্দ্রনাথের কয়েকটা নির্দ্দেশ শুনিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। বিনতা আসিয়া ঔষধাদি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই ছেলের আবার ডাক্তার হবার সখ ছিল। আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে কত সুবিধা করবার চেষ্টা করেছে।"

বিনতা বলিল, "সব মানুষ সব কাজ পারে না। আমার একটি মামাতো ভাই আছে, রক্ত দেখলেই তার ফিট হয়। আমার যদি ডাক্তার হবার সুযোগ থাকত, তাহলে ভালই ডাক্তার হতে পারতাম। রোগকে ভয় পাই না, মূর্চ্ছাও যাই না কাটা ছেঁড়া দেখলে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আই. এস. সি পাস করে ডাক্তারী পাস করতে ত তোমার ত্রিশ বছর বয়স হয়ে যাবে।"

বিনতা বলিল, "শুধু তাতে ত দুঃখ ছিল না, না হয় হলই ত্রিশ বছর। কিন্তু এই সাত আট বছর আমার মা আর ভাইয়ের কি হত ? আর আমারই বা খরচ চলত কি করে ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ত বটে, ও লাইনে ভাবা চল্‌বে না। জ্বরটা ছাড়ুক আগে, তারপর ও নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আচ্ছা, ঐ tablet দাও ত দুটো।

বিনতা জল আনিল, ঔষধ আনিল। বাথরুম হইতে তোয়ালে লইয়া আসিল, মুখ মুছিবার জন্ত। তাহার পর আবার সব সরাইয়া গুছাইয়া রাখিল। হরেন্দ্রনাথের জ্বর বোধহয় আবার বাড়িতে আরম্ভ

করিল। বিনতা আবার মাথা টিপিতে বসিল। মাথার যন্ত্রণা একটু কমিয়াছে দেখিয়া, পা হাত টিপিতে বসিল। সারাটা রাত তাহার প্রায় এইভাবে চলিল। হরেন্দ্রনাথ একবার বলিলেন, "তোমাকে এরকম করে ভোগাতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে বিনতা।"

বিনতা বলিল, "কি আশ্চর্য্য। সেবা করতে বসলে ঐ সব ভাবা যায় নাকি? আমার কাজই ত এই? আপনি যদি আমার নিজের দাদা হতেন, আমি করতাম না? একটুও কিছু ভাববেন না আপনি। বারোমাস ত আমি এই কাজ করি?"

"কর, উপায় যখন নেই। আমি রোগে পড়িনি বহুদিন, তাই বড় অস্থির লাগছে। চুলটা একটু টেনে টেনে দাও ত?"

বিনতা বিছানায় বসিয়া আবার আস্তে আস্তে চুলের গোছা টানিয়া টানিয়া দিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, "বার্লিটা নিয়ে আসি, আপনি খেয়ে নিন্ ত। তারপর ঘুমবার চেষ্টা করুন।

"আচ্ছা আন। ঘুমটা আসতে আসতেও আসছে না।"

বিনতা গিয়া বার্লি লইয়া আসিল। খাওয়ান হইয়া গেলে নিজে একছুটে গিয়া দুইগ্রাস ভাত খাইয়া আসিল। একেবারে মিথ্যা কথা বলিলে ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিবেন না।

তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল?"

বিনতা বলিল, "যেদিন night duty করি, সেদিন রাত্রে বেশী কিছু খাই না।"

"ভালই কর। তবে সত্যি কিছু একটু খেয়েছ ত?"

বিনতা বলিল, "নিশ্চয়। নইলে গেলাম কি করতে?"

সে আস্তে আস্তে বিছানা বালিশ সব ভাল করিয়া ঝাড়িয়া গুছাইয়া দিল। বাদলা হাওয়া আসিতেছে দেখিয়া দুই একটা জানলা বন্ধ করিল। তাহার পর প্রয়োজন মত হাত পা টিপিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া রোগীকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাঝরাত পর্য্যন্ত রোগের কষ্ট সমানই চলিল, তাহার পর অবিরাম পরিচর্য্যার ফলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক, যন্ত্রণা কমিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিনতা উঠিল না, সেইখানে বসিয়া যেমন কাজ করিতেছিল, করিতে লাগিল। নির্দ্দেশমত আবার ঔষধ খাওয়াইল।

রাত একটার কাছাকাছি হরেন্দ্রনাথ ঘুমাইয়া পড়িলেন। পাছে ঘুম ভাঙে বলিয়া এবার বিনতা হাত সরাইয়া লইল। খাট হইতে নামিয়া খাটের সঙ্গে লাগান একটা চেয়ারে বসিল। ঘরের কোণের দিকের একটা খোলা জানালার পথে বর্ষার রজনীর মেঘ ভারাক্রান্ত আকাশ দেখা যাইতেছে। ঘরে স্তিমিত আলো, অর্দ্ধেক ছায়া, অর্দ্ধেক আলো। হরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিটা যেন পাথরের খোদা মূর্ত্তির মত দেখাইতেছে।

তাহার অল্প অল্প ঘুম আসিতে লাগিল। তবু জোর করিয়া ঘুমাইল না, আবার যদি হরেন্দ্রনাথ জাগিয়া ওঠেন। কিন্তু ভোর রাত্রির কাছাকাছি পর্য্যন্ত তিনি জাগিলেন না। এই সময় পরিশ্রান্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়াই বিনতা ঘুমাইয়া পড়িলেন, এবং তাহার মিনিট পনেরো কুড়ি পরেই হরেন্দ্রনাথ চোখ খুলিয়া তাকাইলেন। ঘরের আলোটা বড় স্তিমিত, তাহার মধ্যে নিদ্রিতা বিনতাকে কেমন যেন ছায়ার মত দেখাইতেছে। অত্যন্ত ছেলেমানুষ দেখাইতেছে, যেন ঘুমের মধ্যে তাহার বয়স আরো পাঁচ বৎসর কমিয়া গিয়াছে।

৫

মানুষের দৃষ্টির একটা প্রভাব আছে বোধ হয়। হরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ বিনতার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই সে হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাকাইল। হরেন্দ্রনাথ জাগিয়া আছেন দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ উঠেছেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশীক্ষণ না, মিনিট দশ পনেরো হবে। তুমি একটুও ঘুমতে পারলে?"

ঘণ্টাখানিক ঘুমিয়েছি।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি অন্ততঃ চারঘণ্টা ঘুমিয়েছি। একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে এখন। জ্বরটা কমছে বোধ হয়। তুমি না থাকলে আজ আমি যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যেতাম বিনতা। এইরকম কষ্ট নিয়ে একলা পড়ে থাকা, একটা ভয়াবহ ব্যাপার।"

বিনতা বলিল, "কেউ কি আর আসত না? তা কখনও হয়? এতগুলো লোক রয়েছে বাড়ীতে?"

"আসবার মত কে আছে? স্বর্ণ আসতে পারে না। রমেশ ত অর্দ্ধেক দিন কলেজে duty দেয় রাত্রে। না দিলেও আমার ধারে কাছে আসত কিনা সন্দেহ। সেও একটি দ্বিতীয় ঋষিকেশ। আর ঝি চাকরের কথা ছেড়ে দাও।"

বিনতা বলিল, "নার্স একটা আনিয়ে নিতে ত পারতেন, মেয়ে হোক, পুরুষ হোক।"

"প্রথম দিনই কাউকে ডাকার কথা মনে হত কিনা সন্দেহ। এমন চট করে বেড়ে যাবে তা ভাবিনি। আর মেয়ে নার্স একজন অপরিচিত এসে আমার কতটা সেবা করত জানি না। তুমি বাড়ীর মানুষের মত হয়ে গেছ তাই তোমার কাছে এতটা শুশ্রূষা নিতে পারলাম। কোনো male nurse হয়ত জুটতেন শেষ পর্য্যন্ত এবং তাঁর চটা ওঠা হাতের ঘর্ষণে আমার গায়ের অর্দ্ধেক চামড়া এতক্ষণে উঠে যেত।"

বিনতা বলিল, "বেচারারা! তাদের হাত নরম নয় ত তারা আর কি করবে?"

"করবে না কিছুই। সেবা করাটা মেয়েদেরই কাজ, তারা করলেই ভাল। শিশু আর রোগী এরা মেয়েদের হাতে যতটা ভাল থাকে ততটা আর কারো কাছে থাকে না"।

বিনতা বলিল, "জ্বর কতটা আছে দেখব এখন?"

"দেখ।"

থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া বিনতা জ্বর পরীক্ষা করিল। এখন ১০১° ডিগ্রী। বলিল, "বেশ খানিকটা কমেছে। মাঝ রাতে গায়ে হাত দিয়ে মনে হচ্ছিল যেন এর চেয়ে আরো দু ডিগ্রী বেশী।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর একটু কমবে হয়ত। তবে দিনের বেলা, বিশেষ করে বিকালের দিকে আবার বাড়বে। তুমি দুপুরে ঘুমিয়ে নিও খানিকটা।"

"নেব। দিনের বেলা আপনি যখন ঘুমিয়ে যাবেন, সেই সময় আমিও ঘুমিয়ে নেব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভোর হয়ে আসছে। আর এখন ঘুমতে ইচ্ছা করছে না। মুখ হাত ধুয়ে একটু চা খেতে পারলে হত। তা শ্রীমান গোলকের এখনও উঠতে দেরী আছে।"

বিনতা বলিল, "তার জন্যে বসে থাকার কি বা দরকার? উপরে ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ রয়েছে, আমি এখনি করে আনতে পারি। দাঁড়ান আপনার মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থাটা আগে করে দিই। যা বাদলা, গরম জল ব্যবহার করাই ভাল।"

সে বাহির হইয়া গিয়া নিজের হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল। ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গেল। তারপর জল একটু গরম করিয়া রোগীর মুখ ধোয়ার জন্ম লইয়া আসিল। তাঁহার নির্দ্দেশ মত টুথপেষ্ট ব্রাশ্ প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল, তোয়ালে আনিল, ছোট গামলা আনিয়া ছোট টেবিলের উপর রাখিল। হরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এইবার জানালা দিয়ে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাক। আমার দাঁত খিচনো মূর্তিটা তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা করি না।"

বিনতা হাসিয়া বলিল, "বাবা আপনি বড় বেশী fun করেন। অসুখ করেছে, এখন অত ভদ্রতা করলে চলে? আচ্ছা আমি ততক্ষণ চা-টা করি গিয়ে, আপনি মুখ ধুয়ে নিন", বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের ট্রে হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। হরেন্দ্র মুখ ধুইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন, "শুধু একটা পেয়ালা কেন? আর একটা নিয়ে এস। তুমিও খাও, সারারাত জেগে রয়েছ।"

বিনতা আর একটা পেয়ালা লইয়া আসিল। ভাবিয়া হাসি পাইল যে বেশীর ভাগ বাড়ীতেই তাহাকে ঝিদের সঙ্গেই চা, ভাত সব খাইতে দেওয়া হইত। হাসিটা মুখ হইতে ভাল করিয়া মুছিবার আগেই সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসছ কেন?"

বিনতাকে কারণটা বলিতে হইল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাদের অত দোষ দিও না বিনতা। সেখানে টাকার সম্পর্কটাই ছিল শুধু। তারা টাকা দিয়েছে, তুমি কাজ দিয়েছ। এখানের সম্পর্কটা প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে সে রকম ব্যবহার তুমি কি করে পেতে পার?"

বিনতা কিছু না বলিয়া নীরবে চা ঢালিতে লাগিল। এক পেয়ালা চা হরেন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "আরো আছে খানিকটা টি পটে।"

হরেন্দ্রনাথ চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "এই কাজ করছ ত অনেক দিন, কিন্তু আগাগোড়াই resent করেছ মনে হচ্ছে।"

বিনতা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "resent করিনি, কিন্তু মনে খুব কষ্ট পেয়েছি। ছোটবেলায় গ্রামে যখন ছিলাম, তখন বড়লোক ছিলাম না, কিন্তু গ্রামের মধ্যে আমার বাবারই খ্যাতি ও সম্মান বেশী ছিল পাণ্ডিত্যের জন্যে, সাধুতার জন্যে। আমি তাঁর মেয়ে হয়ে এতই নীচে নেমে গেলাম? একেবারে ঝি চাকরের দলে চলে গেলাম?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কষ্ট হতে পারে বটে তোমার। অদৃষ্টচক্রে মানুষকে অনেক রকম দুঃখ পেতে হয়। অন্য কোন লাইনে গেলে ভাল করতে। কিন্তু তোমাকে পরামর্শ দেবার বা সাহায্য করবার কেউ ছিল না যে। আশা করছি আমি এবার তোমার জন্যে আর একটু ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। কোন কাজটা সবচেয়ে তোমার পছন্দসই হবে তাই ভাবছি। অবশ্য রোজগারও খানিকটা করা চাইত।"

বাড়ীর চাকর-বাকরের সাড়া এইবার পাওয়া যাইতে লাগিল। বিনতা বলিল, "ওরা যখন চা করবে, আপনার জন্যে আবার আনব?"

"আন। তবে স্বর্ণের ধারে কাছে যেও না।"

"না, না, ও উঠবার আগেই আমি স্নান করে, কাপড় বদলে ফেল্‌ব। তাতেই হবে, না?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাতেই হবে। আমার সত্যিই ত আর বসন্ত হয়নি। তবে মেয়েটা অসুস্থ, তাই ভাবনা বেশী। বড় একটা ট্রেতে করে তোমার চাও এই ঘরেই নিয়ে এস।"

চায়ের বাসন-কোষণ তুলিয়া লইয়া বিনতা বাহির হইয়া গেল। সে সব যথাস্থানে রাখিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময় স্বর্ণ হাই তুলিতে তুলিতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিনতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন মেজমামা?"

বিনতা বলিল, "আছেন এখন একটু ভাল, রাত্রে বড় কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু তুমি রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াও ভাই, আমার কাছে এসো না। আমি স্নান করে আসি আগে, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

"বাবাঃ, তোমাদের এতও ঝামেলা। হয়েছে ত ভারী একটু জ্বর। তাতে এত ছোঁয়াছুঁয়ির ভাবনা। আমরা ত সব এক ঘরেই শুই, জ্বর হলেও।"

বিনতা বলিল, তা শোও হয়ত। কিন্তু এখন যে তোমার শরীর ঠিক নেই।" বলিয়া স্বর্ণকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া সে তাড়াতাড়ি স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া নিজে চা-টা খাইয়াই লইল। রোগীর ঘরে বসিয়া খাইতে কেমন যেন লজ্জা করে। তাহার পর হরেন্দ্রনাথের চা লইয়া তাঁহার ঘরে চলিল। পথে রমেশের সঙ্গে দেখা। বিনতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেজদার জ্বর খুব রয়েছে এখনও?"

বিনতা বলিল, "জ্বর আছে এখনও। তবে রাত্রে যতটা বেড়েছিল, ততটা আর নেই।"

রমেশ বলিল, কাল রাত্রে ফিরতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন ভাবলাম, আর disturb করব না। আজ দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।"

বিনতা বলিল, "আচ্ছা। আজ হয়ত ভালই থাকবেন।" চা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বড় কম্পাউণ্ডার বীরেন দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। বিনতাকে দেখিয়া নমস্কার করিল, তাহার পরে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এখন অনেকেই খোঁজ-খবর নিতে আসছেন। কিন্তু শুধু আমার চা কেন?"

বিনতা বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা। ঐ ওষুধগুলো দেখে রাখ, চা খাওয়ার আধঘণ্টা খানিক পর থেকে খাওয়াতে আরম্ভ কোরো। আমি ভাল থাকতে ত আমার বিশ্রাম নেই, অসুখে পড়লেই এক বিশ্রাম। তা শরীরে বেশী যন্ত্রণা থাকলে এ বিশ্রামও কাজে লাগে না।"

বিনতা বলিল, "আজ হয়ত কষ্ট হবে না অত।"

"আজই খুব বেশী ভাল থাকব না। দেখা যাক্, গোলকটাকে বল ত খবরের কাগজ-টাগজ গুলো দিয়ে যেতে। তুমি কাগজ পড়ো না?"

"পড়ি, তবে ইংরিজি কাগজ সব সময় হাতে আসে না। পিসীমা একখানা বাংলা কাগজ নেন, সেটাই পড়ি, যখন তাঁর কাছে থাকি। আচ্ছা, বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দিই? কোথায় থাকে ধোওয়া চাদর?"

"ঐ আলমারিটাতে। এই নাও চাবি।"

বিনতা আলমারি খুলিয়া চাদর প্রভৃতি বাহির করিল, বলিল, "আপনার উঠবার কিছু দরকার নেই, আমি এমনিই পারব।"

বিছানা ঠিক করিয়া হরেন্দ্রের কপালে হাত দিয়া বলিল, "আপনার জ্বর আর একটু কমেছে বোধহয়। দেখব ?"

"মেজদা", বলিয়া ডাক দিয়া রমেশ এই সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এখন জ্বর কত ?"

"এখনই চা খেলাম, দেখব একটু পরে। তা তুই যে এসে জুটলি, যদি infection লাগে ?"

রমেশ বলিল, "লাগে লাগবে, কলেজে কি কেউ আমাকে অত খাতির করে চলে ? কোন রোগটা না ঘাঁটছি ?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "সে কাজের খাতিরে যা কর তা কর। এখানে এখন দরকার ত নেই কিছু, বিনতাই সব করছেন।" রমেশ বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে মোতী ঝি খবর লইয়া গেল, এবং গোলক খবরের কাগজ দিয়া গেল। হরেন্দ্র বলিলেন, "বিখ্যাত ব্যক্তি হলে কাগজে bulletin ছাপিয়ে দিলে হত, সকলেই একসঙ্গে জানতে পারত।"

দিনের কাজ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। দুপুরের পর হইতেই জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল। কাজেই হাজার অনুরোধ সত্বেও বিনতা ঘুমাইতে যাইতে পারিল না। রোগীর ঘরেই চেয়ারে বসিয়া মাঝে মাঝে দশ পনেরো মিনিট করিয়া ঝিমাইয়া লইতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেনটাকে আসতে বলব নাকি ? সে রাজী আছে।"

বিনতা বলিল, "আজই কিছু দরকার নেই। আমি উপরি উপরি তিন চার রাত জেগেছি কত। আর এখন ত শুধু বসে আছি, করতে হচ্ছে না ত কিছু ?"

"রাত্রে হবে। আচ্ছা, আজকের দিনটা দেখ। কালকেও যদি বেশ খানিকটা না কমে, তাহলে আর একটা লোক একদিনের জন্যে হলেও রাখতে হবে। নইলে তোমার নিশ্চয় অসুখ করবে, আমি সেটা একেবারে চাই না।"

সন্ধ্যা হইতে আবার মাথার যন্ত্রণা সুরু হইল, জ্বরও বাড়িল। বিনতা আবার আগের রাত্রেরই মত জাগিয়া কাটাইল। তবে যন্ত্রণা অত তীব্র নয়, জ্বরও অত বাড়িল না। মাথা টিপিতে হইল না, বসিয়া বসিয়া চুলের ভিতর দিয়া আঙ্গুলি চালনা করিয়াই বিনতা রোগীকে ঘুম পাড়াইয়া দিল। শেষ রাত্রের দিকে কিছুক্ষণ হাত পা টিপিতে হইল।

ভোরবেলা হরেন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙিল। বলিলেন, "সকালের কাজগুলো করে দিয়ে তুমি ছুটি নাও আজকের মত। সন্ধ্যার আগে আর এদিকে এসো না। বীরেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সে দিনের বেলাটা থাকবে। রাত্রে হয়ত আবার তোমায় ডাকতে হবে। তোমার পরিচর্য্যা ছাড়া ঘুমতে পারব না।"

বিনতা বলিল, "আপনি অনর্থক ভাবছেন দেখুন। আমি ঠিক পারব। আচ্ছা, আপনি বীরেনবাবুকে ডাকুন দুপুরের জন্যে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, তার পর আরো তিন রাত উপরি উপরি জাগতে পারব। অবশ্য তার দরকার হবে না। আজ ত মনে হচ্ছে জ্বর আরো কমে গেছে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাও দেখি থার্ম্মোমিটারটা, কম হতে পারে।" জ্বর সকালে খুবই কম দেখা গেল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল হয়ত ছেড়ে যেতে পারে। মাথাটাও হাল্‌কা হয়ে গেছে, গলাটাও better, এ নিতান্ত তোমার সেবার গুণে বিনতা। যেরকমভাবে আরম্ভ হল, তাতে আশা করিনি যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাব।"

বিনতা বলিল, "আগে একেবারে সেরে যান ত ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল না হয় পরশু সেরেই যাব। এক গণৎকার কিছুদিন আগে বলেছিলেন বটে যে, শীগ্‌গিরই একটা শারীরিক উৎপাতের সম্ভাবনা আছে।"

বিনতা বলিল, "এইটুকুই বলতে বুঝি তাঁর বুদ্ধিতে কুলল ? ভাল কিছু বলতে পারলেন না ?"

ভালমন্দ ঢের কিছুই বলেছেন। কতদূর ঘটে ওটে দেখা যাক্। দাও এখন ওষুধ। আর আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে একটা টেলিফোন করে এস, বীরেন যেন দশটার পরে চলে আসে। চারটে পর্য্যন্ত তাকে থাকতে হবে।"

বিনতা নির্দ্দেশ পালন করিয়া আসিল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, এখন ত অনেকটা ভাল আছি। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। তোমার এমন কিছুর মধ্যে যাওয়া উচিত, যার course খুব লম্বা নয়, ধর ছ'মাস থেকে একবছর। এর ভিতর গান ভাল করে শিখতে পার ? বেশ শেখাবার মত ?"

বিনতা বলিল, "গানের recognised স্কুল বা কলেজ যা আছে, সেগুলোর course অত ছোট নয়, চার পাঁচ বৎসর লাগবে। বাড়ীতে শেখা যায় অল্প সময়ে ওস্তাদ রেখে, কিন্তু সে একে খরচ অত্যন্ত বেশী, তার উপর একটা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা না থাকলে, চাকরি পাওয়ারও সুবিধা থাকে না।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "মাষ্টারীর লাইনে যদি যাও, তা সেও চার পাঁচ বৎসরের কম হবে না। অন্ততঃ বি. টি. পাস না করলে ত ভাল কাজ পাবে না ?"

"সেই ত, কোনদিকেই সুগম পথ কিছু নেই।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "অল্পসময়ে, মানে এর চেয়ে অল্প সময়ে, নার্সিংএর ডিপ্লোমা তোমার জুটে যেতে পারে। অনেকদিন একাজ করেছ, সেটারও খানিক মূল্য আছে। তবে এই লাইনের যোগ্যতা তোমার যতই থাক, কাজটা তুমি পছন্দ কর না। আমারও ভাবতে ভাল লাগে না যে তুমি চিরকাল রোগ ঘেঁটেই দিন কাটিয়ে দেবে। আরো দু একটা লাইন আছে অবশ্য, কিন্তু সে বিষয়ে ভাল করে খোঁজ-খবর না নিয়ে কিছু বল্‌ব না।"

আজ সামান্য কিছু পথ্যও সেবন করিলেন। খাইয়া-দাইয়া বিনতা যখন আবার হরেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকিল, তখন বীরেন আসিয়া বসিয়া আছে। ঔষধাদি কখন কি দিতে হইবে সব তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া বিনতা বলিল, "ঠিক চারটে বাজলেই আসব আমি। আপনার চা একেবারেই নিয়ে আসব।"

ঘরে ঢুকিতেই শুনিল স্বর্ণের ঘরে উচ্চকণ্ঠে কাহারা গল্প করিতেছে। আজ ছুটির দিন, রমেশের কলেজ নাই, তাহারই গলা। স্বর্ণের কোন এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "মেজদার আবার ভাবনা যা জোর কপাল নিয়ে জন্মেছেন। আমাদের জ্বর হলে কেউ কখনও ঝাঁটা মেরেও জিগ্‌গেস করে না। আর ওঁকে দেখ, এমন মোলায়েম সেবা পাচ্ছেন যে মাথা ধরা সারার বদলে আরো বেড়ে যাবে। এমন যত্ন কি লোকে হাতছাড়া করতে চায় সহজে ?"

স্বর্ণ বলিল, "তুমি বড় ফাজিল বাপু। নার্স সেবা করছে তাও তোমার সয় না ? নিজেরা গেলেই পারতে ?"

"আমাকে ত ঘরে ঢুকতে দিতেই চায় না, মেজদা। নার্স বটে, তবে ওঁর নার্স হয়ে আসেনি ত ?"

"তা নাই এল। ওর ত আমার পিছনে বেশী খাটতে হচ্ছিল না, বসেই ছিল প্রায়। একজন মানুষ অত কষ্ট পাচ্ছে, দেখে যাবে না? তাও মেজমামার মত মানুষ, যিনি নাকি সকলের জন্যে সব করতে প্রস্তুত।"

"সাধে কি আর বলি মেজদার কপাল ভাল? তুমি হেন চীজ, তুমিও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ," গলাটা এবার তাহাদের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া প্রথমে বিনতার রাগ হইল, কি ফাজিল ছেলে, সত্যই। তাহার পর ভাবিল তাহার যাচিয়া সেবা করিতে যাওয়ার এইরূপ অর্থ মানুষে করিলেও করিতে পারে। অন্য কত জায়গায় সে কাজ করিয়াছে, কিন্তু যাহা নির্দিষ্ট কাজ, তাহার বেশী করে নাই। কিন্তু কোথায় বা সে নিজে পাওনার বেশী পাইয়াছে? এখানেও ত দেনা-পাওনা সমানই যাইতেছে না? সে পাইতেছে বেশী, দিবার ইচ্ছাও তাহার বেশী। যাহা পাইতেছে তাহারও বেশী কি? চিন্তার ধারাটা সে জোর করিয়া অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইল।

দুপুর বেলা খানিকক্ষণ ঘুমাইল। অবশ্য যতক্ষণ ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল তাহা পারিল না। মনটা ছটফট করিতে লাগিল। বীরেন ঠিকমত পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছে কিনা কে জানে? দায়িত্ব জ্ঞান ঠিকমত আছে কি? ঘড়ি দেখিল প্রায় তিনটা। এখনও ঘণ্টাখানিক তাহার ছুটি আছে। কি করিয়া কাটান যায়? বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মন ভাল করিয়া লাগিল না।

অবশেষে চারটা বাজিবার জোগাড় করিল। বিনতা উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া লইল। চা তৈরি হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য খাইবার ঘরে গেল। গোলক চা করিতেছে। চা ও খানকতক বিস্কুট লইয়া হরেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকিল। বীরেন নাই, হরেন্দ্র একলাই শুইয়া বই পড়িতেছেন।

চায়ের ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "বীরেনবাবু এরই মধ্যে চলে গেছেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনিচ্ছুক মানুষকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে ভাল লাগে না। তাই আধঘণ্টা আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তুমি চা খেয়েছ?

"না খাইনি। আমারটাও নিয়ে আসছি।" বলিয়া বাহির হইয়া গিয়া একটা পেয়ালা লইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন এখন? জ্বর কি উঠেছে? মাথা কেমন আছে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "জ্বর সামান্য একটু আছে। মাথাটা ত ভালই behave করছে এখনও পর্য্যন্ত। স্বর্ণ বেরিয়ে গেছে বোধহয়?"

বিনতা বলিল, "কোথায় গেল?"

"একটু আগে আবেদন পাঠিয়েছিল তার ঝিকে দিয়ে। সে তার পিস্‌শাশুড়ীর বাড়ী যেতে চায়, রাত্রে আসবে। একলা ঝি তার গল্প করার স্পৃহা মিটতে পারছে না বোধহয়। যেতেই বল্‌লাম। গাড়ী তাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরল কিনা, সেটার খবর নিও খানিক পরে। চা-টা ঢাল। তোমারও কি বিস্কুটেই খিদে যাবে?"

বিনতা বলিল, "বিকেলে আমি চিরকাল শুধু চা খাই। এখানে আপনি জেদ করেন বলে, কিছু খেতে হয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিতান্ত আর দুজন প্রাণী তোমার উপর নির্ভর করে আছেন তাই, না হলে চাক্‌রী-বাকরীর তোমার দরকার হত না। দিব্যি পিসীমার বাড়ী না খেয়ে বসে থাকতে। আচ্ছা, একটা কথা জানতে চাই। তুমি বিধবার মত বেশ কর কেন?"

মিনিট খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বিনতা বলিল, "দেখলাম এই বেশটা একটু আড়ালের কাজ করে। মানুষে বেশী নজর দেয় না।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "নজর দেওয়ার উৎপাতও ঘটেছে তা হলে?"

বিনতা বলিল, "কিছু কিছু এ উৎপাত সকলকেই সহ্য করতে হয়। "যিনি আমায় কাজ দেন, সেই মিসেস্ রক্ষিত আমায় প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ভয় না পেতে, বেশী upset না হতে।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "বিধবা সেজে বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে?"

"খুব না হোক, কিছু হয়েছে। একটু যেন দৃষ্টিপাতের অযোগ্য ভাবে মানুষরা।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "ভাল। স্বজাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কিছু বাড়ছে না। আচ্ছা, এইবার চায়ের বাসনগুলো সরিয়ে রেখে এস। যদিও বেজেছে মোটে সাড়ে চারটা, তবু মেঘের কল্যাণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একবার ইচ্ছা করছে আলো জ্বালতে, আবার এই বাদল অন্ধকারটা উপভোগ করতেও ইচ্ছা করছে। একটা গান শুনিয়ে দেবে?"

"আপনি শুনতে চাইলেই গাইতে পারি। কি গান গাইব?"

বালিশে ঠেশ দিয়া একটুখানি উঠিয়া বসিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেদিন "এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে," গেয়েছিলে। গানটা অপরূপ, তুমি গেয়েও ছিলে অতি সুন্দর করে। কিন্তু ও গান আজ শুনতে চাই না। তুমি মীরাবাইএর গান-টান কিছু গাও আগে। তারপর বাংলা গান শুনব। সর্ব্বশেষের জন্যেই মিষ্টি জিনিষ রাখতে হয়।"

বিনতা প্রথমে গুনগুন করিয়া, পরে একটু গলা চড়াইয়া গাহিল,

"মেরে জনম মরণকে সাথী,
ক্ষণে নহী বিসরু দিন রাতি।
তুম্ দেখ্যা বিন কলন পড়ত হৃয়, জানত মেরী ছাতী।
উঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্থ নিহারু, রোয়্ রোয়্ আঁখিয়াঁ রাতী"

চোখের উপর হাত চাপা দিয়া হরেন্দ্রনাথ গান শুনিতেছিলেন। হঠাৎ হাত সরাইয়া বলিলেন, "মানেটা জান নিশ্চয়ই?"

"জানি"।

"একটু বল ত।"

বিনতা বলিল, "হে আমার জনম মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিন রাত্রিতে কখনও বিস্মৃত না হই। তোমার দর্শন বিনা শান্তিলাভ হয় না, আমার অন্তর ইহা জানে। উচ্চে উঠিয়া আমি তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছি। ক্রন্দন করিয়া করিয়া আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "এ মানে কোথায় পেলে?"

বিনতা বলিল, "বাবার কাছে একখানি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ছিল, তাতেই এ ব্যাখ্যা ছিল। বাবা গানের কথার সঙ্গে এগুলিও মুখস্থ করিয়েছিলেন।"

হরেন্দ্রনাথ মিনিট দুই চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "গানটাই তোমার যথাযোগ্য career হত, কিন্তু বড় যে সময় লাগবে। খুব যদি আধুনিকা হতে, তাহলে বলতাম play back singer হও, তাতে পয়সাও ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ তোমার ভাল লাগত না।"

বিনতা বলিল, "ভাল সত্যিই লাগত না। গান গাই প্রাণের শান্তির জন্যে। কিন্তু পয়সার খাতিরে সারাক্ষণ যে যা গাইতে বলবে তাই গাইব, এ হয়ত ভাল লাগত না।"

এমন সময় হরেন্দ্রনাথের দুই বন্ধু তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলকের সাহায্যে ঘরে আরো গোটা দুই তিন চেয়ার আনাইয়া দিয়া বিনতা প্রস্থান করিল।

সে রাত্রে হরেন্দ্র ভালই ঘুমাইলেন। পরদিন সকালে দেখা গেল, তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

৬

সকাল হইতেই বিনতাকে ডাকিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার ব্যবহার করা সব কিছু ধোপারবাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

বিনতা বলিল, "আজকের দিনটা না দেখেই?"

"কতকগুলো ত দিয়ে দাও। আর নিজের কাপড়-চোপড় সব Dettol দিয়ে কেচে নাও। আবার ত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করবে।"

"আচ্ছা, তা দিচ্ছি। ডিস্‌পেন্‌সারির কাউকে কিছু খবর দিতে হবে?"

"বীরেনটাকে একবার ডেকে দিও। আর দেখ নিজে খুব ভাল করে বিশ্রাম কর। কিছুতে যেন অসুখ না করে।

বিনতা বলিল, "আমার হাড় শক্ত হয়ে গেছে। রাত জাগা নূতন নয় আমার কাছে, infection সম্বন্ধেও আমার একটু immunity হয়ে গেছে। আমার কোনো অসুখ করবে না।"

"অত বড়াই আগেই কোরো না, দেখ দু চার দিন।"

সেদিনটা ভালই গেল। কোনো অসুখ কাহারও করিল না। দুপুরে নিরুপদ্রবে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া লইল বিনতা। মধ্যে মধ্যে গিয়া হরেন্দ্রনাথের খোঁজ লইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারও শারীরিক কোন কষ্ট আছে বলিয়া বোধ হইল না।

দু একদিনের ভিতরই হরেন্দ্রনাথ উঠিয়া পড়িলেন। যেদিন অন্নপথ্য করিলেন, সেইদিনই খাবার টেবিলে বসিয়া বলিলেন, "নিজে ত সারলাম, এখন রুগীগুলির আমার কি দশা হয়েছে, দেখতে হয়। ক'টা মরল কে জানে? তাদের দেখার ভার অবশ্য আর একজন ডাক্তারের হাতে দিয়েছিলাম, তবে তিনি কতদূর কি করতে পেরেছেন জানি না।"

স্বর্ণ বলিল, "এখনই আবার ছুটোছুটি করবে? দুর্ব্বল লাগে না?"

"লাগছে খানিকটা। খুব ছুটোছুটি এখনই করতে পারব না। তবে সকালের দিকে একবার করে বেরতে হবে। কয়েক দিন এখন এই রকম চলুক। তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে যেতে হবে আমার পুরনো রুটিনে। বিনতা এবার পড়াশোনাটা আরম্ভ কর।"

স্বর্ণ বলিল, "সময় কোথায় পাবে? আমার ঝি ঠাকুরুণ ত আবার চললেন। তাঁর মেয়ের অসুখ করেছে।"

বিনতা বলিল, "তোমার কাজ আর কতটুকু? ওরই মধ্যে ঢের সময় করতে পারব আমি।"

স্বর্ণর তখন চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল, সে উঠিয়া গেল। বিনতাও উঠিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার এখনই কোন কাজ আছে?"

বিনতা বলিল, "এখনই কাজ কিছু নেই।"

"তাহলে বোসো এখানে একটু। তোমার সঙ্গে খানিক আলোচনা দরকার।"

বিনতা বসিল। হরেন্দ্র বলিলেন, "মেয়েদের অনেক রকম career ত আছে আজকাল, কিন্তু চিরকালের carrerটার বিষয় কি ভেবেছ তুমি?"

বিনতা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কিসের কথা বলছেন আপনি?"

"এই ঘর-সংসার করা। যা সব মেয়েই করে আমাদের দেশে।"

বিনতা বলিল, "তা ত আমার আর হওয়া সম্ভব নয়, আপনি ত জানেন আমার ইতিহাস, আমাদের দেশাচারও জানেন।"

"জানি সবই। গ্রামে ফিরে গিয়ে বিয়ে কর যাকে হোক একটা, এ আমি বলছি না। সম্ভব সেটা হয়ত নয়। কিন্তু ধর এমন ছেলে যদি পাওয়া যায়, যার এসব কুসংস্কার নেই, রাষ্ট্রীয় আইনে সে তোমাকে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। কলকাতাই থাকবে তোমরা, পল্লীসমাজ নিয়ে ভাবতে হবে না। অবশ্য খুব উদার হৃদয়, সচ্চরিত্র ছেলে হওয়া দরকার, যে তোমার পূর্ব ইতিহাসের কথা জীবনে আর তুলবে না। এ রকম যদি পাওয়া যায়, ত কি বল তুমি?"

বিনতা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেখুন এ বিষয়ে কারো সঙ্গে কখনও কথা বলিনি আমি, বলবার কেউ ছিলও না। আজ আপনাকে বলছি। আপনি আমার অনাত্মীয় এ ভেবে সঙ্কোচ আমি করব না। নিকটতম আত্মীয়কে যে ভাবে বলতাম, সেই ভাবেই বলছি। গ্রাম থেকে যখন পালিয়ে আসি, তখন স্থিরই করেছিলাম, বিয়ে আমি আর করব না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোককে কেউ পুরোপুরি মানুষ ভাবে না, মানুষের মত ব্যবহারও করে না, তাদের সঙ্গে। আর আমার পাশা খেলার গুটি হবার ইচ্ছা ছিল না। তবে সেটা অত্যন্ত আঘাত খাওয়ার একটা প্রতিক্রিয়া। ক্রমে সে জ্বালাটা জুড়িয়ে এল, মন আর মতের কিছু পরিবর্তন হল। আমি মানুষ ত সমাজ আমাকে যাই ভাবুক। তাই সাধারণ মেয়ের মত ঘর-সংসার করার ইচ্ছাও যে কখনও হয়নি তা বলতে পারি না। তবে এক বিষয়ে মত আমার স্থিরই রইল।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি বিষয়ে?"

মাথা নীচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বিনতা বলিল, "নিজের ভরণপোষণের জন্য বিয়ে আমি করব না। এমন কাউকে বিয়ে আমি করব না, যাঁকে আমি ভাল করে না চিনি। শুধু আমার জন্যেই আমাকে নিতে চায় এমন মানুষ যদি কেউ থাকেন তাহলে আমি ভেবে দেখতে পারি। তাও যদি তাঁর প্রতি আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস থাকে। বিয়ের পর আমি হঠাৎ আবিষ্কার করতে চাই না যে আমি নিদারুণ ভুল করেছি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার সংকল্পের বিরুদ্ধে কিছু আমি বলতে চাই না, এইটাই হওয়া উচিত।

তবে এরকম ছেলে পেতে হলে তোমার পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা দরকার। আর সকল দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র অন্য লোকে খুঁজে দিতে পারে, কিন্তু তুমি কাকে ভালবাসতে পারবে, সে তুমি ছাড়া কে বুঝবে? যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে কয়েকজন মানুষের সঙ্গে আমি তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। মানুষগুলি সচ্চরিত্র এবং পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম নিশ্চয় হবে, এই অবধি আমি বলতে পারি। বাকিটা, তোমার নিজের পরখ করে নিতে হবে। আমি বলছি না যে তুমি এখন থেকে কাজকর্ম পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খালি এই এক চিন্তা নিয়ে থাক। তুমি যা করছ সবই কর, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এই দিককার সম্ভাবনাটাও ভাব। কেমন রাজী আছ?"

বিনতা বলিল, "আপনার কথায় রাজী আমি হবই, যা আপনি করতে বলেন। আমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী এবং কল্যাণ করতে সক্ষম, পৃথিবীতে আর কেউই নেই। আপনি আমার জন্যে যা ব্যবস্থা করবেন তাতে আমার অমঙ্গল কখনও হবে না।"

হরেন্দ্রনাথ একটু বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, "অতখানি বিশ্বাস কাউকে কি করা যায় বিনতা? মানুষ চেষ্টাই করতে পারে অন্যের কল্যাণের জন্যে, কিন্তু ফলাফল ত ভগবানের হাতে? যাই হোক, চেষ্টাটা ত করব। আর দেখ, আর একটা কথা।"

বিনতা বলিল, "বলুন।"

তুমি এই বিধবা সেজে বেড়ানটা ছাড়। ধরেছিলে যখন প্রথম তখন নজর এড়াবার জন্যেই ধরেছিলে। এখন যে নজরটাই পড়া দরকার তোমার উপর? ভাবী বধূকে কেউ এরকম সজ্জায় দেখতে চায় না। চেহারাটা ত তোমার ভালই, সেটার স্বাভাবিক শ্রী অবলুপ্ত করার অমন প্রবল চেষ্টা নাই বা করলে?"

বিনতা বলিল, "সে ত অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার, এখনি করা শক্ত। তা ছাড়া লজ্জাও করবে।"

লজ্জার কথা ছেড়ে দাও, তুমি ত অন্যায় কিছু করছ না? আর অর্থ যা লাগে তা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এতে কিছু সঙ্কোচ কোরো না। আমাকে অনাত্মীয় তুমি ভাব না, সেই রকম করেই এটা নাও, যেন বড় ভাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছ। তাতেও তোমার খারাপ লাগে ত ঋণ বলেই নাও। যখন পারবে তখন ফেরৎ দেবে।"

বিনতা বলিল, "তাই দেব।"

টেলিফোনে ডাক আসাতে, হরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন। বিনতা কিছুক্ষণ খাইবার ঘরেই বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পড়াশুনা তখন করা চলিত, কিন্তু কিছু করিতে ইচ্ছা করিল না। বই নাড়িয়া-চাড়িয়া সরাইয়া রাখিল। অনেকক্ষণ শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিল, তাহার পর কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। জাগিল যখন তখন প্রায় চা খাওয়ার সময় হইয়া গিয়াছে।

খাইবার ঘরে আসিয়া দেখিল, সকলেই উপস্থিত, এমন কি ছুটির দিন বলিয়া রমেশও হাজির। স্বর্ণ বলিল, "অন্যদিন সবার আগে বিনতাদিই আসে ব্যবস্থা করতে, আজ সেই সব শেষে এল। এরকম করে ত কখনও ঘুমোও না তুমি? শরীর টরির খারাপ ত করেনি?"

"না শরীর খারাপ করেনি, অনেকদিন ঘুম কম হয়েছিল, আজ তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কেন কাজ ছিল নাকি কিছু?"

"না কাজ কিছু ছিল না। আমার ত ভারি কাজ। কতদিন পরে দেখ বিকেলটা পরিষ্কার

হয়েছে আজ। ইচ্ছে করছে কোথাও বেড়িয়ে আসি, বা একটা সিনেমা দেখে আসি। কিন্তু কেই বা নিয়ে যাবে? আমি ত শহুরে মেয়েদের মত সব জায়গায় হুট হুট করে একলা ঘুরতে পারি না?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনতা যাবে?"

বিনতা বলিল, "সিনেমা দেখতে ত ইচ্ছা করছে না, তবে বেড়াতে গেলে যেতে পারি। খোলা হাওয়া লাগানোও মাঝে মাঝে দরকার।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "তাহলে চল সকলে মিলে একবার ময়দানেই ঘুরে আসা যাক। হাঁটাটা স্বর্ণর খুবই দরকার। রমেশ যাবি?"

রমেশ বলিল, "তোমরা যে আজ বেরবে, তা ত জানা ছিল না? আর একটা appointment করে ফেলেছি যে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা তবে যে যে যাবে, সে সে ready হও। আমিও আসছি একটু ঘর থেকে, বলিয়া উঠিয়া গেলেন।"

স্বর্ণ অবশ্য রঙীন শাড়ী, গহনা পরিয়া রীতিমত সাজিয়া আসিল। বিনতার চুল বাঁধা ছাড়া আর কিছু করিবার ছিল না। হরেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "তোমার বাজার হাট কি করতে হবে বিনতা, তাড়াতাড়ি করে নাও। স্বর্ণকে নিয়ে এরপর তোমাকে প্রায়ই বেরতে হবে। তখন এরকম উষা সন্ধ্যা সেজে বেরলে চলবে না। একরকম কাপড়-চোপড়ই পরতে হবে।"

স্বর্ণ বলিল, "সত্যি মেজমামা, কি যে মেয়ের জেদ, ভূত সেজে সে বেড়াবেই। এই ত বয়েস, লজ্জাও করে না। এখনই না হয় বিয়ে হয়নি, কিন্তু হবে ত একদিন, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে? এই রকম কি করতে আছে? ভাবী স্বামীরও অমঙ্গল হয় এতে।"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "নাও, স্বর্ণ শিরোমণি কি বিধান দিচ্ছেন শোন। কোন হতভাগার পরমায়ু ক্ষয় করছ কে জানে?"

বিনতা বলিল, "বদ্‌লেই ত ফেলছি সাজপোষাক।"

ময়দানে খানিক বেড়ান হইল। স্বর্ণেরই বেড়ান সবচেয়ে প্রয়োজন, কিন্তু হাঁটিতে সবচেয়ে অনিচ্ছুকও সেই। এতবার তাহার বসিবার প্রয়োজন হইল যে তাহার মেজমামার শেষে বিরক্তিই ধরিয়া গেল। বলিলেন, "থাক আজ আর দরকার নেই, নিজেকে খুব বেশী শ্রান্ত করে ফেলা ঠিক নয়। বিনতা কোনো দোকানে যেতে চাও?"

বিনতা বলিল, "সময় ত রয়েছে ঢের, গেলেও হয়।"

তাহারা ফিরিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হরেন্দ্রনাথ একটা বড় দোকানে ঢুকিলেন, এবং প্রায় জোর করিয়াই খান দশ শাড়ী ও কয়েকটা জামার কাপড় কিনিয়া বসিলেন। এতগুলি জিনিষ এবং এত দামী জিনিষ কিনিবার ইচ্ছা বিনতার ছিল না, কিন্তু হরেন্দ্রনাথের উপর কথা কহিতে পারিল না।

আবার গাড়ীতে উঠিয়াই স্বর্ণ বলিল, "কি সুন্দর সুন্দর শাড়ী ভাই, দেখলেই দোকান শুদ্ধ কিনে নিতে ইচ্ছে করে। আসুক ও, এই পাঁচ ছ'দিন পরেই ত আসছে, চারখানা শাড়ী অন্ততঃ না নিয়ে আমি ছাড়ছি না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দোকানে থাকতে বললে না কেন? চারখানা শাড়ী কি আর মামা তোমাকে কিনে দিতে পারত না?"

"আহা, আমি কি পাগল নাকি? একে ত খাওয়া-দাওয়া, ডাক্তার, নার্স, ঝি, কোন খরচটা আর আমার জন্যে না হচ্ছে? এর উপর আবার শাড়ী কিনি। কেন ও দেবে না কেন? বেশ আরাম করছে বাড়ী বসে, আমার জন্যে ওকে করতে হচ্ছে বা কি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ, compound interest শুদ্ধ সব আদায় করে নিও। ফাঁকি দেবে কেন?"

বাড়ী আসিয়া বিনতা শাড়ী জামার বোঝা লইয়া একবার নিজের ঘরে ঢুকিল। তাহার ঘরেও এখন ড্রয়ার সহ ড্রেসিং টেবিল আসিয়াছে। শাড়ীগুলি তাহার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিয়া ভাবিল, "কোথায় থেকে কোথায় যে ভেসে যাচ্ছি জানি না। নিজে কোনো দিনই হয়ত এসব আবার পরতাম না, কিন্তু ওঁর কথা অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই।"

সকালে উঠিয়া নরুন পাড় ধুতি আর সে পরিল না। নক্সাকাটা লাল পাড়ের শাড়ী পরিয়াই বাহির হইল। স্বর্ণ একেবারে হাততালি দিয়া উঠিল, "দেখ মেজমামা, চেহারা ওর একেবারে বদলে গেছে না? বয়সও যেন কমে গেছে।"

মেজমামা বলিলেন, "বয়েসটা ওঁর আসলে কমই। ভারিক্কী হবার জন্যে বাড়িয়ে বেশী বলেন।"

বিনতা হাসিয়া বলিল, "মোটেই তা নয় যদিও। বাড়ীতে যখন ছিলাম, তখন মা জেদ করতেন, চার বছর বয়েস কমিয়ে বলার জন্যে। যখন আমার আঠারো বছর বয়স তখন চোদ্দ বছর বলা হত। দেখতে আমি ঠিক আঠারো বছরের মতই ছিলাম, কাজেই কিসের জন্যে যে বলা হত জানি না।"

স্বর্ণ বলিল, "ও বাপু বলতে হয় পাড়াগাঁয়ে। আমার ত প্রায় কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বলা হত তখন ষোলো।"

চায়ের টেবিল ছাড়িয়া অতঃপর যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। হরেন্দ্রনাথ আজ কাজে বাহির হইলেন একবার। যাইবার সময় বিনতাকে বলিয়া গেলেন, "আজ আমার এক ডাক্তারবন্ধু হয়ত চা খেতে আসবেন, জোগাড় রেখো। আর দেখ একটা লোক আসবে আন্দাজ দশটার সময় কিছু সোনার জিনিষ নিয়ে। তার কাছ থেকে বালা হোক, চুড়ি হোক, কিছু একটা নিও নিশ্চয়। দাম বেশী কি কম, সে সব তুমি ভাবতে যেয়ো না। আমিই ওদের বাড়ীর ডাক্তার, কাজেই টাকার ব্যবস্থা সেই সূত্রেই হয়ে যাবে।"

বিনতা বলিল, "কাজ করতে এসে আমি যে এক উৎপাত হয়ে দাঁড়ালাম আপনার পক্ষে। আমার ভারি লজ্জা করছে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উৎপাত আবার কি? তুমি ত টাকা ধার নিচ্ছ। আর কাজ করতে এসেছিলে সেটা নাইবা ভাবলে? রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়তা ছাড়াও অন্য আর একরকম আত্মীয়তা আছে ত সংসারে? বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলে একটা জিনিষ আছে যা রক্ত সম্পর্কের কাছাকাছিই যায়। একজন আর একজনের জন্যে অনেক কিছু করতে পারে এ ক্ষেত্রে। এতে লজ্জার কিছু ত নেই? এই যে এত করে সেবা করলে আমার, এতে ত লজ্জাবোধ করলাম না আমি? এটা ত তুমি বন্ধুত্বের দিক দিয়েই করেছিলে, পয়সার জন্যে করোনি? পয়সা দিতে গেলে নেবে?"

বিনতা বলিল, "তা কখনও আমি নিতে পারি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তবে আমার কাজটাও এইদিক দিয়েই বিচার কোরো। আচ্ছা চলি এখন। যথাসম্ভব শীগ্‌গিরই ফিরে আসব।"

বিনতা নিজের দিনের কাজের দিকে মন দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মনটা তাহার বড়ই বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। কোনো কাজে যেন রস পাইল না। জীবনের ধারা তাহার এক খাতে বহিতেছিল, কে যেন মাঝপথে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া স্রোতটাকে ভিন্নমুখী করিয়া দিল। ইহাতে তাহার কল্যাণ হইবে না অকল্যাণ হইবে? সে বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহার এতবড় হিতাকাঙ্ক্ষী উপকারী মানুষ আর আছেই বা কে? তিনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা না করিয়া সে পারে কি?

গহনা লইয়া লোক যথাকালেই উপস্থিত হইল। স্বর্ণ ত মহা খুসি অমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিয়া। এত সুন্দর জিনিষ থাকিতে বিনতা যে কেন দুগাছি প্লেন্ রুলী পছন্দ করিল, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। যাহা হউক, সেই দুগাছিই পরাইয়া বিনতার হাত দুখানা অনেকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। বলিল, "কি সুন্দর হাত ভাই তোমার? এত খাট তবু কিরকম নরম।"

হরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন দশটার পরে। বিনতার অলঙ্কার পরা হাত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না।

চা খাইবার সময় হরেন্দ্রনাথের এক ডাক্তার বন্ধু, ডাক্তার অমূল্য গুহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়সে হরেন্দ্রের অপেক্ষা কিছু ছোট মনে হয়। চলনসই চেহারা, সুশ্রীও নয়, কুৎসিতও নয়। কথাবার্ত্তা ভালই বলেন। বিনতা বুঝিতে পারিল না যে ইনি কি সূত্রে আসিয়াছেন। বিনতার সঙ্গে আলাপ করাইবার জন্যই কি ইঁহাকে আনা হইয়াছে, না অন্য কারণে আসিয়াছেন? বোঝা গেল না ঠিক।

যাহা হউক, সে সকলকে চা জলখাবার পরিবেশন করিল, কথাবার্ত্তাও বলিল। স্বর্ণ একবার আসিয়া বসিল বটে, তবে কিছু পরেই উঠিয়া পলায়ন করিল। হরেন্দ্রনাথ আর বিনতা বসিয়া অতিথির সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। রমেশ সন্ধ্যার দিকে একবার আসিল, চা খাইতেও বসিল। ডাক্তার গুহকে চিনিত আগে বোধহয়, দুচারটা কথাবার্ত্তা বলিল। দৃষ্টিটা কিন্তু তাহার সুসজ্জিতা বিনতার দিকেই আটকাইয়া রহিল। হরেন্দ্রনাথ সেটা লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া শেষে অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

অতিথি চলিয়া গেলে স্বর্ণ আবার আসিয়া বসিল। বলিল, "তোমাদের সবই সাহেবীয়ানা বাপু। দেশে গ্রামে অমন হট্ করে লোককে অন্দরমহলে আনে না, বাইরে বসায়, সেইখানেই খেতে দেয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার আবার সদর অন্দর কি? আইবুড়ো লোকের বাড়ী।"

স্বর্ণ বলিল, তা হলই না হয়, মেয়েছেলে এখন রয়েছে ত দুজন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। এখানে অত পর্দ্দা কেউ মানে না। এই যে এত সিনেমার ভক্ত, সেখানে কি ঘোমটা দিয়ে আলাদা জায়গায় বোস?"

"আহা, সে হল, সব অচেনা, তাদের কে ধরছে? আচ্ছা মেজমামা, যাবে একবার সিনেমায় নিয়ে? তুমি ত বিকেলে এখন ক'দিন কাজে বেরবে না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যেতে পারি, সবাই যদি যায়। কাল যাব না হয়। রমেশ কাল আর সন্ধ্যায় কোনো appointment কোরো না।"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে আজই টিকিট কিনে রেখে দেব। কি ছবি দেখবে? বাংলা, ইংরিজি, না হিন্দী?"

স্বর্ণ বলিল, "ইংরিজি ত এক অক্ষর জানি না, হিন্দিও জানি না ভাল। বাংলাই দেখব। বেশ নাচ গান আছে এমন ছবি।"

"তোমায় দেখতে নিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন তোমার পছন্দমত ছবিই বাছব।"

সেদিন চায়ের পরবর্ত্তী সভা আর বেশীক্ষণ বসিল না। গৃহস্বামী তাঁহার নীচের ঘরে একজন রোগী দেখিতে গেলেন। স্বর্ণ ছাদে উঠিল বেড়াইবার জন্য, রমেশ প্রস্থান করিল। বিনতা খানিকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া বই পড়িবার চেষ্টা করিল, ভাল লাগিল না, সেও তখন স্বর্ণের অনুসরণে উপরে উঠিয়া গেল। মোতী তখনও বাড়ী যায় নাই, রাত্রে যাইবে তাহার সঙ্গে স্বর্ণের একটা কি গভীর আলোচনা চলিতেছিল। একলা একলা খানিকক্ষণ বেড়াইয়া বিনতা নীচে নামিয়া গেল। দোতলায় মানুষজন কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। সব ঘরই অন্ধকার। পড়াশুনা করিবার আবার চেষ্টা করিল, পারিল না। মনের অস্বাভাবিক ভারাক্রান্ত অবস্থায় নিজেই অবাক হইয়া গেল। তাহার ভিতর যেন দুইজন নারী বাস করিতেছে। একজন বুদ্ধি দিয়া সব বোঝে, সেই ভাবেই নিজের জীবনকে চালিত করিতে চায়, অন্যজন কিছু বোঝে না, তাহাকে সম্পূর্ণ অবোধ্য এক শক্তি তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়।

পরদিন সকাল হইতেই স্বর্ণ সিনেমার ভাবনা ভাবিতে বসিয়া গেল। কি পরিয়া সে যাইবে? গল্পটা কি রকম? কে কে যাইবে? কখন প্রস্তুত হইতে হইবে? মেজমামা টিকিট করিয়াছেন কি না? সন্ধ্যা হইতে তাহার যেন আর তর সহে না।

তাহার তাড়ায় সকলেই যথা সময়ের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইল, এবং বাহির হইয়াও পড়িল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ কেমন লাগে। তোমার গান শুনবার আগ্রহে "তানসেনে"র টিকিটই কিনলাম। হিন্দিটা সহজ, আর গল্পও তুমি খানিক খানিক শুনেই নিয়েছ। বিনতারও ভাল লাগবে, যা গানের ভক্ত তুমি। এসেই পড়েছি যখন তখন যথাস্থানে গিয়েই বসা যাক্।"

উপরে উঠিবার আগেই একজন যুবক আসিয়া হরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিল। তিনি বলিলেন, ঠিক সময়েই এসেছেন, উপরে উঠে গেলে খোঁজ পেতে দেরি হত, অন্ধকারের মধ্যে। বিনতা, ইনি আমার এক বন্ধু মৃগাঙ্ক দত্ত।"

বিনতা নমস্কার করিল, যুবকটি প্রতিনমস্কার করিল, তবে তাহার চোখের দৃষ্টিতে সামান্য যেন একটু বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল। বিনতা বুঝিল, এই সেই ছেলে যে স্বপ্নার দেখার দিন বরের সঙ্গে গিয়াছিল। তাহার মামার বাড়ীর দেশের ছেলে। সেদিন বিধবার বেশে তাহাকে দেখিয়াছিল, আজ এত সুসজ্জিতা দেখিয়া অবাক হইতেছে বোধ হয়।

উপরে গিয়া সকলে নিজ নিজ আসন অধিকার করিল। হরেন্দ্রনাথের পাশে বিনতা, তাহার পাশে স্বর্ণ, স্বর্ণের পাশে রমেশ। সর্ব্বশেষে মৃগাঙ্ক। বিনতা বুঝিল মৃগাঙ্ক হরেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণেই আসিয়াছে। পীড়িত চিত্তে ভাবিল আমি ভদ্রলোকের গলায় যেন কাঁটার মত আটকাইয়া গিয়াছি। কোনোমতে কাহারও ঘাড়ে গছাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচেন। কিন্তু ছি, ছি, এমন অকৃতজ্ঞ আমার হওয়া উচিত নয়। উঁহার ত কোনো দায় ছিল না, আমাকে এমনিই বিদায় করিয়া দেওয়া যাইত। আমার কল্যাণ কামনা করেন বলিয়াই তাঁহার এ চেষ্টা। কিন্তু এ চেষ্টায় কোনো ফল হইবে কি?

ছবি সকলের ভালই লাগিল। স্বর্ণ আহা উহু করিল বিস্তর, স্থানে স্থানে তাহার চোখে জল আসিয়াই গেল। হরেন্দ্রনাথ বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেমন লাগছে বিনতা? গানগুলো শিখে নিতে পারবে, একবার শুনে? তানসেনকে জীবনদান করার জন্যে মেয়েটির গানটা ভারি সুন্দর। ওরকম গান শুনলে মরতে মরতে বেঁচে ওঠাও সম্ভব বোধহয়।"

বিনতা বলিল, "লাগছে ত খুব ভাল। তবে একবার শুনে কি আর শিখতে পারব?"

বাহির হইয়া মৃগাঙ্ক সকলকে নমস্কার করিয়া ও রমেশের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। বিনতারা বাড়ী ফিরিল। স্বর্ণ সারাপথ বক্‌বক্ করিল। রমেশ দুচারবার বিদ্রূপ করিবার চেষ্টা করিল, বিশেষ সফলকাম হইল না।

স্বর্ণ উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "কি চমৎকার ভাই! দেখে কেঁদে আর বাঁচি না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সুন্দর জিনিষ দেখলে কি তোমার কান্না পায় স্বর্ণ?"

"তা পায় মাঝে মাঝে। খুব খুসি হলেও মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলি।"

"তা হলে তোমার চোখের জলের মানে বোঝা সহজ নয় দেখছি।"

স্বর্ণ বলিল, "কারই বা সহজ?"

৭

মোতী ঝি চলিয়া গেলে দিন দুই বিনতার কাজ বাড়িল। স্বর্ণ কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না, সারাদিনই তাহার গল্প শুনিতে হয়। আজকাল কেন কে জানে বিনতার বড় অধৈর্য্য লাগে। কেন এ মেয়েটি এমন অনর্গল বকিয়া মরে? অথচ ইহার পরিচর্য্যা করিবার জন্যই বিনতাকে আনা হইয়াছিল। সেকথা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। সে ঘর সংসার দেখে, হরেন্দ্রনাথের বন্ধু-বান্ধব আসিলে তাহাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করে, আলাপ করে, এবং স্বর্ণের দেখাশোনা করে এবং তাহার বরের গল্প শোনে।

হরেন্দ্রনাথ কাজ করিবার সময় বাড়াইয়াছেন, তবে পুরাদস্তর কাজ এখনও করিতেছেন না। অনেক সময় বাড়ী থাকেন। বৈকালিক চায়ের আসরে বন্ধু-বান্ধবের আগমন প্রায়ই হয়। ডাক্তার অমূল্য গুহ প্রায় আসেন, মৃগাঙ্ককেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। আর একটি ছেলে আসে সে বাঙালী নয়, কিন্তু বাংলাদেশে থাকিয়া থাকিয়া বাঙালী হইয়া গিয়াছে। নাম বিমানবিহারী। চেহারাটা বেশ সুশ্রী।

বিনতার সহিত আলাপ-পরিচয় সকলেরই খানিকটা হইয়াছিল। তাহার ইতিহাস ইহারা সকলেই জানে হয়ত। কথাবার্ত্তায় কিছু বোঝা যায় না। মৃগাঙ্কের সবই জানার কথা, সেও কিছু ধরা ছোঁওয়া দেয় না। কি সূত্রে যে হরেন্দ্রনাথের গৃহে এমনভাবে বিনতা আছে তাহা কেহ কি জানে? না বলিয়া দিলে কাহারও ত বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। সে যেন এবাড়ীর কর্ত্তার ভগিনী কি অন্য কোনো স্নেহাস্পদা আত্মীয়া। সেই ভাবেই সকলে ব্যবহার করে তাহার সঙ্গে। রমেশ ইহা লইয়া সারাক্ষণ মন্তব্য করে স্বর্ণের কাছে। অবশ্য মেজদা বা বিনতা যাহাতে শুনিতে না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

স্বর্ণ সোজাসুজি মানুষ, সে একদিন বলিয়া বসিল, "তোমার অত হিংসে কেন বাপু? বিনতাদি কি তোমার ভাগটা কেড়ে নিচ্ছে? মেজমামা ত সংসারি নয়, টাকাও আছে ঢের। যদি অনাথা মেয়ের জন্যে কিছু করেনই তা তোমার বুকে কাঁটা ফোটে কেন?

"অনাথাকে সনাথা করার যে রকম চেষ্টা করছেন, তাতে মনে হচ্ছে, শানাই বাজল প্রায় বাড়ীতে।"

স্বর্ণ বলিল, "তা বাজুক না। ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি আর কি? ভাবছি ঘরে ঘরেই না হয়ে যায়।"

স্বর্ণ তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "কি যে বক তুমি রমেশ মামা তার ঠিক নেই। মেজমামার যদি বিয়েতেই মন থাকবে তা হলে এতদিন তিনি বসে আছেন? ওঁর মত সুপাত্র, চাইলে ত রাজকন্যা বিয়ে করতে পারতেন।"

"খেয়াল হয়নি তখন, এখন হয়ত হচ্ছে। সুন্দরী মেয়ে যদি সারাক্ষণ চোখের সামনে ঘুরঘুর করে, আর দরকার হলেই গান শোনায় আর গায়ে মাথায় হাত বুলোয়, তাহলে মন সেদিকে না গিয়ে পারে পুরুষ মানুষের? যতই শুকদেব গোস্বামী হোক। দেখ এখন গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে।"

স্বর্ণ বলিল, "হোক্ না, আমার কি বয়ে যাচ্ছে? আমি কিছু অখুসি হব না। বয়সে খানিকটা ছোট হবে এই যা। নইলে ও খুব ভাল মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, ভদ্রঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও জানে, গান জানে, সেলাই জানে।"

"তুমি যে ঘটকীর মত পাত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে।" এমন সময় সিঁড়িতে হরেন্দ্রনাথের পায়ের শব্দ শুনিয়া রমেশ সেখান হইতে পলায়ন করিল।

স্বর্ণ কথা পেটে রাখিতে পারিত না। গল্প-গাছার সূত্রে কিছু কিছু বিনতার কানে গিয়াও পৌঁছিল। রমেশের উপর বিরাগ আরো খানিকটা তাহার বাড়িয়া গেল।

বিনতার দিন ভাল যাইতেছিল না। এখানে এত যত্নে সে থাকে, এত খাওয়া-দাওয়ার ঘটা, এত বিশ্রামও পায়, অথচ ভিতরে ভিতরে দারুণ একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করে। মনও যেন সারাক্ষণ বিভ্রান্ত, পথ খুঁজিয়া পায় না। ভবিষ্যৎ জীবনটা ক্রমেই যেন ঝাপ্সা হইয়া আসিতেছে। এ বাড়ীতে কর্ম্মকোলাহল লাগিয়াই থাকে। বন্ধু-বান্ধব নিত্য আসে, নিজের মন লইয়া বসিয়া থাকিবার সময় সে খুব পায় না। পড়াশুনাও করে ইহার মধ্যে মধ্যে।

ব্যাপারটা হরেন্দ্রনাথও লক্ষ্য করিতেছিলেন। সাময়িক কিছু গোলযোগ হইয়া থাকিবে, ভাবিয়া কিছুই বলিলেন না প্রথম। কিন্তু বিনতার মুখ আরও যেন বিমর্ষ হইয়া যাইতেছে। একদিন সকালে চা খাওয়ার পর তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে তোমার?"

বিনতা নিজেকে যেন একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "কিছু ত হয়নি।"

"কিছু হয়নি ত, ক্রমেই শুখিয়ে যাচ্ছ কেন? মুখটাই বা অত pale হয়ে গিয়েছে কেন? ঘরেই একটা ডাক্তার রয়েছে তাকে বলা ত যায় দরকার হলে?"

বিনতা বলিল, "দরকার হয়নি বলেই বলিনি।"

হরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ বসিয়া তাহাকে শরীর সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি খাও বড় কম, আর একটু বাড়াতে হবে। খোলা হাওয়াও তোমার আরো বেশী দরকার। স্বর্ণকে আরও বেশী টেনে বার কর না কেন?"

"না বেরোতে চাইলে কি করব? ও ঘরে বসে বসে গল্প করতেই ভালবাসে। আর এখানে ও আছেই বা কতদিন? বলছে ত ওর স্বামী এলে তার সঙ্গে ফিরে যাবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গেলেই হল আর কি? ও ত কিছুই সারেনি। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে এক বিপদ করুক আর কি? ওর স্বামীকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ও চলে গেলে নিজেও ছাড়া পাবে এই আশায় বুঝি খুব খুসি হয়ে উঠেছ?"

বিনতা মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার খুসি হবার কি আছে এর মধ্যে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে খুসি হওনি?"

বিনতা হাসিতে গেল, কিন্তু সে চেষ্টায় তাহার চোখে প্রায় জল বাহির হইয়া আসিল। হরেন্দ্রনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া তাহার আরও অপ্রস্তুত লাগিল। বলিল, "কিসের জন্যে খুসি

হব? আবার সেই ঝিয়ের জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে? আবার সেই উৎপাত, সেই অপমান আর সেই ভয়? এখানে মানুষের মত আছি, স্নেহ মমতা পাচ্ছি, সেটা বুঝি আমার সহ্য হচ্ছে না?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কথাটা আমি অর্দ্ধেকটা ঠাট্টা করে বলেছিলাম বিনতা। তুমি অত seriously ওটাকে নিও না। ঐ ঝিয়ের জীবনে তোমায় আর যেতে যাতে না হয়, তার জন্যে চেষ্টা ত কম করছি না। কিন্তু তুমি পুরোপুরি সহযোগিতা করছ কই?"

বিনতা বিষণ্ণভাবে বলিল, "যতটা সাধ্য তা ত করছি।"

"তার বেশী আর মানুষে কি করতে পারে? আচ্ছা, আমার ত বেরবার সময় হল। আজ সন্ধ্যাটা হয়ত পরিষ্কার থাকবে। একটু ভীড় কম এমন জায়গা ত কলকাতায় কোথাও নেই। গঙ্গার ধারে আজ বেড়িয়ে আসা যাবে খানিক, "বলিয়া হরেন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। বিনতা আবার স্বর্ণের কাছে বসিল। একলা থাকিতে তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাটা মেঘমুক্তই রহিল। কাজেই সকলে বেড়াইতে চলিল। গঙ্গার ধারে আজ লোকজন কম, কখন বৃষ্টি আসিয়া পড়ে এই ভয়ে বেশী জনসমাগম হয় নাই। গাড়ী ছাড়িয়া তাহারা হাঁটিয়াই চলিল খানিকক্ষণ। দূরে দেখা গেল মৃগাঙ্ক আসিতেছে।

স্বর্ণ বলিল, "আমরা কখন কোথায় বেড়াতে যাব, এ ভদ্রলোক জানে কি করে বল ত?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মন্ত্রতন্ত্র জানে বোধ হয় কিছু।"

মন্ত্রটা যে কি তাহা বিনতার জানা ছিল। তাহার মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। অবশ্য তখনই সেটা অদৃশ্য হইয়া গেল। মৃগাঙ্ক আসিয়া পৌছিল এবং তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল।

আকাশে আবার ধীরে ধীরে মেঘ সঞ্চার হইতেছে দেখা গেল। স্বর্ণ বলিল, "ভাল সময়ই আমি কলকাতায় এলাম বাপু, খালি বিষ্টি আর বিষ্টি।"

অগত্যা বাড়ীই ফিরিতে হইল। মৃগাঙ্ক তাঁহাদের সঙ্গেই আসিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই গোলক, আমার ঘর থেকে নূতন রেকর্ডগুলো আন্‌ত। বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম যে 'তানসেন'এর রেকর্ড অনেকগুলো কিনে এনেছি। বিনতা এবার শিখে নিতে পারবে।"

কিন্নরী কণ্ঠে বর্ষা আবাহনের গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল। খানিক শুনিয়া স্বর্ণ মন্তব্য করিল, "আর বর্ষাকে ডেকে কাজ নাই বাপু, বর্ষার জ্বালায় ত অস্থির। বর্ষা দূর করবার গান যদি কিছু থাকে ত বাজাও।"

মৃগাঙ্ক বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ওরকম গান কিছু লেখেননি। উনি আবার যা বর্ষার ভক্ত। কলেজে পড়তাম যখন, তখন প্রায়ই বলাবলি করতাম বৃষ্টির দরকার হলে, যে কষে একটা "বর্ষা মঙ্গল" জুড়ে দাও, হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামবে।"

রমেশ বলিল, "রবীন্দ্রনাথের অনেক আগের এক অজ্ঞাত কবি একটা লিখে গিয়েছেন, গান না হোক কবিতা, এ বিষয়ে।"

মৃগাঙ্ক বলিল, "সেটি কি?"

রমেশ বলিল,

"যা বৃষ্টি চলে যা,
লেবু পাতা করমচা।"

স্বর্ণ বলিল, "রমেশমামার মত বাজে কথা বলতে কেউ যদি পারে। আচ্ছা, রেকর্ডের গান ত হল, এবার বিনতাদি একটা গান করত। বর্ষার গান নয় কিন্তু।"

মৃগাঙ্কের সামনে গান গাহিবার ইচ্ছা বিনতার কিছু ছিল না। কিন্তু হরেন্দ্রও স্বর্ণের প্রস্তাব সমর্থন করাতে তাহাকে গাহিতেই হইল। কি গান গাহিবে স্থির করিতে পারিল না প্রথম, উঠিয়া গিয়া গানের বই লইয়া আসিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় থামিয়া গিয়া গান ধরিল,

"সন্ধ্যা হল গো! ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধর,
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো, সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক্ না জড়।"

নিজের মুখের উপর আলো না পড়ে এমন ভাবে সে সরিয়া বসিয়াছিল, তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। হরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিটা যেন সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল। পালাইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু কিছু না বলিয়া কি পালান যায়?

গান শেষ হইতেই রমেশ বলিল, মেয়েদের গান ত হল, এমনিতে এবং রেকর্ডেও, এবার ছেলেদের দিক থেকে একটা গাওয়া উচিত।"

স্বর্ণ বলিল, "তুমি করনা একটা, ছেলেবেলা ত বেশ গাইতে?"

রমেশ বলিল, "চর্চ্চা না রাখলে কি মনে থাকে? মড়া কাটতে কাটতে কি আর গান হয়? মৃগাঙ্ক-বাবু কিন্তু বেশ গাইতে পারেন আমি জানি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে তিনি আমাদের একটু আনন্দ দান করুন না?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "গাই না যে একেবারে তা নয়, তবে হিন্দি গানই শিখেছিলাম লোক রেখে, সেইগুলোই গলাতে আসে। বাংলা গান ভাল জানি না, অন্ততঃ এক্ষেত্রে গাইবার সাহস হবে না।"

"হিন্দি গানই করুন।"

মৃগাঙ্ক উপরি উপরি দুখানা হিন্দি গান করিল। গলা ভাল, গানের শিক্ষাও আছে।

গান শেষ হইতেই বলিল, "বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। এই বেলা পালান ভাল, নইলে আবার জোরে এলে বিপদে পড়তে হবে।"

সে চলিয়া গেলে হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনতা তুমি হিন্দি গান শেখনি কখনও? ভাল লাগে না?"

"শিখিনি বিশেষ। বাবা ও-সবের চর্চ্চা করতেন না। শুনে শুনে এর ওর কাছে দুএকটা শিখেছি। ভালই লাগে, তবে বাংলা গান যেরকম মনকে স্পর্শ করে এ ত তা করে না?"

রমেশ এই সময় উঠিয়া গেল। স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মেজমামা, তুমি কখনও গান করতে না?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, মনে ত পড়ে না, তবে গান শুনতে চিরকালই খুব ভালবাসি। তুই নিজে শিখিস্‌নি কোনো দিন?"

"হ্যাঃ, পাড়াগাঁয়ে ওসব কেই বা শেখাচ্ছে? তবু খান দুই তিন গান পাড়ার মেয়েদের কাছে শিখেছিলাম। মা বলত মেয়ে দেখতে এলেই ত গান শুনতে চাইবে, তখন গাইতে হবে ত?"

বিনতা বলিল, "তুমি একটা গান কর না ভাই।"

"হ্যাঃ, তোমার সামনে আবার আমি গান গাইব। সব ভুল সুরের বিচ্ছিরি গান।" অতঃপর সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

পরদিন স্বর্ণর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণ তাঁহাকে লইয়া এমন ব্যস্ত হইয়া রহিল যে, বিনতা তাহার ধারে-কাছেই ঘেঁষিতে পারিল না। বাড়ীতে চেঁচামেচি গল্পগুজব ঢের বাড়িয়া গেল। রমেশ এমনিতে বেশী বাড়ী থাকিত না, কিন্তু প্রায় সমবয়সী একজন পুরুষ বাড়ীতে আসিয়া জোটাতে, সেও গল্পের লোভে অনেক সময় বাড়ীতেই কাটাইতে লাগিল।

স্বর্ণের স্বামী প্রতুল আসিয়াই অবশ্য বিনতাকে লক্ষ্য করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ ভদ্রমহিলা কে?"

রমেশ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, "ওটি মেজদার পুষ্যিকন্যে।"

স্বর্ণ বলিল, "তুমি চুপ করত রমেশ মামা। সব সময় খালি ঠেস দিয়ে কথা বলা। পুষ্যি কন্যেটন্যে নয়, আমার দেখাশুনো করতেই মেজমামা ওঁকে এনেছিলেন। তখন থেকেই আছেন আর কি?"

স্বর্ণ স্বামীর সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে, না আরো কিছুদিন থাকিবে, তাহা লইয়া আলোচনা চলিল। হরেন্দ্রনাথ যাওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। তাঁহার কথার উপর আর কেহ কথা বলিতে সাহস করিল না। স্বর্ণ একটু ক্ষুণ্ণ হইল, তবে পরের মাসে তাহার স্বামী আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া যাইবে কথা দেওয়াতে, সে থাকিতে রাজী হইল।

বিনতার মনে হইল, তাহার বুকের উপর হইতে কে যেন পাষাণভার তুলিয়া লইল। কেন যে এমন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহা যেন প্রথমে বুঝিতেই পারিল না। পর মুহূর্ত্তেই তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল। এ কোন ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরের একেবারে কূলে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে? আর এক পা অগ্রসর হইলেই ত নিশ্চিত মরণ? ইহারই জন্য তাহার হৃদয় এতদিন কাঁদিয়া মরিতেছে, মূর্খ সে বুঝিতে পারে নাই কেন? ইহার মুখ যে চেনা নয়, তাই সে বোঝে নাই। ইহার স্পর্শও জীবনে সে প্রথম পাইল।

বাড়ীতে জামাই আসায় গোলমাল ত বাড়িলই, বেড়ানো, সিনেমা দেখিতে যাওয়া, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া সবই বাড়িল। মাঝে মাঝে বিনতা সঙ্গে যায়, মাঝে মাঝে যায়ও না। শরীর যেন তাহার ক্রমেই ভাঙিতে লাগিল।

রবিবার সকালে স্বর্ণ বলিল, "আজ ভাই আমরা দুজনেই বাইরে খাব, তুমি সেই রকম ব্যবস্থা করে দিও। পিস্শাশুড়ীর বাড়ী যাচ্ছি।"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল "কখন আসবে?"

স্বর্ণ বলিল "আসব সেই রাত্রে। মেজমামাকে বলেছি।"

"আচ্ছা সেই রকম বলে দিচ্ছি ঠাকুরটাকে।"

অল্পক্ষণ পরেই স্বর্ণ ও তাহার স্বামী বাহির হইয়া গেল। বিনতার হঠাৎ মনে পড়িল, বহুকাল সেও পিসীমার খবর নেয় নাই। আগে আগে যখনই কাজে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে গিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া আসিয়াছে। তিনি ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাও তাঁহাকে দেখিতে আসিতে খুব বেশী পারে না।

হরেন্দ্রনাথকে বলিয়া সেও ত আজ সারাদিনের মত ছুটি পাইতে পারে। নিচের ঘরেই তিনি আছেন বলিয়া বোধ হইল। পরদার এ পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিতরে আসব?"

"কে বিনতা, এস।" ঘরে ঢুকিয়া বিনতা দেখিল হরেন্দ্রনাথ খাটে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বিনতাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

বিনতা বলিল, "স্বর্ণ আর প্রতুলবাবু বেরিয়ে গেলেন।"

"জানি, আমায় বলেই গিয়েছে।"

বিনতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ ত কাজ নেই কিছু! ভাবছিলাম একবার গিয়ে পিসীমাকে দেখে আসি, অনেকদিন তাঁর কোনো খবর নিতে পারিনি।"

"বেশ ত যাও, আমি আজ এখনি বেরচ্ছি না। তোমায় পৌছে দিয়ে আসুক। খাবার সময় ফিরছ ত?"

বিনতা বলিল, "ভাবছিলাম একেবারে রাত্রে ফিরব। স্বর্ণও ত সেই সময় ফিরবে।"

"স্বর্ণ না থাকলে বুঝি বাড়ীতে থাকা যায় না? তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল যে?"

বিনতা বলিল, "তাহলে এখন যাব না। একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে যাব। আপনার সময় হবে এখন?"

"হবে। বোসো তুমি।" বলিয়া খবরের কাগজখানা পাট করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া আসিলেন।

আবার আসিয়া খাটেই বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ এখন?"

"ঐ একই রকম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার ডাক্তারীতেও তোমার বিশ্বাস নেই, যা বলি তা শোনও না। খাওয়া বাড়াতে বলেছিলাম, খাওয়া বাড়ানোর বদলে আরো কমিয়েছ মনে হচ্ছে চেহারা দেখে। আর একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে ভাবছি তোমায় পরীক্ষা করাব। নইলে শক্ত অসুখে পড়বে তুমি।"

বিনতা বলিল, "আপনার চেয়ে ভাল ডাক্তারে আমার দরকার নেই কিছু। আপনার কথা শুনতে আমি খুব চেষ্টা করি। কিন্তু বেশী খেতে কিছুতেই পারি না আমি। হয়ত শীতকালে ভাল থাকব। এই ভ্যাপ্‌সা গরমটা সহ্য হয় না আমার।

"থাকতেও পার, নাও থাকতে পার। আচ্ছা শোন, আমার অন্য কথাটা। মাসখানেক আগে যা বলেছিলাম, মনে আছে আশা করি।" এই তিনটি ছেলের সঙ্গে মিশলে কিছুদিন, তারাও মিশলেন। এখন যদি তাঁদের মধ্যে কেউ বিবাহের প্রস্তাব করেন তাহলে কি বলবে তুমি? আমি মৃগাঙ্কের কথা বলছি আমায় জানিয়েছে সে বিবাহ করতে চায়, আর বেশী দেরী না করে। তুমি কি বল?"

বিনতা চেয়ারের হাতলটা শক্ত মুঠায় ধরিয়া বলিল, "কি আর বলব? ওর প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিতে পারলাম না।"

—"পছন্দ হল না?"

বিনতার মুখ তখন প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, আরো নীচু গলায় বলিল, "পছন্দ অপছন্দ আর কি? উনি ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, সচ্চরিত্র লোক, এটা স্বীকার করছি।"

"কিন্তু ভবিষ্যৎ স্বামীরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পার না?"

বিনতা বলিল, "পারি না একেবারেই। কোনো দিন পারবও না। দেখুন, এই পরীক্ষাটা থামিয়ে দিন দয়া করে। বিয়ে আমি ওদের কাউকে করতে পারব না। অন্য লোক ডেকে এনেও লাভ নেই কিছু, বিয়ে করতেই আমি বোধ হয় পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "সেটা আগে বুঝতে পারনি? তখন বলেছিলে যে সাধারণ মানুষের মত সংসারী হবার ইচ্ছে তোমারও মাঝে মাঝে হয়েছে।"

"তখন যা বলেছিলাম, তখনকার পক্ষে ঠিকই বলেছিলাম। এখন মনটা আরো বদলে গেছে।"

"কোনোদিনই কাউকে বিয়ে করতে পারবে না মনে হচ্ছে ?"

"প্রায় তাই। সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না। দেখুন একটা কথা বল্ছি, এটা হয়ত আস্পর্দ্ধার মত শোনাবে, কিন্তু এটা ভিক্ষা মাত্র। আমার জন্যে আর কিছু করতে চেষ্টা করবেন না আপনি। আমার অদৃষ্ট আমাকে যে দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেই দিকেই যেতে দিন। একদল মানুষ আছে, ভগবানও যাদের ভাল করতে পারে না, আমি সেই দলের। ভাল আমার কোনোদিন কিছু হবে না। আপনি শুধু শুধু চেষ্টা করে বিফল হয়ে কষ্ট পাবেন কেন ?"

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া বিনতা যেন হাঁফাইয়া উঠিল। চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

হরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরবে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। এখন সিগারেটটা বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বিনতা চোখটা মোছ। অত বিচলিত হোয়ো না। তোমার ভিক্ষা আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। তোমার জীবনটাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে আমি পারব না। চেষ্টা করব অবশ্য বিয়ে দেবার, চেষ্টাই যে করব, তা বলছি না। ভগবান তোমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন, তার তুমি জানই বা কি ? ভাল কিছুই হতে পারে না, এই বা তুমি নিশ্চয় করে জানলে কি করে ?"

বিনতা বলিল, "আমি আর ক'দিনই বা আছি এখানে ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ও ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করে কিই বা বলা যায় ?"

৮

স্বর্ণ সেদিন বেশ রাত করিয়াই ফিরিল, বিনতারও ফিরিতে দেরিই হইল। হরেন্দ্রনাথের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে অনেকক্ষণ নিজের ঘরে পড়িয়া কাঁদিল। বুকের ভার কিছুই কমিল না। হরেন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন, সেই শব্দ শুনিয়া সে উঠিল, স্নান করিল, খাইবার চেষ্টা করিল। কিছু যেন তার গলা দিয়া আজকাল পার হইতে চায় না।

তাহার পর গেল পিসীমার বাড়ী। তিনি বিনতাকে দেখিয়া হা-হুতাশ করিলেন। বড়লোকের বাড়ী, খাওয়া-দাওয়া ভাল, কাজও বেশী নয়, তাহা হইলে এমন চেহারা হইল কেন ? বিনতাকে তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে। কিছুদিন বসিয়া বিশ্রাম করিয়া তাহার পর যেন কাজে যায়।

বিনতা বলিল, আর এখন ছেড়ে কি হবে পিসীমা যে মেয়েটির জন্যে আমাকে ওরা ডেকেছিলেন সে ত কিছুদিন পরে চলে যাবে; তখন ত আমায় চলেই আসতে হবে।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা তোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে ?"

"খুব। বাড়ীর কর্তা যিনি, তিনি দেবতার মত মানুষ, জীবনে বোধ হয় কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি।"

"খাওয়া-দাওয়াও খুব ভাল হয় বল্‌ছিস, অথচ কি শ্রীই হয়েছে।"

বসিয়া বসিয়া অনেক কথা হইল। ভাগ্যক্রমে আজ পিসতুতো বোনটিও আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। কাজেই ফিরিতে রাতই হইয়া গেল।

খাবার সময় সকলে একত্রিত হইতেই হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সবাকারই আজ day off ছিল নাকি ? দুপুরে এলাম একবার একটা মানুষও দেখতে পেলাম না।" উত্তর কাহারও কাছে প্রত্যাশা করিলেন না, পাইলেনও না।"

৯

স্বর্ণ বলিল, "কালও আমি একটু বেরব মেজমামা। তবে আজ যে রকম সারাদিন বাইরে রইলাম সে রকম থাকব না। সকালে বেরব আর চা খাবার সময় হতে না হতে ফিরে আসব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, বিনতাও কাল বেরতে চাও নাকি?"

বিনতা বলিল, "না, আমার আর কোথাও যাবার নেই। পড়াশুনো কিছু হচ্ছে না, কাল ভাল করে একটু পড়ব ভাবছি।"

বেশী কথাবার্ত্তা আর কিছু হইল না, খাইয়া-দাইয়া যে যাহার ঘরে প্রস্থান করিল। বিনতা অনেক রাত জাগিয়া নানা ভাবনা ভাবিল, তাহার পর শ্রান্তদেহে এবং শ্রান্ততর মনে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে চা করিতেছে, এমন সময় হরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "চা খাওয়া হয়ে গেলে একবার এস ত আমার ঘরে। আবার তোমার জন্যে plan করছি।"

বিনতা বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইবামাত্র বলিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই, আবার বিয়ের ব্যবস্থা নয়। তিনটে বরকেই ত অপছন্দ করে দিলে, আবার এখনি বর কোথায় পাব?" এ planটা অন্য রকম।"

স্বর্ণ আর প্রতুল এই সময় আসিয়া জোটাতে হরেন্দ্র আর কোন কথা বলিলেন না। চা খাইয়া চলিয়া গেলেন। প্রতুল, স্বর্ণ ও রমেশ যতক্ষণ বসিয়া চা খাইল ও বক্ বক্ করিল, ততক্ষণ বিনতাকে ঘরেই থাকিতে হইল। চা খাওয়ার শেষে স্বর্ণ বাহিরে যাইবার জন্য যখন জিনিসপত্র গুছাইল, তখনও তাহাকে সাহায্য করিল। সকালে চাকরকে বাজারে পাঠাইল। তাহার পর নিজের ঘরে গিয়া কয়েক মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরেন্দ্রনাথ আবার কি বলিবেন কে জানে? সে শান্তভাবে শুনিতে পারিবে ত? পারিতেই হইবে।

হরেন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখিল তিনি ছোট টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া কতকগুলি ছাপান কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। বিনতাকে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ বিনতা, যে কাজ এতদিন করলে সেই কাজটাই তোমার সুবিধাজনক হবে। অনেকদিন করেছ, অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুন কিছুর ভিতর যেতে তোমার হয়ত ভাল লাগবে না। নার্সিংএর ট্রেনিং নেবার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এটা পাস করতে পারলে তুমি ঢের বেশী রোজগার করতে পারবে। খুব বেশী দিনের course নয়। এ সময়টায় তোমার যে দিকে যা টাকা লাগে, তা আমি দিয়ে দেব। তুমি ধার বলে নেবে আমার কাছে, কথা দিয়েছ। নাও এই formটায় সই করে দাও একটা।"

বিনতা একখানা ফর্ম তুলিয়া লইল পড়িবার জন্য। প্রথম লাইন পড়িয়াই তাহার মনে হইল তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর কে যেন সজোরে আঘাত করিল। পাংশুবর্ণ মুখে সে যে চেয়ারটা কাছে ছিল, তাহার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

হরেন্দ্রনাথ তাহার কাছে উঠিয়া আসিলেন, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল বিনতা? শরীর খারাপ লাগছে?"

বিনতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি যেতে পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ মিনিটখানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? না যেতে চাও ত আমি জোর করছি না, কিন্তু কেন যেতে চাইছ না?"

বিনতার হাত কাঁপিয়া ফর্ম্মটা মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "কলকাতার বাইরে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কত জায়গায়, কত অবস্থায় ত থেকেছ। এটাও দুদিনে অভ্যাস হয়ে যেত। Prospect-টা ভালই ছিল বিনতা, তোমার লাভই হত। একবার চেষ্টা করবে না?"

বিনতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, সে শুধু অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি বাধা, কোথায় বাধা বল্‌বে আমাকে? যদি সে বিষয়ে কিছু করা যায়?

বিনতা ভাঙা গলায় বলিল, "আমি পারব না, মরে যাব।" তাহার মাথাটা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, কোনমতে নিজেকে যেন সে আড়াল করিতে চায়।

হরেন্দ্রনাথ বিনতার চিবুকে হাত দিয়া হঠাৎ তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুকে ছেড়ে যেতে এত কষ্ট হবে তোমার?"

বিনতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতৃহীনা হইবার পর এক অদৃশ্য বর্ম্মে সে নিজের হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। অভাব, দুঃখ, গ্লানি, অপমান, সব যেন এই বর্ম্মে ঠেকিয়া হারিয়া যাইত, বিনতাকে স্পর্শ করিত না। আজ স্নেহের স্পর্শে সেই বর্ম্ম তাহার খান্‌খান্ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। অশ্রু সাগরের ভিতর যেন সে একেবারে মিলাইয়া যাইতে চায়। হরেন্দ্রনাথের কথার সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

হরেন্দ্রনাথ নিজের চেয়ারটা তাহার কাছে টানিয়া আনিলেন। বিনতার অবনত মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এখানেও ত মরে যেতেই বসেছ। এমন কি দুঃখ যার কোনো প্রতিকার নেই? মুখ ফুটে একবার বলা যায় না?"

বিনতা উত্তর দিল না। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনতা, লক্ষ্মীটি তুমি নিজেকে একটু সামলাতে চেষ্টা কর। তোমার এ কান্না আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তুমি এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে। চেয়ার ছেড়ে খাটে এসে বোসো। তুমি পড়ে যাবে এখনই।" বলিয়া নিজেই তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। খাটের উপর বসাইয়া, নিজে তাহার পাশে বসিয়া বলিলেন, "শোনো বিনতা, তুমি বলতে পারছ না যখন, আমিই বলছি। কিছুই বুঝিনি এতদিন তা মনে কোরো না। কিন্তু উপায় খুঁজে পেতে একটু দেরি হল। তুমি চিরকাল থাকতে চাও আমার কাছে, একেবারে আমার হয়ে?"

বিনতা এতক্ষণে মুখের উপর হইতে হাত সরাইল। তখনও তাহার চোখ দিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে। প্রায় শোনা যায় না, এমন স্বরে বলিল, "এ যে অসম্ভব দুরাশা, তা আমি জানি।"

একহাতে জড়াইয়া ধরিয়া হরেন্দ্রনাথ বিনতাকে তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, "বলিলেন, অসম্ভব কেন বিনতা? আর দুরাশাই বা কেন? আমি অবিবাহিত, সুস্থ, উপার্জ্জনক্ষম। তুমি কুমারী, সাবালিকা এবং রক্ত সম্পর্কে আমার কোনো আত্মীয়াও নও। আইনতঃ কোনো বাধাই নেই, বিবাহে।"

বিনতার মাথাটা হরেন্দ্রনাথের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, দারুণ হতাশা-ভরা কণ্ঠে বলিল, "আমি একেবারে আপনার অযোগ্য। দরিদ্রের মেয়ে, প্রায় অশিক্ষিত, কি ভাবে আমার জীবন কেটেছে এতদিন তা ত জানেন। আমাকে গ্রহণ করলে সমাজে আপনি নিন্দিত হবেন, উপহাসের পাত্র হবেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যোগ্যতার বিচার কি দিয়ে করবে বিনতা? খুব বড়লোকের মেয়ে হলেই কি যোগ্য হয়? সে রকম জুটেছিল ত অনেকবার, কিন্তু কখনও ইচ্ছা হয়নি নিজের জীবনকে জড়াতে তাঁদের কারো সঙ্গে। তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, আমিও ভদ্রলোকের ছেলে, এক্ষেত্রে সাম্যই আছে। লেখাপড়া আমি খানিকটা করেছি, তুমি ততটা করতে পারনি, সুবিধা পাওনি। সুবিধা এখন পাবে, এবং

এক্ষেত্রেও সমানই হয়ে দাঁড়াবে। এতদিন খেটে খেয়েছ, কারো পদানত হওনি, এটা তোমার গৌরব, অপযশ নয়। আর আমার নিন্দা যদি হয় হবে, আমি গ্রাহ্য করি না। উপহাস যদি করে আমার কানেও আসবে না। কিন্তু এ সব ত বাইরের যোগ্যতার বিচার। সেখানে সম্পদ কিছু কি নেই? এমন সুন্দর চেহারা, এমন মিষ্টি গলা, এমন মমতায় ভরা দুখানি হাত, এর কোনো মূল্য নেই? তুমি অবাক হচ্ছ আমার কথা শুনে, না? সত্যি এসব কথার মানে কিছু নেই। আমার বিয়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য ভালমন্দ ওজন করে তোমাকে গ্রহণ করতে চাইছি, তাও ত নয়। তোমাকে বাদ দিয়ে আজ আমার চলছে না, জীবনটা এমন শূন্য, এমন নিরর্থক মনে হচ্ছে যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তুমি যে আমাকে ঠিক আমারই মত করে ভালবাসছ, তাও কি আমি বুঝিনি? আমার অনুমান সত্য কি না তুমিই বল।"

বিনতা বলিল, "এর চেয়ে বড় সত্য জীবনে আমার আর কিছু নেই। এতক্ষণে হরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে সে একবার তাকাইল, বলিল, "পৃথিবীতে ভাল যদি কাউকে বেসে থাকি, সে আপনাকে। ভক্তি যদি কাউকে করে থাকি সেও আপনাকে।"

একনিষ্ঠ ভালবাসাই পাবার অধিকার দিতে পারে, আর কিছুতে পারে না।"

বিনতার অতীত জীবনটা যেন হঠাৎ হারাইয়া গেল। এখনই কি সে জন্মলাভ করিল এই আনন্দ-লোকের মধ্যে? তাহার দুঃখ নিপীড়িত কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি কি ইহারই জন্য তপস্যা করিয়াছিল? চোখের জল তাহার শুখাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে অনেকক্ষণ ভাষা আসিল না। হরেন্দ্রনাথের আলিঙ্গনের মধ্যে, তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, শুধু দুই হাতে তাঁহার একখানা হাত নিজের বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল।

হরেন্দ্রনাথও খানিকক্ষণ নীরব হইয়াই রহিলেন, তাহার পর বিনতার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "একেবারে কথা বলছ না কেন বিনতা?"

বিনতা বলিল, "কি কথা বলব? খুঁজে পাচ্ছি না।"

"খুসি হওনি?"

বিনতা বলিল, "ও কি কথা দিয়ে আমি বোঝাতে পারব?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পারা যায় না বটে। সব চেয়ে বড় খুসি, আর সব চেয়ে বড় দুঃখ, কোনোটাই কথায় বোঝান যায় না। থাক গে ওটা আমাদের বুকের ভিতরেই এখন, ও নিয়ে নাড়াচাড়া করে এখন কাজ নেই। কিছু হাল্কা আনন্দের কথা বল, সাধারণ প্রতিদিনকার কথাই বল। গলার স্বরটা তোমার সারাক্ষণই যে শুনতে ইচ্ছা করে।"

বিনতা নীচু গলায় বলিল, "একটা কথা বলব? ভারি জানতে ইচ্ছা করছে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটা কেন, একশটা বল না? কি কি জানতে চাও বল?"

বিনতা বলিল, "এমন করে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিলেন কেন? কি করেই বা আমার অন্য জায়গায় বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন! এত ভালবেসে এমন করে কষ্ট দেওয়া যায়?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্যবহারটা আমার যুক্তিসঙ্গতও হয়নি, বুদ্ধিমানের মতও হয়নি। এটা নিয়ে মনে ক্ষোভ রেখো না বিনতা, ক্ষমা কোরো আমাকে। নিজের মন আমি প্রথমেই ভাল করে বুঝতে পারিনি; দারুণ একটা বন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়ছি, এটা বুঝবামাত্র, মুক্ত হবার একটা প্রাণপণ প্রয়াস

মনের মধ্যে জেগে উঠল। ক্ষণিকের মোহই এটাকে ভেবেছিলাম প্রথমে। প্রথম যৌবনে একবার ঘা খেয়েছিলাম। তখন যথেষ্ট বড়লোক হইনি, সেইজন্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম এক জায়গায়। হৃদয়ে আঘাত খানিকটা লেগেছিল, তার চেয়ে বেশী লেগেছিল আত্মাভিমানে। স্থির করেছিলাম, বিয়ে করবই না, তবে সন্ন্যাসীও হব না। নারীকে জীবনে স্থান না দিয়েও যে সুখে সংসারে থাকা যায় সেইটাই দেখাব। দেখাতে পেরেও ছিলাম এতদিন।"

বিনতা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এমন নির্ব্বোধ মেয়েও পৃথিবীতে জন্মায়?"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "সে ত তোমার চোখ দিয়ে আমায় দেখেনি। আর প্রত্যাখ্যানটা সেই করেছিল, না তার অভিভাবকরাই করিয়েছিলেন তা ঠিক জানি না। আমি আজ তোমাকে দুর্লভতম রত্ন বলে বুকে করে নিচ্ছি, কিন্তু তোমাকেও অবহেলায় ফেলে পালিয়েছে, এমন নির্ব্বোধ মানুষও দেখেছ। কিন্তু যাক, যে কথা বলছিলাম। দেখ সহজে হাল ছাড়িনি। নারীসঙ্গবর্জ্জিত জীবন ছিল আমার, তার জন্যে দুঃখ করিনি কখনও। কিন্তু তুমি বাড়ীতে আসবার পর কি করে জানিনা আবহাওয়াটা বদলে গেল। তুমি দেখতে সুন্দর, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে ত আগেও দেখেছি। গলাটা ভারি মিষ্টি, কিন্তু তাও কি আগে কখনও শুনিনি? বুঝতেই পারিনি প্রথমে ব্যাপারটা কি ঘটেছে।"

বিনতা অস্ফুট স্বরে বলিল, "ঠিক আমারই দশা। আমিই কি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "প্রথমেই হয়ত সবাই বোঝে না। আমি প্রথম বুঝলাম অসুখে পড়ে। পাগল হতে যেটুকু বাকী ছিল, তাও সম্পূর্ণ হল। অমন সেবা জীবনে কখনো কারো কাছে পাইনি। তখন বুঝলাম যে অত ভাল লাগছে কেন সেবাটা। তুমি করেছ যে? তোমার হাত আমাকে স্পর্শ করে আছে বলে রোগশয্যাও আমার কাছে অমৃতময় হয়ে উঠেছে। মাথার কাছে বসে বসে হাত বুলতে, আর আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করত তোমাকে আরও কাছে পাবার জন্যে। বুঝলাম এবার আমার আর রক্ষা নেই, যদি না তোমাকে সরাতে পারি জীবন থেকে। তাই এসব চেষ্টা আরম্ভ করলাম, যদিও জানতাম যে নিজের পায়ে নিজে এমন কুঠারাঘাত করছি, যে জীবনটা একেবারেই পঙ্গু হয়ে যাবে এরপর।"

বিনতা অভিমানভরা কণ্ঠে বলিল, "বিদায় ত এমনিই করে দিতে পারতেন। আমি মরতাম ঠিকই, কিন্তু আপনি চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হতেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ক্ষমতা আমার ছিল না বিনতা। খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, আমাকে ভুলতে পারবে এমন কিছু যদি হতে পারত, হয়ত তার মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে সরে আসতে পারতাম। কিন্তু আর কিছুর মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।"

বিনতা বলিল, "পৃথিবীতে এমন কিছু ত আমি কল্পনাও করতে পারি না, যার মধ্যে থেকে আমি আপনাকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পারতাম।"

"বিনতা, তুমি ছেলেমানুষ বলেই বোধ হয় নিজেকে সহজে চিনেছিলে। আমি হাজার গোলক-ধাঁধায় ঘুরে কেমন যেন সব কিছু ঝাপসা করে ফেলেছিলাম। ভাবছিলাম যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে তুমি দূরে চলে যাও, তাহলে হয়ত আমি একটু ভুলতে পারবো, অন্ততঃ চিরকালের মত হাতের বাইরে যে চলে গেল, তাকে জীবন থেকে খানিকটা বাদ দিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু সে ত তুমি ঘটতে দিলে না। আমার আত্মহত্যার চেষ্টা তুমি ব্যর্থই করে দিলে। নিজের কাছে খাঁটিই রইলে। তারপর আজকের এই

শেষ চেষ্টা দূরে সরানোর। এও তোমার চোখের জলের বানে ভেসে গেল। আমাকে বাঁচালে তুমি। এমনি করে এসে যদি আমার বুকে না পড়তে তুমি, তাহলে আমি হতভাগা তোমাকে চিরদিনের জন্তে হারাতাম।" আর কিছু জানতে চাও?

বিনতা বলিল, "না।"

হরেন্দ্রনাথ এইবার বিনতার মুখখানা দুইহাতে তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "তোমাকেও আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে বিনতা। রূঢ় শোনাবে হয়ত, কিন্তু রাগ কোরো না। আমার জানা দরকার।"

বিনতা ভীতচক্ষে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "বলুন।"

"দেখ, একদিকে আমাদের একটা বড় পার্থক্য রয়েছে, সেটা বয়সের। আমি তোমার চেয়ে সতেরো বৎসরের বড়। এখনও অবশ্য বুড়ো হইনি। কিন্তু আরো কুড়ি বৎসর পরের কথা ভাব। তুমি তখনও সুন্দরী যুবতী থাকবে, আর আমি হয়ে যাব পলিতকেশ বৃদ্ধ। তখনও এই অনুরাগ কি থাকবে? স্বামী বলে ভাবতে খারাপ লাগবে না?"

বিনতা চমকাইয়া হরেন্দ্রনাথের আলিঙ্গন ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি আমাকে একেবারে জানোয়ার মনে করেন? আমি কি মানুষ নয়? আপনার বয়স বেশী হলে আর আমি আপনাকে ভালবাসতে পারব না? মানুষ কি শুধু রূপ আর যৌবনটাকেই ভালবাসে? পৃথিবীতে আমার যদি কেউ ভক্তির পাত্র, ভালবাসার পাত্র থাকেন ত সে আপনিই, তা ত বিশ্বাস করেন? আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, অমন দুর্মতি হবার আগে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।" সে হরেন্দ্রনাথের দুই পা ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিল।

হরেন্দ্রনাথ তাহাকে আবার টানিয়া লইলেন নিজের বাহুবন্ধনে। বলিলেন, "মুখের কথায় বললেই আমি বিশ্বাস করব বিনতা, পা ছুঁয়ে বলার দরকার নেই। তুমি কষ্ট পেলে, রাগও করলে বোধ হয়, কিন্তু কথাটা জানা আমার দরকার ছিল। আমি ডাক্তার, অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মন এই নিয়েই আমার কাজ। বহু বৎসর শুধু এদের নিয়েই আমি আছি। তাই মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে খানিকটা অবিশ্বাস আমার এসে গেছে। মানুষের মন পরিবর্ত্তনশীল, সেটাকে অপরাধও বলা যায় না। যদিও সেটা তোমার কাছে এখন দারুণ অপরাধ মনে হচ্ছে। বয়সের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীও বদলায়। সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি যেন এমনই থাক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি একাগ্র একনিষ্ঠ মন নিয়ে ঢের মেয়ে জন্মেছে আমাদের দেশে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে চিরকালই জন্মাবে। তুমি ত আমাদের মহাভারতের যুগের সাবিত্রীর জাতের মেয়ে। তিনি স্বামী ক'দিন পরে মারা যাবেন জেনেও তাকেই বিয়ে করেছিলেন। তুমিও স্বামী তোমার ঢের আগে বুড়ো হয়ে যাবেন জেনেও তাকেই গ্রহণ করেছ।"

বিনতা বলিল, "দেখুন, মানুষ যখন দেবতাকে ভালবাসে তখন কি তাঁর বয়স বিচার করে?"

"তা করে না, কারণ তাঁরা চিরযৌবনের অধিকারী। আমরা যে মানুষ।"

বিনতা বলিল, "মানুষের কাছে দেবতা ত বেশীর ভাগ মানুষের রূপেই আসেন?"

"আসেন হয়ত। ভাবিনি ও বিষয়ে বেশী কিছু।"

বিনতা অনেকক্ষণ আবার চুপ করিয়া রহিল। কথা বলিতে চায়, কিন্তু কথা বলিতে পারে না। একটা দিনে মানুষের জীবনে এমন পরিবর্ত্তন কি করিয়া আসে? ভোরবেলা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে বিনতা জগতের দিকে চাহিয়াছিল, এ কি সেই? হরেন্দ্রনাথের হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দেখুন—"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখছি, কিন্তু একটা আবেদন আমার রাখবে ?"

বিনতা বলিল, "আপনার কথা রাখব না, এত হতে পারে না, কিন্তু আবেদন বলবেন না, শুনতে কানে খারাপ লাগে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আবেদন না হয় নাই হল, কথাটা হচ্ছে এই। লক্ষ্মী মেয়ে তুমি আর আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন কোরো না, "তুমিই" বল। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হতে যাচ্ছ সেটা আমায় ভুলে থাকতে দাও। বয়সটার কথা আমি আর ভাবতে চাই না।"

বিনতা হরেন্দ্রনাথের হাতটায় নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, "তাই বলব, তাই বল্‌ব। আর তুমি আমার একটা ভিক্ষা মঞ্জুর কর, আমার কাছে আর নিজেকে কোনোদিন বৃদ্ধ বোলোনা, শুন্‌লে কে যেন আমার কানে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেয়। তোমার কোনো বয়স নেই আমার কাছে, তুমি আজও যা, আমার শেষ দিন অবধি তাই থাকবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, দুজনের কথাই দুজনে রাখলাম। কিন্তু তুমি প্রথমে বলতে যাচ্ছিলে কি, যখন তোমায় বাধা দিলাম ?"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মীয়-স্বজনকে জানান হবে ত ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জানান হবে বই কি ? এ ত লুকবার কিছু নয় ? তোমার যাঁরা আত্মীয় আছেন জানাও তাঁদের। আমিও বাড়ীতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সম্প্রতি বাড়ীতে যারা আছে, তাদের ত মুখেই বলা যাবে।"

বিনতা বলিল, "মা ত একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন। তাঁর মতে ত অনন্যপূর্ব্বা মেয়ের বিয়েই হতে পারে না। তাঁর মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্যরূপিণী মেয়ের এমন কপাল হবে, এ তিনি ধারণাও করতে পারবেন না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ধারণা না করুন, বাস্তব জিনিষটাকে স্বীকার তাঁকে করতেই হবে। তোমার পিসীমা কি বলবেন ?"

তিনি খুব খুসী হবেন। ওঁর ওসব কুসংস্কার নেই। তবে করতে কিছুই পারবেন না, অক্ষম হয়ে পড়েছেন।"

"খুসী হওয়ার লোকেরই অভাব, কাজ করবার লোক ঢের জোটে।"

বিনতা বলিল, "আর একজন লোক খুসী হবে না, সে তোমার ভাই রমেশ।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই নাকি ? তিনিও বুঝি তোমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন ? চোখ দেখে তাঁর, মাঝে মাঝে তাই মনে হত।"

বিনতা বলিল, "তা জানি না, তবে তুমি আমাকে নিলে, এ তার সহ্য হবে না। স্বর্ণকে সারাক্ষণ সে ঐ কথাই শোনায়। তোমার যে চেষ্টা আমার বিয়ে দেবার, সেটা নিতান্তই লোক দেখান, আসলে নিজের জন্যেই আমাকে reserve করে রেখেচ।"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বাঁদর হলে কি হয়, ধরেছে ঠিক। মৃগাঙ্ককে বিয়ে করবে না বল্‌লে যখন, তখন মনে হল আমার যেন ফাঁসির হুকুম রদ হল।"

বিনতা বলিল, "সত্যিই পুরুষদের বুঝি না আমি। এই মন নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করছিলে ? আমি হলে ত আত্মহত্যা করতাম, যদি দেখতাম তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করছ।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আত্মহত্যাই আমিও করছিলাম বিনতা, নিতান্ত ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেলাম। তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে আমি বেঁচে থাকতাম, সে এই হরেন্দ্র নয়। তাকে দেখলে তুমি চিন্‌তে পারতে না। আচ্ছা ঐ বোকা লোকটাকে একটা চিঠি লিখব ?"

"কোন বোকা লোককে ?"

"যে তোমায় অনন্তপূর্ব্বা করে ফেলে পালাল। কার্য্যতঃ করে গেল অনন্যপূর্ব্বা। পুরুষজাতের উপরেই চটে গেলে। নিজেকে রেখে দিলে আমারই জন্যে একান্ত করে। ও লোকটা আমার খুব বড় উপকার করেছে।

বিনতা বলিল, "সত্যি কথাই। ওরা যদি উঠে না যেত তাহলে এতদিনে কোন নরকে যেতাম কে জানে ? সেইটাকেই মেনে নিতাম হয়ত।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ এই নরকেই বাস করে বিনতা। দেহের দিক থেকে ঘনিষ্ঠতম হয়ে যায়, কিন্তু মনের তফাৎ তাদের সুমেরু আর কুমেরুর তফাতের চেয়েও বেশী। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ ক'টা বেজেছে।"

বিনতা তাকাইল। তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, "কি ভীষণ দেরি করিয়ে দিলাম তোমার। তুমি ত এর দুঘণ্টা আগে বেরিয়ে যাও।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "অন্যদিনের নিয়মে কি আজও কাজ চল্‌বে ? আর তুমি অত ব্যস্ত হোয়ো না পালাবার জন্যে। না হয় আজ একটু ফাঁকিই দিলাম কাজে ? কোনোদিন ত দিইনি ?"

বিনতা বলিল, "যা তোমার খুসি।"

হরেন্দ্রনাথ এইবার বিনতাকে মুক্তি দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "তুমিও চল আমার সঙ্গে।"

বিস্মিতা বিনতা জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় ? রোগী দেখতে ?"

"রোগীদের কাছ অবধি তোমাকে নিয়ে যাব না। হিংসেয় তাদের রোগ আরো বেড়ে যাবে। বেশী নয়, গোটা দুই রোগীকে মাত্র আজ দেখতে যাব। তারপর তোমাকে নিয়ে বাজারে যাব।"

বিনতা বলিল, "না দেখ, ঢের ত রয়েছে, এখনি আবার কেন ? চিরজীবন ধরে পাবই ত তোমার কাছে ?"

হরেন্দ্রনাথ তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিলেন, "বুড়ী গিন্নীর মত পাকামী কোরোনা ত এখনি। নূতন বউ হতে যাচ্ছ, ঠিক তেমনি চুপ করে থাকবে। আর শাশুড়ী যখন এখানে উপস্থিত নেই, তখন তাঁর পুত্রের হুকুমমত সাজসজ্জা করবে। আমার বউ অন্য কারো কাছে ত হার মানতে পারে না ?"

বিনতা বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমার কথার উপর কথা বলা আমার উচিত হয়নি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনুচিত আর কি ? তবে ক'টা দিন সবুর কর একটু। যে ক'টা সাধ আছে তা একটু মিটিয়ে নিই। তারপর ত তোমার অবাধ্য হবার সব অধিকারই রইল। যাও দেখি, একটু তৈরি হয়ে এস। বাড়ীতে কাজ আছে নাকি ?"

বিনতা বলিল, "কিছু নেই, সব সকালে মিটিয়ে রেখেছি। ভাবছিলাম তুমি না জানি কি আবার বল্‌বে, আর কেঁদে মরতে হবে সারাদিন। নিজের কাছে ধরা পড়ার পর ঐ ত ছিল আমার কাজ। খেতে পারতাম না, ঘুমুতে পারতাম না, কোনো কাজে মন দিতে পারতাম না। খালি ভয় করত এই বুঝি তুমি বিদায় করে। এমন কষ্ট জীবনে আমি পাইনি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটু যদি আগে আমাকে জানতে দিতে। তা হলে এতদিন বসে বসে এই বোকামীগুলো করতাম না।"

বিনতা বলিল, "তুমি আজ বলিয়ে নিলে, তাই বলতে পারলাম। নিজের থেকে পারতাম না, বুক ফেটে মরে গেলেও পারতাম না।"

হরেন্দ্রনাথ আবার তাহাকে কাছে টানিয়া নিলেন। বলিলেন, "কেন বিনতা? ভালবাসা কি এতবড় অপরাধ? এটা স্বীকার করতে মেয়েরা এত লজ্জা পায় কেন?"

বিনতা বলিল, "ভয় পায় বলে বোধহয়। প্রতিদান যদি না পায়, তা হলে সে লজ্জা ঢাকবার পৃথিবীতে আর কোথায় জায়গা থাকে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটা কিন্তু আমরা পারি বিনতা। দেখ আমাকে দেখে কি খুব ব্যর্থ প্রেমিক মনে হয়? আগে যে ভালবাসার সামান্য আঁচও আমার জীবনে লেগেছিল, তাও ত ভুলে গেছি।"

বিনতা হাসিয়া হরেন্দ্রনাথের কাঁধে মাথাটা রাখিয়া বলিল, "শুধু আঁচ বলেই অত সহজে ভুলেছ। আমার মত যদি দাবানলের মধ্যে পড়তে, তাহলে ভুলতে পারতে না। ভালবাসা বলে যা কিছু চলে, তার বেশীর ভাগই ত ভালবাসা নয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শতকরা নিরানব্বুইটা নয়। কিন্তু আবার যদি এখন প্রেমালাপ আরম্ভ করি তাহলে আমার আজ আর বেরনই হবে না। অতএব একটু নির্ম্মম হয়েই তোমাকে সরিয়ে দিচ্ছি বুকের উপর থেকে। যাও লক্ষ্মীটি, তাড়াতাড়ি ready হয়ে এস।"

বিনতা আরক্ত মুখে ঘরের বাহির হইয়াই পড়িল রমেশের সামনে। জলন্ত দৃষ্টিতে বিনতার আনন্দ উচ্ছ্বসিত মুখ ও চোখের দিকে তাকাইয়া সে সিঁড়ির মুখ হইতে সরিয়া গেল। বিনতার সন্দেহ হইল সে হরেন্দ্রনাথের ঘরে কি কথা হয়, তাহা শুনিবার জন্যই এখানে দাঁড়াইয়াছিল। কি শুনিয়াছে কে জানে? তাহারা কেহই বিশেষ নীচু গলায় কথা বলে নাই। হরেন্দ্রনাথের অনুমান কি সত্য? রমেশও কি বিনতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল? কে জানে? তাহার দিকে মন দিবার বিন্দুমাত্র অবকাশও বিনতার ছিল না।

প্রস্তুত হইয়া যখন হরেন্দ্রনাথের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনিও প্রস্তুত। বিনতাকে দেখিয়া বলিলেন, "আজ বিয়ের registrationএর নোটীশ দিয়ে দিলে কেমন হয়? তার পরেও পনেরো দিন বসে থাকতে হবে। দেরি করে কোনো লাভ আছে?"

বিনতা বলিল, "কিছুমাত্র লাভ নেই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চল বেরই। যতটা কাজ এক সঙ্গে সেরে আসা যায়। আজকে ঘরেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতে চাই। একজনের ভবিষ্যতের plan নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, এখন দুজনের একসঙ্গে plan করতে হবে।"

হরেন্দ্রনাথ যতক্ষণ রোগী দেখিলেন, ততক্ষণ বিনতা গাড়ীতে বসিয়া নিজেকে একটু শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রক্তধারার উন্মত্ত নৃত্যকে থামাইতে পারিল না, হৃদয়াবেগের প্রবলতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে কি শেষে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে?

হরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমার মুখ চোখ এমন ছল্‌ছল্‌ করছে কেন? অসুস্থ লাগছে?"

বিনতা বলিল, "অসুস্থ নয়, কিন্তু স্বাভাবিকও নয়।"

হরেন্দ্রনাথ তাহার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "বড় বেশী চঞ্চল। অতখানি overdose তোমার সহ্য হয়নি। চল বাড়ী ফিরে। আজ শুধু আংটিটা নিয়ে যাই, বাকী কাজ কাল হবে।"

বিনতা বলিল, "কি বিচ্ছিরি, আজই শেষে অসুখ বাধাব নাকি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, না, অসুখ নয়। বাড়ীতেই ডাক্তার রয়েছে তোমার ভাবনা কি? মুস্কিল এই যে তিনি ত শুধু ডাক্তার নন, ভাবী স্বামী এবং প্রণয়ীও বটেন। অসুখের মূলেও তিনি, অবসান করবার ভারও তাঁর উপরে।"

হীরার আংটির মাপটা দেওয়া ছাড়া আর কিছু বিনতাকে করিতে হইল না। আংটি পরিয়া বাড়ী আসিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "আর কাউকে কিছু বোঝাতে হবে না, এইটে দেখলেই বাড়ীর সবাই বুঝবে। স্বর্ণ যা চেঁচাবে। তার মতে ত তুমি মুনি-ঋষিদের দলে। কোনো স্ত্রীলোকের দিকে তাকাওই না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পৌরাণিক ঋষিরা ত সবাই প্রায় পরীক্ষায় ফেল। একটি অপ্সরা দেখলেই কাৎ হয়ে পড়তেন। আমি যাকে দেখে কাৎ হলাম তিনি ত ঢের বেশী উঁচু দরের জিনিষ। আচ্ছা, এখন ত খাওয়ার সময় হোলো। খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও ত লক্ষ্মী মেয়ের মত। তাহলেই বিকেলে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।"

বিনতা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "একটু অবাধ্য হব এবার, এখন ঘুমতে পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ বেশী জেদ করিলেন না, কারণ বিনতার অসুস্থতাটা মারাত্মক কিছু ছিল না। চাকর-বাকর ছাড়া বাড়ীতে কেহ ছিল না। দুপুরের খাওয়া চুকিয়া গেলে, দুজনে মিলিয়া সাম্প্রতিক কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কথাবার্ত্তার মোড় অন্যদিকে ফিরিয়া গেল।

বিনতাকে শেষ পর্য্যন্ত ঘণ্টাখানিক ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে হইল, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও সে ঘুমাইতে পারিল না। বিকাল হইতে না হইতে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া পড়িল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সকাল থেকে বাড়ীটা চুপচাপ ছিল আজ, সেটা মস্ত লাভ। নইলে সকলের চোখ কান বাঁচিয়ে চলতে হত। সেটা পারা শক্ত, বেশী উত্তেজনার মুখে। মেয়েরা কেঁদে কেটে খানিক হাল্কা হয়ে যায়, আমরা যে তাও পারি না। সকালে বুঝতে পারছিলাম না অনেক সময় পায়ের তলায় মাটি আছে কিনা।"

বিনতা বলিল, "বাইরে তুমি এত শক্ত দেখতে, যে কেউ কখনও বুঝবে না যে, ভিতরে তুমি এই রকম।"

"তুমি ত বুঝবে তাহলেই হল। ভিতরটার সঙ্গে আর আমার কারই বা সম্পর্ক? চিরদিন ত আমি একলা। আচ্ছা এইবার সব ফিরল বলে, জ্বালাবে খানিক। বেশী upset হয়ো না, যে যাই বলুক। তোমার নাড়ীর চাঞ্চল্য এখনও যায় নি।

বিনতা বলিল, "কোনদিন যাবেও না।"

চা খাইবার সময় বাড়ীর যাহারা বাহিরে ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই এক সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। বিনতার হাতের দিকে চাহিয়া অন্তের অলক্ষ্যে একটা বিকট মুখভঙ্গী করিয়া রমেশ নিজের ঘরে চলিয়া

গেল। স্বর্ণ বিনতাকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, বিনতাদি, এ কি কাণ্ড?" তোমাকে আংটি পরাল কে?"

হরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "বিবাহযোগ্য পুরুষ মানুষ ত এ বাড়ীতে একজনই আছে, সেই পরিয়েছে।"

স্বর্ণ বলিল, "এ রাম, বিনতাদি শেষে মামী হয়ে বসল? প্রণাম করতে হবে এরপর? রমেশ মামাটা ফাজিল হলে কি হয় ঠিকই বুঝেছিল। আমিই বরং বলতাম মেজমামা সন্ন্যাসী মানুষ. ওর ওপরে মন নেই। কোন মেয়ের দিকে তাকায়ই না।"

মেজমামা বলিলেন, "একবার ভাল করে তাকিয়েই ত এই দশা।

স্বর্ণ বলিল, বিয়ে কবে হবে মেজমামা? আমি থাকতে থাকতে হবে ত?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিশ্চয়, তোকে ত বরকর্ত্রী, কন্যাকর্ত্রী দুইই হতে হবে। বউয়ের জন্য কি কি দরকার ভাল করে একটা ফর্দ্দ কর ত। তুইই ভাল পারবি। বিনতা ত কনে মানুষ, তার লজ্জা করবে। তাছাড়া সে জানেই বা কি? বিয়ে ত আগে করেনি।

স্বর্ণ বলিল, "সে ত বটে। তা ছাড়া নিজের বিয়ের কাজ, নিজে করতে নেই।"

৯

কিছুদিন পরের কথা। স্বপ্নাদের বাড়ীতেও বিবাহের ঘটা লাগিয়েছে। প্রথমা কন্যার বিবাহ, ধুমধাম হইতেছে সাধ্যমত। গোধূলি লগ্নে বিবাহ। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ হইতেছে। ইহারই মধ্যে কনেকে সাজান হইতেছে, ঘর একেবারে ভর্ত্তি। এ ঘর ছাড়িয়া কেহ নড়িবার নাম করিতেছে না। সরোজিনী আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেছেন।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করিল, "মা বিনতাদি আসবে না আজ?"

মা বলিলেন, "আসতে ত অনেক করে বলে দিয়েচি, তার বাড়ী থেকেই ত বর বেরুচ্ছে। এখন আর দিদি বলছিস্ কেন, কাকী হয়ে বসেছে।"

স্বপ্না বলিল, "কি দারুণ কপাল বাবা মেয়ের। এল নার্স হয়ে, হল রাজরাণী।"

সরোজিনী বলিল, "তা মেয়ের গুণ আছে বাছা। রূপে ভোলায়নি। এমন সেবা করেছে যে তাতেই জিতে গেছে। নে সব তাড়াতাড়ি, এখনি বর এসে পড়বে।"

বরের বাড়ী, অর্থাৎ বরের কাকার বাড়ীতে মহাধূম। আত্মীয়স্বজনে বাড়ী গম্‌গম্ করিতেছে। অনিলের মায়ের হাতে আজকার গৃহিণীপনার ভার দিয়া, বিনতা নিজের ঘরে বসিয়া স্বামীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে স্বপ্নাদের বাড়ী অন্ততঃ এত সাজিয়া যাওয়া তাহার ভাল দেখায় না। সেখানে সে ছিল আর একভাবে।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি আমার কথা শুনবে কি না বল। তার উপর নির্ভর করবে আমার যাওয়া।"

বিনতা মিনতিপূর্ণ চোখে তাকাইয়া বলিল, "কবে তোমার কথা না শুনি আমি? আজ একদিন যদি আমার কথাটা শুনতে।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "বেশ, আমিও যাব না, তুমিও যেয়ো না।" বলিয়া লম্বা হইয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন। বিনতা দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিল, বলিল, "রাগ কোরোনা, রাগ কোরোনা, যা বলছ তুমি তাই হবে। ঐ রকম পাথরের মত চোখ করে আমার দিকে তাকিও না, আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যায়" বলিয়া স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল।

অতঃপর বিনতার সাজসজ্জা নির্বিবাদেই সম্পন্ন হইল, এবং হরেন্দ্রনাথের চোখে-মুখেও আর রাগের চিহ্ন দেখা গেল না। গোলাপী বেনারসী ও হীরার গহনায় সাজিয়া বিনতার মনের যা লজ্জা তাহা মনেই রহিয়া গেল। বাহিরে আর প্রকাশ করিল না। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির ভিতর বরযাত্রীর দল বাহির হইয়া পড়িল।

বিবাহ বাসরে তখন মহাভীড়। বরযাত্রীর দলের আশায় সকলে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। রসুন চৌকীর বাজনা, শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির মধ্যে বরযাত্রীরা আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে সুসজ্জিত বরের গাড়ী। দরজা খুলিয়া দিতেই নামিলেন বর, বরকর্ত্তা, রমেশ ও একজন বন্ধু। পরের গাড়ীটা ডাঃ হরেন্দ্রনাথের। অভ্যাগতরা তাকাইল বরের গাড়ীর দিকে, বাড়ীর লোকেরা বেশী করিয়া তাকাইল দ্বিতীয় গাড়ীখানার দিকে। হরেন্দ্রনাথ পুরাতন বন্ধু, সুদর্শন হইলেও, নূতন নয়। সঙ্গিনীটি সুন্দরী ও অতি সুসজ্জিতা, সেও নূতন নয়, কিন্তু আজ নূতন রূপেই আসিয়াছে। সরোজিনী ছুটিয়া আসিলেন অভ্যর্থনা করিতে, "এস ভাই এস, এই ঘরে স্বপ্না আছে।"

বিনতার বড়ই অপ্রতিভ লাগিতেছিল। কিন্তু উপায় ত নাই। তাহার উপর যে ভালবাসা নিত্য বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে সে প্রায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, হরেন্দ্রনাথের সামান্যতম কথাও সে না রাখিয়া পারে না।

স্বপ্না বলিল, "বাবাঃ, যা দেখাচ্ছে। আমার দিকে কেউ আজ আর তাকাবে না।"

বিনতা বলিল, "যার তাকাবার সে ঠিকই তাকাবে। দেখ ভাই কথা দিয়েছিলাম যে বরযাত্রী হয়ে আসব হয়ত তাই এলাম।"

স্বপ্না বলিল, "হ্যাঁ বেশীদিন থাকলে বরযাত্রী হবে বলেছিলে বটে। তা একেবারে চিরদিনের মত থেকে গেলে। তোমার ঠিক গল্পের Cindarella-র মত কপাল।"

রাস্তার ধারে একটা জঙ্গলের পাশে একদল ভবঘুরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দলে মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ে সবই আছে।

শিল্পী বেরিয়েছেন তাঁর বিষয়বস্তুর খোঁজে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়লেন সেই ভবঘুরের দলের সামনে। লক্ষ্য করে দেখলেন তিনি, একটি তরুণী মাতা তার স্তন্যপানরত সন্তানের মুখের দিকে কি আকুল আগ্রহে চেয়ে আছে। শিশুটিও তার মায়ের গলা জড়িয়ে যেন একটি পরম শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—এইভাবে চেয়ে আছে তার মায়ের মুখের দিকে।

শিল্পীর চোখে মাতৃত্ব এক নূতন রূপ নিয়ে ধরা দিল। দৃশ্যটি মনে গেঁথে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন তাঁর শিল্পাগারে।

আজও র‍্যাফেলের ম্যাডোনা জগৎজোড়া খ্যাতি নিয়ে রয়েছে। মাতৃত্বের ছবি অমনটি আর কোথাও নেই।

॥ রবীন্দ্রপাঠচক্র ॥

পরিতৃপ্তিতে গড়া

অবশেষে কঠিন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় ভরা সুদীর্ঘ দিনগুলির অবসান হ'ল। তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। জীবনের সকল দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠভাবে পালন করতে পেরেছেন। এখন মেয়াদ পূর্ণ হওয়া জীবনবীমার পলিসি থেকে একটি নিয়মিত ও নির্দিষ্ট আয় থাকায় তিনি তাঁর অবসর জীবনের দিনগুলিকে সুখ ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন।

আপনার মেয়ের বিয়ে, ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা ও তাদের উচ্চতর কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার খরচপত্র এবং আপনার অবসর জীবনে একটি নিয়মিত সচ্ছল আয়ের ব্যবস্থা করার গুরুদায়িত্ব জীবনবীমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। মনে রাখবেন, এই সমস্ত সুবিধা আপনার জীবদ্দশায় তো থাকবেই আপনার হঠাৎ কিছু একটা হ'লেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

* প্রতি বছর এল.আই.সি. ২৮ কোটিরও বেশী টাকার দাবী মিটিয়ে থাকে। এর মধ্যে ২১ কোটি টাকারও বেশী পেয়ে থাকেন জীবিত বীমাকারীগণ . . .

রবীন্দ্র পাঠচক্র

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (২)

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্য-পাঠকের অভিযোগ এই যে, তাঁহারা সামগ্রিক দৃষ্টিতে কোন কবি-কৃতির বিচার করেন নাই, সমগ্রভাবে কোন কাব্য বা নাটকেরই সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করেন নাই। তাঁহারা কাব্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিটি অংশের অর্থাৎ শ্লোক বা বাক্যের রস, দোষ, গুণ, রীতি, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিলেও কোন কাব্যের উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারেন নাই। যেরূপ সমালোচনাকে নূতন সৃষ্টি বলা যায়, সে ধরণের সমালোচনা হয়তো ভারতবর্ষে ছিল না কিন্তু যে ধরণের সাহিত্যবিচারের -পদ্ধতি ভারতবর্ষে ছিল, তাহার কোন সার্থকতা নাই, এমন কথাও বলা যায় না। আলংকারিকদের আলোচনার ফলেই এদেশের যাঁহারা রসস্রষ্টা তাঁহারা শব্দচয়নে এবং দোষ-পরিহারে অতি মাত্রায় সচেতন হইতেন। অবশ্য, এই আলঙ্কারিক বিধিনিষেধই আবার কবিগণের স্বচ্ছন্দবিহারিণী কল্পনাকে কিছু পরিমাণে ব্যাহত করিত। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষেই আলঙ্কারিকগণ রসজ্ঞতার সঙ্গে সূক্ষ্মদর্শিনী নৈয়ায়িকী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, এদেশে সাহিত্য-বিচারের অর্থ কাব্য-শরীরের ব্যবচ্ছেদ মাত্র (dissection), তাঁহার ভ্রান্ত।

পাশ্চাত্ত্য দেশে সৃষ্টিধর্ম্মী সমালোচনার অভাব নাই। তাঁহারা সমগ্রভাবে কাব্যের বিচার করিয়া কবি-কৃতির মধ্য দিয়া কবির অন্তর্লোকে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছেন, কবির বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গির (style) মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কখনও বা কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনা করিয়া কবি-মানসের অভিব্যক্তির ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন, কেহ বা সাহিত্য হইতে সমাজচিত্র সংগ্রহ বা ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, আবার কেহ বা ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা না-লাগার মানদণ্ডটি আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতির লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রকার-ভেদের (literary forms) সীমারেখা চিহ্নিত করিয়াছেন। আমরা মনে করি, সাহিত্য-বিচারে এইরূপ 'ফর্ম্মুলার' আশ্রয়-গ্রহণ কৃত্রিম ও অনেকাংশে বিভ্রান্তিজনক। এইরূপ 'ফর্ম্মুলা' আয়ত্ত করিয়াই আমরা বলিয়া থাকি, মধুসূদনের মেঘনাদবধ মহাকাব্য হয় নাই, কালিদাসের শকুন্তলা (অন্তত প্রথম চারিটি অঙ্ক লইয়া বিচার করিলে) নাটক হয় নাই, হইয়াছে গীতিকাব্য, আর নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধকাম হন নাই। আমরা এইরূপ মন্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করি না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত কাব্যের দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তেমনি আবার সাহিত্যের প্রকার-ভেদ লইয়াও কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধ-সমূহে আমরা 'সাহিত্যের তথ্য ও সত্য', 'সাহিত্য-তত্ত্ব', 'সাহিত্য-ধর্ম্ম', 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' প্রভৃতি নানা বিষয়ে কবির ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই।

আমরা বলিয়াছি, 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং',—কাব্য বা সাহিত্যের এই সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্যের এই রস নিত্যবস্তু, ইহা দেশ বা কালের অপেক্ষা রাখে না, এইজন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে দেশে বা যে কালেই রচিত হউক না কেন, উহা সকল দেশের সকল কালের রসিকসমাজের উপভোগ্য, অম্লান কুসুমের মালার মত সহৃদয় ব্যক্তি উহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্যিকের লক্ষ্য লোকহিতৈষণা নহে, সাহিত্যসৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টির মতই আনন্দ হইতে উদ্ভূত। সাহিত্য প্রয়োজনের অতীত সামগ্রী। অবশ্য, আমরা সাহিত্য হইতে কোন শিক্ষা আহরণ করিতে পারি না, এ কথা সত্য নয়। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগকে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রেরণা দেয়, এ কথা সত্য, কিন্তু মহাকাব্য হিসাবেই এই দুইখানি গ্রন্থের গৌরব। সুতরাং দার্শনিক, নীতিশাস্ত্রবেত্তা ও কবির লক্ষ্য এক নয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মেঘদূতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কালিদাসের মেঘদূতের মত পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যেরই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে পথের বিচিত্র নয়ন-শুভগ সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত করে আর উত্তরমেঘ আমাদিগকে শ্রেয় বা কল্যাণের পথের নির্দ্দেশ দেয়। 'ভাষা ও ছন্দে' মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—মানুষের ভাষা এতকাল প্রয়োজনের সীমার মধ্যে বদ্ধ ছিল, কিন্তু কাব্যের ভাষা অপ্রয়োজনের ভাষা, সে ভাষা মানুষকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে ভাবের স্বর্গলোকে লইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, আমি অভিনব ছন্দে যে কাব্য রচনা করিব, তাহাতে মহামানবের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিব—

'দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে'।

ভাবাবিষ্ট বাল্মীকি নারদকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—কাব্য যেমন মানুষকে আনন্দ পরিবেশন করে, তেমনই তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে মহৎ করিয়া তোলে, তাহাকে শ্রেয়ের পথ নির্দ্দেশ করে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, যিনি রসসৃষ্টির মধ্য দিয়া লোক-কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, কাব্য আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করে বটে কিন্তু সে উপদেশ কান্তাসম্মিত। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন—'যাহারা অল্পধী, তাহারাও কাব্যের অনুশীলনের ফলে অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারেন। রামায়ণ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয় যে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ প্রভৃতির দৃষ্টান্তই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে, কেননা, উহাই শ্রেয়ের পথ, আর রাবণ প্রভৃতি যে পথে গিয়াছেন, উহা বিনষ্টির পথ। বিশ্বনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনের জন্য একটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্'॥

বেদাদি শাস্ত্র নীরস, সুতরাং যাহারা তীক্ষ্ণধী, তাহাদেরই বহু ক্লেশে এই সব শাস্ত্রের চর্চ্চার দ্বারা চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কাব্য আমাদের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে, সুতরাং যাঁহারা সুকুমারমতি, তাঁহারাও অক্লেশে কাব্য পাঠের দ্বারা চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হইল: যাঁহারা পরিণতবুদ্ধি বা তীক্ষ্ণধী, বেদাদি শাস্ত্র থাকিতে তাঁহাদের কাব্যপাঠে

প্রবৃত্তি হইবে কেন? উত্তরে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যদি এমন হয় যে কটু ঔষধেও যে রোগের উপশম হয়, মিষ্ট ঔষধেও সেই ব্যাধিরই নাশ হয়, তবে মিষ্ট ঔষধ সেবনে কোন্ রোগীর না প্রবৃত্তি হইবে?

রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলিতে চাহিয়াছেন, কবি লোক-কল্যাণ সাধন করেন বটে কিন্তু সে সম্পর্কে কোন সচেতন আদর্শ কবির মনে বর্ত্তমান থাকে না। আর এই কল্যাণের আদর্শ কাব্যের মধ্যে যত বেশি প্রচ্ছন্ন থাকে, কাব্য হয় তত বেশি রসঘন। কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত বা কুমারসম্ভবে মঙ্গলের আদর্শ আছে বটে কিন্তু উহা কোথাও প্রকট হইয়া উঠে নাই, উহা সুন্দরের আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত, ঔপনিষদিক ভাবধারায় নিষ্ণাত, তাই কাব্যবিচারেও তিনি এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। উপনিষদ বলেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'। 'আনন্দ হইতে ভূতগণ জন্ম লাভ করে, তাহারা আনন্দেই বিধৃত, আবার আনন্দেই তাহারা অনুপ্রবিষ্ট হয়।' রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিধাতার সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও আনন্দেরই প্রকাশ, উহা যেন কবির লীলাবিলাস। বিধাতার মনে যখন সিসৃক্ষা জাগে, তখন তিনি বলেন—'একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি'। 'আমি এক আছি, আমি বহু হইব, আমি প্রজা সৃষ্টি করিব'। কবির মনেও বহু হইবার, নিজেকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিবার বাসনা জাগে। আবার উপনিষদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অর্থই নিখিলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ঈশোপনিষদ্ বলেন—

> 'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি।
> সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
> যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ'॥

যিনি সমস্ত প্রাণিবর্গকে নিজের আত্মায় দর্শন করেন এবং নিজের আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। একত্বদর্শী পুরুষ যখন নিজের আত্মায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোক ও মোহের অতীত হন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষ যখন নিজের মধ্যে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলনের প্রেরণা অনুভব করে, তখনই সে বিচিত্ররূপে—কাব্যে, চিত্রে, সংগীতে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে আপনাকে প্রকাশ করে। 'কাব্য…যদি আনন্দের প্রকাশ হয়, তবে সে মৃত্যুজয়ী'।

সাহিত্যের বিষয়-বস্তু কি? স্থূল ভাবে বলা যায়, মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। কিন্তু এই তিনটির বাহিরে তো কোন বিষয়বস্তুই নাই, থাকিলেও তাহা মানুষের চিন্তার অগম্য। সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে শ্রেণীর প্রাধান্য নয়, ব্যক্তিরই প্রাধান্য। বিজ্ঞানে আমরা শ্রেণীবিভাগ (classification) বা জাতি-নির্ণয়ের প্রয়াস দেখিতে পাই, ইতিহাস বা নৃতত্ত্বে নানা জাতির পরিচয় লাভ করি, কিন্তু ব্যক্তিই সাহিত্যের আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তি কথাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে কোন পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট, তাই ব্যক্তি'।

সাহিত্যে অলংকরণ জিনিষটি বাহির হইতে আক্ষিপ্ত নয়, 'অলঙ্কারঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ, অর্থাৎ, অলঙ্কার সাহিত্য শরীরের অঙ্গে কটক, কুণ্ডল প্রভৃতির মত, বিশ্বনাথের এ কথা সত্য নয়, কবিরা ভাব বা অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে গিয়াই বিনা প্রযত্নে অলংকারের আশ্রয় নিয়া থাকেন, তাই আমাদের দেশের অনেক রসগ্রাহী মনীষীর দৃষ্টিতে অলংকার 'অপৃথগযত্ননির্ব্বর্ত্ত্য'।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও রসাত্মক বাক্য ও অলংকৃত বাক্য অভিন্ন।

লালসার বা উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষার অসংযমের দ্বারা যে সাহিত্য বিকৃত, সেই সাহিত্যই বস্তুতান্ত্রিক, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সংযমে ও শুচিতায়। সাহিত্য অবশ্য জীবনকে অস্বীকার করে না বা মানুষের সহজ প্রবৃত্তির প্রতি, তাহার জীবধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করে না। কিন্তু এক কালে বাংলা দেশে এক শ্রেণীর তরুণ লেখক অতি আধুনিকতার নামে সাহিত্যে উদগ্র ইন্দ্রিয়-লালসার 'আমদানি' করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে ও চিন্তার সবলতা আছে, কিন্তু দেশের যথার্থ সমস্যার সঙ্গে ইহাদের যোগ নাই এবং বিদেশী ভাবধারার দ্বারা ইহারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত, তাই ইঁহারা সত্যকারের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইহাদের অধিকাংশই সাহিত্যে 'সহজিয়া' সাধন গ্রহণ করিয়াছেন। এই সহজ পন্থার অনুসরণ করিয়া অপরের কাছে বাহবা পাইবার ইচ্ছাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'সাহিত্যিক কাপুরুষতা'।

আমরা যে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের কথা বলিলাম, তাঁহারা অনেকেই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের (Psycho-Analysis) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মানুষের সকল শুভ বা অশুভ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে আছে কাম বা যৌন লালসা আর এই সত্যটিকে সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করাটাই যথার্থ সাহসের পরিচায়ক। সাহিত্যিকদের এইরূপ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে।'

* মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে—কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। * বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্ব্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে একশ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর করে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ের উপাদান এক কিন্তু প্রকাশ স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী, তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্ব-জগৎটাই সেই চাতুরী।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী নান্‌সেন একদিন বক্তৃতা করছিলেন সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে।

কথা প্রসঙ্গে বললেন: আমি যখন এগিয়ে চলি তখন পেছনের নৌকা পুড়িয়ে দিই, পার হওয়া সেতু উড়িয়ে দিই। পিছু হঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, থাকে কেবল সামনে এগিয়ে যাওয়া।

সমুখে চলার ঐ এক মন্ত্র: বার্ণ দি বোট—পিছনে ফেরার কথা চিন্তা কোরো না।

অর্থনৈতিক আলোচনা

পশ্চিম বঙ্গের খসড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় মোট ৩৪৬'০৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান খাতে নিম্নরূপ ব্যয় ধরা হইয়াছে :

		মোট টাকা (কোটি টাকার হিসাবে)		শতকরা হিসাব
১।	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা	৮১'৪৫	১০৬'৮৭	৩১
২।	সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়	২৫'৪২		
৩।	বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনা	১৯'৩৬	৫৭'৮৬	১৭
৪।	বিদ্যুৎ	৩৮'৫০		
৫।	গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প	১০'৫৯	১৩'১৪	
৬।	শিল্প ও খনিজ	২'৫৫		
৭।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৬'৫০		৮
৮।	সমাজ সেবা	৯৪'৩৮		২৭
৯।	বিবিধ	১'৩৪	৪২'২৮	১২
১০।	বিশেষ পরিকল্পনা	৪০'৯৪		
১১।	দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা	৫'০০		
		৩৪৬'০৩		১০০

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫১'৯ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৫৩'৭ (বিহারের কয়েকটি অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গে যুক্ত হইবার ফলে পরিবর্তিত হিসাবে ১৫৭'৭) কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খুবই বৃহৎ হইয়াছে বলা যায়।

পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ৩০৮'৪ কোটি টাকার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার অতিরিক্ত আরও ৩৬'০৯ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিম বঙ্গের ব্যাপক ঘাটতি পূরণ, দুর্গাপুর অঞ্চলের শিল্প সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না করিয়া উপায় নাই।

মূল খসড়া পরিকল্পনাকে অনুসরণ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাতেও ঘোষণা করা হইয়াছে, (১) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং (২) ইস্পাত, জ্বালানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি মূল শিল্পের সম্প্রসারণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, "ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্পের সম্প্রসারণের দ্বারাই কেবলমাত্র এই তীব্র বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব।" তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পখাতে সর্বমোট ১৩·১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল বালক-বালিকাকে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম বঙ্গে যে সব গুরুত্বপূর্ণ কার্য সুরু করা হইবে, তাহার মধ্যে নিম্ন-লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) দুর্গাপুরে একটি সার প্রস্তুতের কারখানা; (২) দুর্গাপুরে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র; (৩) ব্যাণ্ডেলে একটি উচ্চ পর্যায়ের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র; এবং (৪) কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর এবং কলিকাতা হইতে দমদম পর্যন্ত দ্রুত চলাচলের রাস্তা। রাস্তা দুইটির জন্ম প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

জলঢাকা জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার কাজও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফারাক্কা বাঁধের কোন উল্লেখ খসড়া পরিকল্পনায় নাই।

পরিকল্পনার জন্ম অর্থ সংস্থানের বিষয়ে বলা হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন ১৬০ কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজ্যের বর্তমান অর্থসংস্থানের হিসাবে আরও ৯২·৮১ কোটি টাকা সংগ্রহ করে যাইবে। অর্থাৎ মোট ২৫২·৮১ কোটি টাকার ব্যবস্থা হইবে। ইহার পরেও ৮৮ কোটি টাকার ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্ম একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বৃদ্ধির জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে এবং অপরদিকে রাজ্যে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভদ্রলোকটি পার্কে এসে আর একটি ভদ্রলোকের পাশে বসলেন, ভাব জমিয়ে বেশ হাসিমুখেই বল্লেন—"এক টিপ নস্যি আছে নাকি মশাই?"

—"আজ্ঞে না, এখন ওটা ছেড়েছি, ওটা ছিল আমার পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা।"

—"তা হলে, একটা সিগারেট্?—"

—"আজ্ঞে, সেটাও ছিল বিংশ বার্ষিক পরিকল্পনা। এখন ছেড়েছি।"

—"অন্ততঃ, একটু দোক্তা বা জর্দা?"

—"আজ্ঞে ওটাও ছিল পঞ্চবিংশতি বার্ষিক পরিকল্পনা।"

—তবে পকেটে যদি ফ্লাস্ক থাকে, তবে তার খানিকটা?

—"সেটাও ছিল ত্রিংশতিবার্ষিক পরিকল্পনা—"

—"হতেই পারে না,"—এই বলে প্রথম ভদ্রলোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তির পকেট থেকে ফ্লাস্কটি টেনে বার করলেন।

আটলান্টিক মহাসাগরের মানচিত্র

খাদ্য, খনিজ এবং জ্বালানী দ্রব্যের জন্যে মানুষ আজ হাত বাড়িয়েছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু সে জানে না সাগরের কোন অতলে আছে খনিজ সম্পদ কিংবা কোথায় বিচরণ করছে মৎস্যকুল।

অতএব প্রয়োজন হয়েছে একটি অভিনব মানচিত্র প্রণয়নের। আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বিচিত্র মানচিত্র তৈরী হতে চলেছে। বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসাগরের প্রতিটি অঞ্চলের জলচর প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ এবং সমুদ্র-গভীরে বিভিন্ন পদার্থের স্বরূপ ও তার রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ হবে এই মানচিত্র। সামুদ্রিক ফসল ঘরে তোলার জন্যে যে গবেষণা চলবে তার বিশদ বিবরণ যাচিয়ে দেখা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এখানে প্রাণীতত্ত্ব এবং ভূগোল উভয় শাস্ত্রেরই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কাজেই এ গেল বায়োজিয়োগ্রাফিক্যাল মানচিত্র যা ইতিপূর্ব্বে কোথাও রচিত হয়নি।

এ মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা বোঝা যাবে একটি পরিকল্পনা থেকে। উডস হোল ওস্যানোগ্রাফিক ইন্সটিটিউশনের ডাঃ কলাম্বিস আইসলিন একটি পরিকল্পনার উল্লেখ করেছেন : সেণ্ট লরেন্স উপসাগরের তলদেশে বাতাস পাম্প করা হবে, যদি এর ফলে তলদেশের উষ্ণ সমুদ্রস্রোত ওপরে উঠে আসে তাহলে সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলটি বরফমুক্ত হয়ে শীতকালেও নৌচলাচলের উপযোগী হবে, নোভাস্কশিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের জলবায়ু উষ্ণতর হবে এবং পর্যাপ্ত মাছের ফসল উঠবে ধীবরের জালে।

একটি সঠিক মানচিত্রের সাহায্যে আজ জীবনের মান উন্নয়নের দুরন্ত আশা।

মহাসাগরের বারোশ' ফুট নীচে রয়েছে ম্যাকারেল জাতীয় মাছ। এখন এ মাছ দুষ্প্রাপ্য। মানচিত্রে এ মাছের অবস্থান জানা গেলে মানুষের খাদ্যসমস্যার সুরাহা হবে।

ইউরোপ আমেরিকা এ দুই মহাদেশের মাঝখানে যে লবণাক্ত সমুদ্রের বিস্তার তার অতল রহস্য উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানী। মানুষ আজ আকাশের চাঁদ চায়, রত্নাকরের রত্নও চায়।

আলোকের অতীত আলোক

আমেরিকা যখন মহাসমুদ্রের গভীরে ডুব দিচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া তখন মহাশূন্যে ১০ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব অতিক্রমের আয়োজন করছে। মস্কোর কাছেই একটি নূতন মানমন্দিরে অতি শক্তিশালী এক রেডিও টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ সুরু হয়েছে। এর সাহায্যে ১০ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যাবে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এই গতিতে এক বৎসরে একটি আলোক রেখা যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে বলা হয় এক আলোকবর্ষ বা লাইট ইয়ার।

ব্রিটেনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আধুনিক পর্যায়

পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের একটি ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে ব্রিটেনে। যে দুটি বিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এসেছে তার একটি বার্কলেতে, অপরটি ব্র্যাড ওয়েলে। প্রথমটি থেকে ২৭৫ মেগাওয়েট ও দ্বিতীয়টি থেকে ৩০০ মেগাওয়েট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে। সমগ্র ব্রিটেনের বিরাট চাহিদার বহুলাংশ এর দ্বারাই মিটবে।

পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করার কাজে যে রিয়্যাক্টর তৈরী হচ্ছে তার কাছে কর্মীদের থাকা বিপজ্জনক।

ব্র্যাডওয়েলে একটি ৩০০ টনের মেসিন বসানো হচ্ছে যার দ্বারা কর্মীরা দূর থেকে সমস্ত কাজ চালাতে পারবেন। কর্মীদের সুবিধার জন্য টেলিভিশনও বসানো হচ্ছে।

ক্ষুদ্রাকৃতি রাডার শক্তিকেন্দ্র

বর্তমান জেট প্লেনের যুগে নভোচারী বিমান চলাচল সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে এটি উদ্ভাবিত। একখানি ইটের আয়তন বিশিষ্ট এই যন্ত্রটি বিশ্বের বিভিন্ন বিমানঘাটিতে এবং বিমানের রাডার যন্ত্রে সন্নিবেশিত হচ্ছে, এটির দ্বারা রাডারের সঙ্কেত অনুধাবন শক্তি একশ' গুণ বেড়ে গেছে।

বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোতে যে রেডিও-টেলিস্কোপ তৈরী হচ্ছে তার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করছেন কর্মীরা। একটি শুকনো হ্রদের বুকে এটি গড়ে উঠছে, তিন দিকে সান্টা রোজা পর্বতমালার প্রহরা। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের চলমান গ্রাফে মহাজাগতিক শক্তি বিকিরণের তথ্যাদি রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।
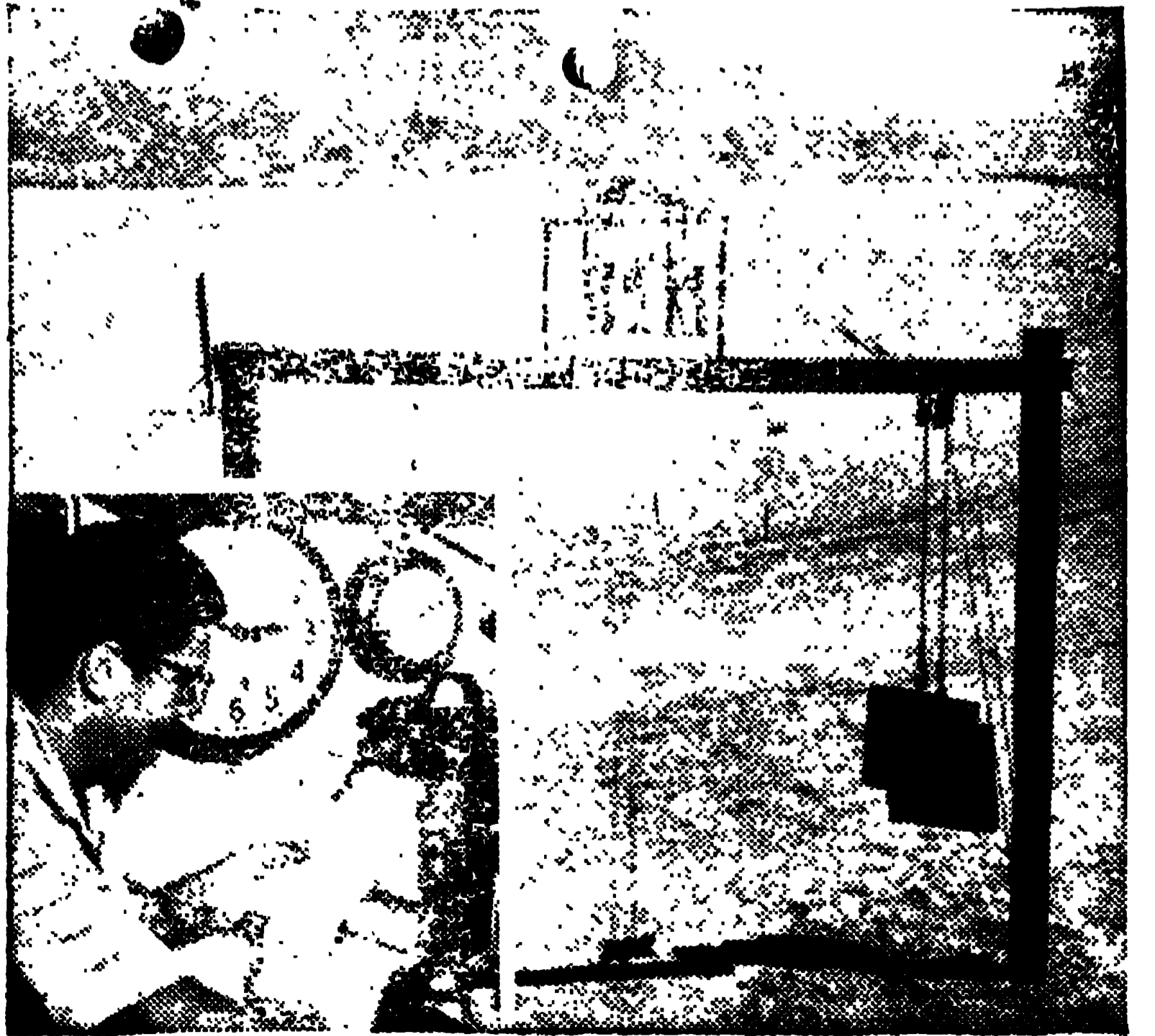
পাকিস্তানী ক্রিকেট দলের আসন্ন ভারত ভ্রমণ

এবারে শীতের মরশুমে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণে আসছেন সে সংবাদ আগেই প্রচারিত হয়েছে। পাকিস্তান দলের নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় ফজল মামুদ। এ পর্য্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নায়কপদে আসীন ছিলেন ভারতীয় প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় আবদুল হাফিজ কারদার। ফজল মামুদও ১৯৪৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণের সময় দলে স্থান লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের জন্য শেষ পর্য্যন্ত দলের সঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

পাকিস্তানের যে দল নির্বাচন করা হয়েছে তাতে ব্যাটিং এবং বোলিং ছাড়াও ফিল্ডিংএ সকলেই পারদর্শী। এছাড়া যাঁর ওপর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শিক্ষাশিবির পরিচালনার ভার পড়েছে, তিনিও এক সময়ে ভারতীয় দলের টেষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর নাম ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ।

গত ১৯৫২-৫৩ সালে যে দল ভারত ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন তার তুলনায় আজ পাকিস্তান ক্রিকেট দল অনেক অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে টেষ্টে হারিয়ে দিয়ে পাকিস্তান যে সমস্ত দেশ ক্রিকেট খেলে সেই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের স্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছেন।

পাকিস্তানী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যে নামের তালিকা লাহোর থেকে প্রচারিত হয়েছে তার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক মন্তব্য হল যে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে এবার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। ফজল মামুদের মত বিখ্যাত অলরাউণ্ডার ছাড়াও দলের সঙ্গে যে চারজন ফাস্ট বোলার আছেন তাঁদের মধ্যে একজন মহম্মদ ফারুক। মহম্মদ ফারুকের সম্পর্কে পাকিস্তানী দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ খুবই উচ্চাশা পোষণ করেন। পাকিস্তান দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী হানিফ মহম্মদ সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া ইমতিয়াজ আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ, আলাসুদ্দীন, ওয়ালিশ ম্যাথিয়াস, সুজাউদ্দীন এঁরা সকলেই শুধু উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম নয়, দ্রুত রাণ তোলার দরকার হলে সমান পারদর্শিতার সঙ্গে উইকেটের চারদিকে মারের খেলা খেলতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এঁরা সকলেই দলের সম্মান রক্ষার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে খেলায় অংশ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান দলের সফরের প্রথম খেলা পুণায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের বিপক্ষে ১৮,১৯ ও ২০শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সফরে পাকিস্তান দল পাঁচটি টেস্ট ছাড়া আরও ৭টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন। আঞ্চলিক খেলার তালিকা বাদ দিলে রাষ্ট্রপতির একাদশের সঙ্গে বাঙ্গালোরের খেলা উল্লেখযোগ্য।

"থ্রোয়িং" সম্পর্কে বিতর্কের শেষ পর্য্যায়

আগে আমরা অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্রিকেট বলের 'থ্রোয়িং' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আম্পায়ারদের "থ্রোয়িং" বল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ নিয়ে যে তুমুল বাক-বিতণ্ডার ঝড় উঠেছে সেটা আপাতত প্রশমিত হয়েছে সাম্প্রতিক এক চুক্তির মারফৎ। খেলার ব্যাপারে, বিশেষ করে

ক্রিকেট খেলায় এই ধরণের চুক্তি একেবারে অভূতপূর্ব্ব। ইংলণ্ডে ভ্রমণরত অষ্ট্রেলিয়ার দলের প্রথম টেষ্ট খেলার আগে পর্য্যন্ত কোনরকম সন্দেহ করে বোলারদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা চলবে না। অর্থাৎ একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে এক পক্ষের (অষ্ট্রেলিয়ার) বোলাররা ভাল করে হাত না ঘুরিয়ে ক্রিকেট বল ছুঁড়ে দেন। আম্পায়ারদের বলা হয়েছে যে সন্দেহজনক বোলারদের সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে। তারপর ঐ সমস্ত বোলারদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কাজেই আমাদের আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

* * * * *

পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড়দের ভারত ভ্রমণ

মাত্র কদিন আগে ভারতে বিখ্যাত পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড়ের দল ভারত ভ্রমণ করে গেলেন। কলকাতায় যাঁরা প্রথম দিন গিয়েছিলেন তাঁরা নিরাশ হলেও দ্বিতীয় দিনে প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলা উপস্থিত ক্রীড়ামোদী দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দিয়েছিল। স্পেনের খেলোয়াড় জিমেনের এবং অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাল এণ্ডারসনের সার্ভিসও দীর্ঘকাল সকলের মনে থাকবে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হবে। আর ডিসেম্বরের শেষে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কলকাতায় টেষ্ট খেলা, সব মিলে শীতের কোলকাতা সর্ব্ব ভারতীয় দৃষ্টিশক্তিকে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ক্রীড়াঙ্গনে স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

খেলাধুলার জগতে হালফিল হামেশা রেকর্ড ভঙ্গের কাহিনী শোনা যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই প্রতিযোগীবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টায় অনুশীলন করে চলেছেন যার দ্বারা পূর্বেকার সমস্ত জয়গৌরব ম্লান হয়ে যায়। এর জন্যে প্রভূত শারীরিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে এবং এই দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা কোন শেষ দেখতে পাচ্ছেন না, অর্থাৎ কোথায় গিয়ে যে এই রেকর্ড ভঙ্গ করার ব্যাপারটি দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারছেন না।

সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে এতে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কিনা। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণালের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমযুক্ত ক্রীড়াচর্চার ফলে পরবর্তী জীবনে হার্টের কোন অসুখ হয় না।

কিন্তু ট্রেনিং এর ফলাফল গবেষণা করে দেখা গেছে যে ট্রেনিং বন্ধ হয়ে গেলে শারীরশক্তির দ্রুত অবনতি ঘটে।

আর একটি পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে যে ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতিলাভের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ট্রেনিং চলা উচিত। কিন্তু জার্ণালের মতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রতিযোগীকে এই আশ্বাস দেওয়া দরকার যে দীর্ঘ-দূরত্বমূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে ধরণের মারাত্মক বিপদ দেখা দেয় এক্ষেত্রে তা হবে না।

অ্যাথলিটদের শারীরিক সহন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় অন্বেষিত হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ এই পথেই এ সমস্যার সমাধান আসবে।

লোকো-বিভূষণ রাইমোহন

সত্যপ্রিয় ঘোষ

বিকেল চারটে নাগাদ লোকো অফিসের কেরাণীদের মধ্যে যখন হাই উঠতে থাকে তখন সেই অবসাদ আর আলস্যের একমাত্র ওষুধ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাইমোহন আঢ্য। তখন লোকো রিক্রিয়েশন ক্লাবের অ্যাকটিং-সেক্রেটারি অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) টেবিল থেকে ইঞ্জিনের হিসেবপত্র দূর ক'রে দিয়ে, ড্রয়ারে ঝোলানো স্লিপের কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে, কলমের উল্টো পিঠ লাল কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে, ঝপাঝপ ঝপাঝপ কতগুলি লেবেল তৈরী করে ফ্যালে। এ কাজ তাকে একা করতে হয় না। কী ক'রে যে খবর হয়ে যায়, পাশের ঘর থেকে সালেক চলে আসে, পাল আসে, এ-ঘরের আসে অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার টু), ননী দত্ত, কবি, অজিত সিন্‌হা, মান্না ইত্যাদি। দু-একজন চাপরাসীও জুটে যায়, দপ্তরী গফুরও হাজির থাকে ঠিক। লেবেল প্রস্তুতির ষড়যন্ত্রটা যথাসম্ভব চুপিসারেই হয়। লেবেলে নানারকম কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি আঁকা হয়—যার যা হাতে আসে, আর লেখা হয় নানান খেতাব, পরিচিতি, উপাধি—ইংরেজীতে, বাংলায়—যার যা মনে আসে, যেমন : ৪২০, সাবধান কামড়ে দেবে, গাধা, শ্রীরাইমোহন দি গ্রেট চামচিকা—ম্যাট্রিক (প্লাক্‌ঠ্‌), ওয়াণ্ডারফুল ক্রিয়েচার অব গড, বিশ্বকর্মার বাইপ্রোডাক্ট, লুজ শান্টিং, আমার নাম অষ্টাবক্র, লোকো-বিভূষণ—ইত্যাদি। তারপর লেবেলগুলি হাতে হাতে ছড়িয়ে যায়। এক হাতে লেবেল অন্য হাতে আলপিন। ওগুলো এখন আঁটা হবে রাইমোহনের কাছায় কিংবা জামার পেছনে, সবাই তক্কে-তক্কে থাকে। গফুর আবার আলপিনের কাজ জানে না, দপ্তরী তো, সে তার লেবেলটায় বেশ ক'রে আঠা মাখিয়ে নেয়, তালেগোলে কেঁটে দেবে রাইমোহনের পিঠে। বেড়াজালের মতো সবাই ঘিরে ধরে রাইমোহনকে। অবকাশ আর আলস্য কোথায় উড়ে যায় মুহূর্তে, রাইমোহন বনাম বাকি সকলের এই হামলায় ঘরের ম্যাড়মেড়ে হাওয়াটা নিমেষের মধ্যেই চাঙ্গা দিয়ে ওঠে, সবাই ফের ঝরঝরে বোধ করে।

লেবেল আঁটার আগেকার কাজ খেপিয়ে তোলা। খেপে উঠলে যখন সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হবে, দাঁতমুখ, খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে আসবে, তখন টকাটক টকাটক লেবেলিং হয়ে যাবে। খেপানোর কাজে সব চাইতে দক্ষ অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান), কারণ সে বলে বড়ো ভালো। বসিয়ে বসিয়ে এমন বাক্যবাণ জোরালো গলায় দূর থেকেই সে ছাড়তে পারে যা একেবারে মোক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই ধুয়া ধরে, পাঁচফোড়ন দিতে থাকে, আর সেই তপ্ত তেলের কড়ার মধ্যে প'ড়ে জ্যান্ত কাটা কইয়ের মতো রাইমোহন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে চেয়ার থেকে।

ঘরের এক কোণের ঘুপচিতে শ্রীরাইমোহনের দপ্তর। ঘুপচি হলেও আপন এলাকার কাছাকাছি হওয়া মাত্র, অফিসাররা আর চীফ ক্লার্ক বাদে, আর সবাইকেই রাইমোহনের কাছে নির্বিচারে বেইজ্জত হতে হয়। প্রবাদ এই যে, ইনিই হচ্ছেন সেই বহু প্রত্যাশিত কল্কি অবতার যিনি কলিযুগে দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন চিরতরে কায়েমী করবার জন্যে ভারপ্রাপ্ত।

এমন যে রাইমোহন সে এ অফিসের ষ্টোর সেকশনের রেকর্ড ক্লার্ক। যত চিঠি আসে তার আগমনী

হিসাব রাখার সুবৃহৎ দায়িত্ব তার স্কন্ধে ন্যস্ত। হাজরে খাতায় তার নামের পাশে চাকরিনামা লেখা আছে 'জে. সি. ডব্লিউ' যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হলেও কেরাণীসমাজে আপাঙ্‌ক্তেয়। তার বয়সের নাকি গাছপাথর নেই কিন্তু সবাই জানে তার চাকরি আর মাস পাঁচেক আছে অর্থাৎ তখন অফিসের ফাইলে তার বয়স পঞ্চান্ন পূর্ণ হবে।

যথানিয়মে আজও সুরু হয়ে গেছে।

অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) কায়দামতো প্রেসিং নিয়েছে। মাঝখানে গোটা-দুই টেবিলের ব্যবধান রেখে রাইমোহনের দিকে মুখ ক'রে সে দাঁড়িয়েছে। শুরু করেছে তেল গরম করা বচন। তাই শুনে শুনে তেল যখন ফুটিফুটি হয়ে উঠবে সেই সময় চাপরাসী নন্দকিশোর বা অন্য কেউ বকের মতো এগিয়ে রাইমোহনকে একটা খোঁচা মারলেই ব্যস অমনি লেগে যাবে—খ্যাঁক ক'রে উঠবে রাইমোহন।

অজিত (নাম্বার ওয়ান) বলছে, 'আচ্ছা গৌতমবাবু, আপনি তো বাঙলায় অনার্স। বলুন দিকিনি রাইমোহনদার যা চ্যাহারা তার সুষ্ঠু ডেসক্রিপশন বাংলা ভাষায় কি সম্ভব ? ধরুন কাউকে যদি বোঝাতে হয় দেখতে উনি কেমনটি, তো দেখছি আইদার ছবি খিঁচে নিতে হবে, অথবা গোবরের ছাঁচে মুখখানা তুলে নিতে হবে। নয় কি ? আপনি কী বলেন ? অ্যাঁ ?'

গৌতম নিরুত্তরে হাসতে থাকে রাইমোহনের দিকে তাকিয়ে।

'বিশ্বকর্মা ওঁকে নিজে-হাতে গড়েনি জানেন তো ?'—অজিত নতুন দম টেনে শুরু করে, 'বিশ্বকর্মা ওয়াজ আদারওয়াইজ বিজি। তার ফ্যাক্টরির এক ক্যাজুয়াল লেবারের হাতে উনি তৈরী। তার নাম উদো। উদো ওঁকে বানাতে বানাতে আন্‌ফিনিশ্‌ট রেখে, গাঁজায় একটু দম দিয়ে নেবার জন্যে বাইরে গেছে, ইত্যবসরে একটা ফিটার সেখানে ঢুকে সেই ইনকমপ্লিট রাইমোহনদাকে দেখেই আঁতকে উঠে দাঁতকপাটি! ব্যাপার দেখে চার্জম্যান তো খুপচুরিয়াস। বললে হেঁকে, অভি হঠাও এই মূর্তি হিঁয়াসে, এত্‌না কদাকার মূর্তি নেই মাংতা। বলতেই, ফিটার-মিস্ত্রি ছুটে এসে দাদাকে আনফিনিশ্‌ঠ্‌ অবস্থাতেই পৃথিবীতে ডেসপ্যাচ করেছে। এই হচ্ছে ওঁর হিষ্ট্রি।'

রাইমোহন একটু নড়েচড়ে উঠলো। নাকের ডগায় ঝুলে পড়া বাইফোকাল চশমার ফাঁক দিয়ে তার চোখজোড়ার খরদৃষ্টি বিদ্যুৎপাতের মতো একবার ঝিলিক মারলো অজিতের দিকে।

অজিত বুঝলো আরো দরকার। নয়তো ঝড় উঠবে না, আকাশে এখনো মেঘ জমেনি, হাওয়া গরম হয়নি। অতএব শুরু করলো, 'আমরা ডি. এম. ই.-র কাছে ওঁর এগেন্‌ষ্টে জয়েন্ট কমপ্লেন করছি জানেন তো ? সার্ভিস রেজিষ্টারে উনি বয়স ভাঁড়িয়েছেন। লোকের একটা ক'রে বয়স থাকে, উনি তিনটে বয়স মেনটেন করছেন। ইস্কুলে—থুড়ি পাঠশালায়—পড়াকলীন একটা বয়স বাপে এসে জানিয়ে গেছলো, বিয়ে বসতে গিয়ে আরেকটা বয়স হ'লো—তিরিশ-পেরনো আইবুড়ো ধাড়ি নিজেকে অক্লেশে তেইশ ব'লে চালিয়ে লবকাত্তিকটি সেজে এগারো বছরের এক ইনোসেন্ট গার্লকে বিয়ে করেছে, তারপর সাত ঘাটের জল খেয়ে রেলে অফিসে এসে বয়স লিখিয়েছে বাইশ—যখন উনি পাকা বিয়াল্লিশ। লোকে সার্ভিস-এজ দু-চার বছর ম্যানেজ করে, কিন্তু ওঁর একদম বিশটি বছর পাষাণ করা আছে। এ লোক-জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের অফিসের প্রেষ্টিজ যে ঢিলে হয়ে যাবে।'

'আরে য্যা-য্যাঃ'—রাইমোহন এবার পেটের অসুখের মতো মুখ ক'রে খিঁচিয়ে উঠলো, 'তোদের আবার প্রেষ্টিজ! আদাড় কোথাকার!'

'হ্যাঁ তাই বটে। প্রেষ্টিজ হচ্ছে আমাদের দাদার!'—সাড়া পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে অজিত ছাড়তে লাগলো, গৌতমবাবু, আপনি তো এ অফিসে নতুন। দাদার রেলের এজেন্ট হবার গল্পোটা শুনেছেন? বলি শুনুন। দাদা ফরিদপুরের অজ পাড়াগাঁর লোক। বার পাঁচেক এনট্রান্স দিয়ে দিয়ে হাপসে গেছে, কিছুতেই আর চৌকাঠ ডিঙতে পারে না, তো বাপ-মা বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছে। বললে, অনেক অন্ন ধ্বংস করেছিস, এবার চরে খাগে যা। কী এমন কথা? দাদা গরম মেজাজে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, ডব্লিউ. টি. মেরে, কলকাতায় এসে পড়লেন। তারপর দু-চার দিনের মধ্যেই দাদা চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে। ঐ চ্যাহারা আর মেজাজ দেখে কোন্ বাপের বেটা আছে দাদাকে নো-ভ্যাকান্সি বলবে? দাদা কলম বাগিয়ে বাপের কাছে চিঠি ঝেড়ে দিলে! রেল কোম্পানির এজেন্ট হইয়াছি। শীঘ্রই বাড়ি যাইবার ইচ্ছা আছে। সেই চিঠি গাঁয়ে পৌঁছতেই আশে-পাশে তিন-চারটে গ্রাম সহ সব বাজার গরম! রেলকোম্পানীর এজেন্ট? বাপরে, সোজা কথা? বাহাদুর ছেলে বটে রাইমোহন, গাঁয়ের অন্ধকারে আটকে থাকতে এনট্রান্সটাও ডিঙোতে পারেনি, কিন্তু কলকাতার আলোতে পা দিতে না-দিতেই রেলকোম্পানির সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসলো? (জানেন তো, রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে আগে এজেন্ট বলা হত) তো রাইমোহনকে রিসিভ করতে স্টেশনে শত শত লোক ছুটে গেছে। ঢাক ঢোল কাড়া-নাকাড়া নিয়ে ছ-বেহারার পালকি রেডি। বাপ নতুন কাপড় আর উড়ুনি গায়ে দিয়ে এসেছে: ছেলে এজেন্ট তার প্রেস্টিজ রক্ষা করা চাই তো। এদিকে ছেলে ট্রেন থেকে নেমেই তো আক্কেল গুড়ুম! ওদিকে লোকেরাও ভেবেছিলো, রাইমোহন সেলুন থেকে চাপরাসীদের কোলে চেপে নামবে—তা না এ যে থার্ড ক্লাসের ডাব্বা থেকে জানালা গলিয়ে ক্রুং করে নামলো। কী ব্যাপার কী ব্যাপার? না তখন প্রকাশ হ'লো যে, রেলের এজেন্ট মানে ঢোলকোম্পানির দাদের মলমের এজেন্ট। সেই চাকরি দাদা পেয়েছে। সাত টাকা থেকে চার আনা করে ইনক্রিমেণ্ট হয়ে বারো টাকা পর্যন্ত গ্রেড। দাদার পকেটে তখন চার টাকা দশ পয়সা খাবি খাচ্ছে। ওদিকে পালকি ভাড়াই লাগবে তিন টাকা আর বাজনার দরুন স'পাঁচ টাকা। কী করা এখন? দাদা তখন প্রেস্টিজ বাড়ালেন কী ক'রে জানেন? উপস্থিত ধোলাইর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সব্বাইকে একটা করে দাদের মলমের কৌটা ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করে দাদা স্রেফ গা ঢাকা দিলেন।

সেকশনসুদ্ধ হাসির হল্লা উঠলো।

রাইমোহন এবার চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'এইটা কি অফিস? না বাগানবাড়ি? স্বরাজ পেয়ে গেছে সব। হ'ত আগেকার দিন, টাইট দিয়ে ছেড়ে দিত, অফিসের মধ্যে হোহো-হিহি বেরিয়ে যেত। ছি-ছি-ছি! ইজ ইট অ্যান অফিস! ছি-ছি-ছি! বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি এই ব্যাভার। কী অধঃপতন। এইজন্যই বাঙালী মরেছে—ব'লে গেছেন সুরেন বাড়ুইজ্যা, রামমোহন রায়, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত।

এইটুকু ব'লেই রাইমোহন চুপ।

ফলে অজিত (নাম্বার ওয়ান) ফের শুরু করলো, 'দাদার ইংরিজি জ্ঞানের হিস্ট্রী শুনেছেন? শুনুন বলি। ঢোলকোম্পানির চাকরি থেকে ডিসমিস হবার পর দাদা নামের পাশে বি. এ. লিখে প্রাইভেট টিউশানি করা শুরু ক'রে দিলে। একদিন ছাত্তর জিগ্যেস করেছে: ম্যাস্টারমশাই, টিকটিকি ইংরিজি কী? দাদা কি দমবার পাত্র, ঝাঁকসে বলে দিলে, লিটুল্ ক্রোকোডাইল। আবার একদিন ছাত্তরের কাকা দরখাস্ত লিখবে তো দাদাকে জিগ্যেস করেছে: ম্যাস্টারমশাই, ম্যানেজার

বানান কী? দাদা বললে: কাকে লেখা হচ্ছে? না, রেলের জি. এম.। তো বললে, তবে দুটো এম্ দিয়ে দিন।

'আর সেই ক্যালকাটা গুড্‌সের গল্পটা?'—অনিল মিত্তির উস্‌কে দেয়।

'জানেন না?'—অজিত গলা আরো চড়িয়ে সুরু করলো, তখন দাদা গুড্‌সে বিজি-সিজন্ টালিক্লার্ক। একদিন মালগুদোমে ডি. সি. এস. গিয়ে উপস্থিত, তখন বড়োমালবাবু সুদ্ধ আর সবাই কে কোথায় দাঁও মারার ফিকিরে আছে, সেই ফাঁকে দাদা বড়োমালবাবুর চেয়ারে চিতিয়ে ব'সে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। ডি. সি. এস. ভাবলে, এইই বুঝি বড়োবাবু। এদিকে হয়েছে কি, গুদোমে প্রচুর আলু জমেছিলো, সেই আলু পচে রস গড়াচ্ছে। সায়েব তো সে দিকে পয়েণ্ট আউট ক'রে ধমকে উঠেছে: ওয়াট ইজ দিস? ধমক দিয়ে দাদা আলুর ইংরিজি ভুলে মেরে দিয়েছে। কী করে বোঝায় এখন? কিন্তু দাদা কি দমবার পাত্র? ঝাঁ ক'রে ব'লে দিলে চোস্ত বিলিতি ঢঙে: স্মাল্‌ম্যান্ অ্যাল্ প্যাপ্‌স্ অ্যাণ্ড ভ্যাপ্‌স্। অর্থাৎ কিনা ষোল মন আলু পচে ভেপসে গেছে। শুনে সায়েবের চোখ ট্যারা। অল্‌রাইট বলে চলে গেলো। দাদা ভাবলো সর্বরক্ষে। কিন্তু পরের দিনই দাদার খবর হয়ে গেলো!'—অজিত চোখমুখ উল্‌টে দাদার খতম হয়ে যাবার ভঙ্গী করতেই সমস্ত সেকশন হাসিতে ফেটে পড়লো।

'ফের বলি শুনুন। ঐ কীর্তির পর দাদা নাম ভাড়িয়ে বেলেঘাটা লোকো শেডে কোল-মুনশীর চাকরি পেয়ে বেধড়ক কাঁচা কয়লা পাচার করতে লেগেছে। তো একদিন এ. এম. ই. সায়েবের ইন্সপেক্‌শন। সায়েব কোল-স্টেজে গিয়ে কয়লা শর্ট দেখে বললে: হোয়াই স্ট্যাক শর্ট? দাদা তখন কোথাও কিছু না পেয়ে ব'লে ফেলেছে: মোষ কয়লা খেয়ে নিয়েছে স্যার। সায়েব ইংরেজ, বাংলা বোঝে না। বললে, ওয়াট্? দাদা তখন মোষের ইংরেজী ভাবছে আর হাত বেঁকিয়ে মোষের শিংটা দেখাচ্ছে, হঠাৎ সেখানে এক মোষের আবির্ভাব, লোকো ইয়ার্ডে অল্প অল্প ঘাস আছে তাই খাচ্ছে। দাদা অমনি চিৎকার দিয়ে উঠছে; দেয়ার দি ট্রানস্লেশন গোজ্ স্যর। প্রেয়ারিং ইন্সট্যান্স স্যর। ইটিং কোল স্যর। ব্যস, বলতেই দাদার কাল হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সালেক গোবেচারীর মতো মুখ করে রাইমোহনের কাছে গিয়ে একটা বিড়ি চেয়েছিলো। চাইতেই রাইমোহন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তাকে তাড়া করেছিলো কিল উচিয়ে। সালেক অমনি এ-টেবিল ও-টেবিলের ফাঁক ফোকর গলিয়ে পালিয়েছে। রাইমোহন চেয়ার ছেড়ে এগোতেই পেছনে ননী দত্ত তৈরীই ছিলো—সে পেছন থেকে দু-বগলে হাত দিয়ে রাইমোহনকে অবলীলায় শূন্যে তুলে ধরেছিলো (রাইমোহনের ওজন তিরিশ সেরের বেশি হবে কিনা সন্দেহ), রাইমোহন ননীকে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে শাস্তি দিয়েছে—কিন্তু এদিকে তার পিঠে লেবেলিং হয়ে গেছে, অজিত ব্যানার্জি (নাম্বার টু) তার কাছায় খাড়া শিংওয়ালা হাট্টিমাটিম্‌টিমের ছবি সেটে দিয়েছে।

লেবেল-লাগানো অবস্থায় রাইমোহন মুখটাকে বমি বমি করে চেয়ারে ফিরে হাঁফাচ্ছিলো।

এই অবস্থায় অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) কদম কদম এগিয়ে গেলো রাইমোহনের দিকে। পালাবার ব্যবস্থা রেখে সে এবার কাছে গিয়েই দাঁড়িয়েছে। শুরু করলো, 'গৌতমবাবু, দাদার জলহস্তী-দর্শনের কাহিনীটা জানেন না তো, না? জবর ব্যাপার। বলি শুনুন। পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের সময় গভর্ণমেণ্ট চারিদিকে লঙ্গরখানা খুলে দিয়েছে। দাদা ফিকির বুঝে বাড়ীতে রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়ে

লঙ্গরখানাতেই খানাপিনা ক'রে বেড়াত। তাতে, মনে আছে তো, সেই সবুজ রঙের হালিমুগের খিচুড়িভোগ আর তরকারি বলতে কচু-ঘেঁচু আর থোড়-বড়ি-খাড়া দিয়ে তৈরী একটা ঘ্যাট। তো একদিন ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে দাদা বেরিয়ে পড়েছে। খিচুড়ি-টিচুড়ি নিয়ে দাদা বলছে কি, যেখানে-সেখানে ব'সে খেলে প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাবে। লাটসায়েবের বাড়ির সামনে ব'সে খেতে হবে। সেখানে গিয়ে আঠারো জন খেতে ব'সে গেলো। খাওয়া দাওয়ার পর দাদা ভাবছে এখন কি করা যায়। উঁকি মেরে হোয়াইটওয়ে-লেড্‌লর ঘড়িতে দেখে নিলে আড়াইটে মাত্র বেজেছে। বল্লে চলো এবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসি। সেই দঙ্গল নিয়ে দাদা একেবারে মাঠ বরাবর চললো চিড়িয়াখানায়। গেটে বললে, আমরা সব লাটসায়েবের জ্ঞাতিগুষ্টি। তাইতে ঢুকতে আর পয়সা লাগলো না। ঢুকে তো দাদা বউ আর সতেরোটা ছেলেমেয়েকে জন্তুজানোয়ার সব দেখাচ্ছে। কেনটা কী জানোয়ার জিগ্যেস করতেই দাদা প্ল্যাকার্ডে লেখা ইংরেজী প'ড়ে প'ড়ে সবাইকে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। হতে হতে জলহস্তীর কাছে এসে পড়েছে। তো বউদি জিগ্যেস করছে, হ্যাগা, ওডা আবার কোন্ জানোয়ার? দাদা লাইফে জলহস্তী দেখেনি। এদিকে নাম যা লেখা আছে তা দাদার উচ্চারণ হয় না। কিন্তু গিন্নীর কাছে প্রেস্টিজ গেলে তো মৃত্যু। তাই দাদা বেমালুম চেপে গিয়ে বললে: চুবছে উঠছে, চুবান খাইছে, কোন্ উটজাতীয় জন্তু হইব। এইটেই ইংরেজীতে লেখা আছে, ঠিক বুঝবা না।

ঘরের মধ্যে আবার একটা হাসির গোলা ফাটতেই রাইমোহন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অজিতকে আক্রমণ করলো।

লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা অজিতের, তার কাছে রাইমোহনকে একটা পোকার মতো দেখতে লাগে। কিন্তু তা বললে কী হবে, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে রাইমোহনের মধ্যে রুদ্রশক্তির ভর হয়। রাইমোহনের তখনকার তেজে কাবু হবে না এমন কেরাণী এখনো রেলে জন্মায়নি।

ফলে অজিত এ-টেবিল ও-টেবিলের ফাঁক গলিয়ে দৌড়চ্ছে এবং রাইমোহন তাকে ধরবার জন্যে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। তার চোখদুটো জ্বলছে দুঃশাসনের রক্তপিপাসু ভীমের মতো। ইতিমধ্যে দপ্তরী গফুর আঠা দিয়ে আরেকটা লেবেল সেঁটে দিয়েছে তার পিঠে।

অনেক চেষ্টা করেও অজিতকে পাকড়াতে না পেরে রাইমোহন খেপা খট্টাশের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে চেয়ারে ফিরে এলো।

চতুর্দিক থেকে তার এই দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতি বর্ষিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে ভুলবার পাত্র রাইমোহন নয়। সে খ্যাঁকখ্যাঁক করতেই লাগলো, থাক থাক, আমি সবাইকেই চিনি। এ অফিসে মানুষ বলতে একটাও নাই, নট এ সিঙ্গল্। সবাই দুর্বৃত্ত। আজ একাদশী, সারাদিন আমি উপাসী। আমার প্রতি এ কি ব্যাভার!'—বলতে বলতে রাইমোহন টেবিলের এপাশে-ওপাশে কী খুঁজতে লাগলো।

খোয়া গেছে বার্লির বোতল। মস্ত একটা বোতলে ক'রে সে রোজ-বার্লি নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে বোতল উপুড় ক'রে ঢকঢকিয়ে সেই বার্লি গেলে। আজ আধ বোতল খাওয়া হয়ে গেছে, বাকিটা রেখেছিলো অফিস থেকে বেরুবার সময় খেয়ে বেরুবে ব'লে। কিন্তু এই হাঙ্গামার সময় সেটি কে গায়েব ক'রে ফেলেছে।

'কী হয়েছে দাদার?'—পরেশ সাঁতরা কোথা থেকে এসে ভালোমানুষ সেজে রাইমোহনেরকাছে

এগিয়ে গেলো, 'অজিত আবার পেছনে লেগেছে বুঝি? রাগেন কেন দাদা। অজিত আপনাকে ভালবাসে তাই অমন করে। আপনিও তো দেখি ওকেই বেশী ক'রে হত্তুকী খাওয়ান। দিন দিন, একটু হত্তুকী দিন তো। আজ সারা দিনে একটুও হত্তুকী পাইনি।'

'তোমাকে দেব পরেশভাই'—রাইমোহন টগবগ করতে করতে বললো, 'তোমাকে দেব। ইউ আর এ জেণ্টলম্যান। কিন্তু আর কাউকে আমি দেব না।'—ব'লে জামার তলাকার মোটা ফতুয়ার পকেট থেকে ছোটমাপের একটা বার্লির কৌটা বের করলো, তার মধ্য থেকে বেরুলো হরীতকী। অল্প একটু খুঁটে নিয়ে সস্নেহে পরেশকে দিলো।

'দাদা, আমাকে?'—অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে গোবেচারী সেজে।

'লজ্জা নাই তোর!'—রাইমোহন গর্জে উঠলো, 'নির্লজ্জ দুর্বৃত্ত কথাকার! আমারে তুই এত যন্ত্রণা দ্যাস, আবার হত্তকী চাস!

'দাদার কাছে ছোটভাই আবদার করবে না?'—অজিত আরো ন্যাকা সাজলো।

'আই অ্যাম নট ইওর দাদা। নো। হটো। হটো হিঁয়াসে। দাদা বলে ডাকিস, কিন্তু কী তোর ব্যাভার! আগে চরিত্র গঠন কর। জাস্ট বিল্ড আপ ইওর ক্যারেকটর, দু-মাস দেখি, তারপরে আই শ্যাল পারমিট ইউ টু কল মি দাদা।'

পেছন থেকে চাপরাসী নন্দকিশোর তার পকেট মারার চেষ্টা করতেই রাইমোহন সপ্তমে চ'ড়ে গেলো, 'তুচ্ছ কীটানুকীট চাপরাসীর এত স্পর্ধা। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি! কালে কালে এ কী হ'লো! ছি ছি ছি! হত আগেকার দিন টাইট দিয়ে ছেড়ে দিতাম। ক্ষীরোদবাবুর আমলে চাপরাসী-ক্লাসকে আমি এমন কণ্ট্রোল করতাম, অফিসের সমস্ত ক্লার্ক আমারে সাপোর্ট করত। আইজকার দিনের মতো কেরানীরা চাপরাসীদের মাথায় তুলে নাচত না! ছি ছি ছি! হিন্দীতে বাত করব, আঙুলের ডগায় ওঠাব-বসাব, তবে তো চাপরাসী। এ কী অনাচার। ক্ষীরোদবাবুর আমলে—

'ক্ষীরোদবাবুর আমলে'—অজিত কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'উনি নিজে কিন্তু ছিলেন লিটারেট দপ্তরী। ষোল টাকা মাইনে। অফিসের সবাই ডাকত ল্যাডার-ম্যান ব'লে। তখন অনেক উঁচুতে র‍্যাক ছিলো তো, মই লাগিয়ে ফাইল নাবাতে হত। ওর কাজ ছেলো সেই মই ঘাড়ে ক'রে দৌড়নো আর তাই বেয়ে উঠে ফাইল খুঁজে খুঁজে বের করা। একদিন দপ্তরী আসেনিকো, দোয়াত কালি দেবে কে? অর্ডার হয়ে গেলো: রাইমোহন সকলের দোয়াতে—'

'হটো হিঁয়াসে'—রাইমোহন সহসা ভীষণভাবে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'হোয়াট ইজ দিস, বড়োবাবু? কাণ্ট ইউ ম্যানেজ অফিস?'

বড়োবাবু সাধারণত এ-সব ব্যাপারে কান দেন না। নিজেও চুপচাপ রগড় দেখেন। কিন্তু রাইমোহন এমন বিশ্রী গলায় চিৎকার করে ওঠার দরুনই হোক অথবা অন্য যে-কারণেই হোক, তিনি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন এবং সবাইকে উদ্দেশ ক'রেই তিনি জোর বকুনি লাগালেন। অজিতকে ডেকে বললেন, সে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং এমনি অবস্থা আবার সৃষ্টি হলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডি. এম. ই.-র কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

মুহূর্তে সমস্ত অফিস ঠাণ্ডা মেরে গেলো। মাছের বাজার সহসা যেন শুদ্ধ গির্জায় পরিণত হ'লো।

তখনো পাঁচটা বাজতে আধঘণ্টা বাকি। অজিতের উদ্যোগে খানিক পরেই পাশের ঘরে সভা ডাকা হ'লো, রাইমোহনের পেছনে লাগা ব্যাপারে যারা অগ্রণী তাদের নিয়ে।

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো, যতদিন পর্যন্ত রাইমোহন সকলের কাছে ক্ষমা না চাইবে ততদিন পর্যন্ত কেউ আর তার পেছনে লাগবে না, সবাই তার সঙ্গে অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যবহার করবে, মোলায়েম ভাষায় কথা কইবে, কেউ তার কাছে হরীতকী কিংবা বিড়ির জন্ম হত্যে দেবে না। তাতে ক'রে অফিসটাকে যদি মরুভূমি ব'লে মনে হতে থাকে তাহ'লে না হয় অন্য কারো পেছনে লাগা যাবে, কিন্তু রাইমোহনের পেছনে আর কিছুতেই না, ভুলেও না।

সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী লুকনো বালির বোতলটা অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হ'লো।

যে কথা সেই কাজ। এ অফিসের ঐক্য—বড়ো মারাত্মক, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সতীন ভৌমিকের ভাষায় 'এ অফিসে ঘাড় শুধু একদিকে হেলে। ফলে রাইমোহন সম্পর্কে সবাই নির্বিকার, উদাসীন হয়ে গেছে। কারণ, হায়, বিনা দরকারে এ সংসারে কে কার ধার ধারে বলো। অদরকারের দরকার সেও তো, একরকমের দরকার। কিন্তু সেদিনের ঐ ঘটনার পরে রাইমোহনের সঙ্গে সকলের সেই 'অদরকারের দরকার'ও চিরতরে ঘুচে গেছে। কেউ আর তাকে ডেকে জিগ্যেস করে না। রাইমোহন কাউকে কিছু জিগ্যেস করলে শান্ত মোলায়েম জবাব পায়। কেউ আর তাকে উত্যক্ত করা দূরে থাকুক, সপ্তাহখানেক অমনি কাটার পরে দম-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া রাইমোহন একদিন অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান)-কে যখন জিগ্যেস করলো, 'কী অজিত ভাই, তোর মেয়ের নাকি অসুখ?'—তখন অজিত যে অজিত সেই অজিতও কিনা ভদ্রতাসূচক কাষ্ঠহাস্য ক'রে বললো, 'এখন ভালোর দিকে। আপনি ভালো? একটু শুকনো শুকনো দেখছি?'—ব'লে উত্তরের প্রত্যাশায় না থেকে সে ব্যস্তভাবে গ্রাফডেস্ক প্যানেলের ইঞ্জিনের নম্বর সাজাতে লাগলো!

আর কত সহ্য করবে রাইমোহন। তার মনের মধ্যে প্রাণের মধ্যে ফাৎফাৎ করে, অফিসের মধ্যে এখন যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। চাকরির বাকি আছে আর পাঁচ মাস মাত্র, কিন্তু এ-অবস্থায় রাইমোহনের আর একদিনও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। কেন যে তার এই দাহ, তাও সে মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না।

দিন দশেকের মাথায় একদিন রাইমোহন সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে পাশের ঘরে ব্যোমকেশ ভৌমিকের শরণাপন্ন হ'লো। কারণ ব্যোমকেশ অফিস-ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

'কী ব্যোমকেশ ভাই, দাদারে আর ডাইক্যা জিগ্যেস করো না, কী এমন অপরাধ করলাম?'—ম্লান হেসে ব্যোমকেশের টেবিলের পাশে এসে রাইমোহন বললো।

'আরে দাদা বসুন বসুন'—রাইমোহনকে টুলে বসিয়ে ব্যোমকেশ বললো, 'হত্তুকী দিন।'

রাইমোহনের চোখেমুখে আভা ফুটলো। বালির কৌটোটি বের ক'রে হরীতকী দিলো। শুধু ব্যোমকেশকেই নয়, ব্যোমকেশের ইশারা পেয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন রাইমোহনকে ঘিরে ধরেছে, তারাও সবাই হাত বাড়াতে রাইমোহন সবাইকেই একটু একটু দিলো। সকলের চোখেমুখে চাপা-হাসি।

'ভালো আছেন দাদা?'—ব্যোমকেশ বললো।

'না রে ভাই'—তোবড়ানো গালে মধুর হেসে রাইমোহন বললো, 'প্যাটটার এইখানে একটা ফিক

ব্যথা কয়দিন যাবৎ। ঐ জন্যই পা তুলে বসেছি। ডাইন পাওটা তুলে বসলে একটু আরাম হয়, প্যাটটায় চাপ পড়ে তো। ঐ জন্য আমি ট্রামের মধ্যেও ডাইন পাওটা তুলে বসি।'

ইতিমধ্যে ব্যোমকেশের ইঙ্গিত পেয়ে পরেশ সাঁতরা চ'লে গেছে শাস্তির দৌত্যে অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান)-এর কাছে। বললো, 'এই অজিত, দাদাকে আর দগ্ধাসনি। বেচারা সারেনডার করেছে।'

'তা'হ'লে আবার শুরু হবে ?'—অজিতও যেন এই সংবাদের অপেক্ষাতেই ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে কুইকমার্চ ক'রে সে পাশের ঘরে গিয়ে পেছন থেকে রাইমোহনের পেটে একটা গোঁত্তা মেরে শুরু করলো, 'কই দাদা, বিড়ি দিন।'

রাইমোহন চিড়বিড়িয়ে উঠলো, 'উঃ। দেখলে দেখলে দুর্বৃত্তর কাণ্ডটা ? এই তো এতগুলি লোক, সবাই জেণ্টলম্যান, তোর মতো অভব্য চাষা তো কেউ না ! আবার বিড়ি চাস ! দাদা ব'লে ডাকিস আবার বিড়িও চাস !'

অজিত খপ্ ক'রে রাইমোহনের পকেট ধ'রে টান মারতেই লেগে গেলো ধস্তাধস্তি। আর চেঁচামেচি। ঘরসুদ্ধ লোকের মন্তব্য আর হাসাহাসি। পেছন থেকে সেই অবসরে রাইমোহনের পিঠে লেবেলিং-ও হয়ে গেলো মুরারি এবং নরেনের তৎপরতায়।

'দাদা ! দাদা !'—রাইমোহন বেবুনের মতো মুখ খিঁচোতে লাগলো, 'আগে চরিত্র গঠন কর তারপর দাদা ডাকিস, তারপর বিড়ি চাইতে আসিস। নির্লজ্জ বেলাহাজ আদাড় কথাকার।'

কিন্তু অজিত নাছোড়। সে বিড়ি নেবেই। রাইমোহন বললো, বিড়ি নেই। অজিত বললো 'চেক ক'রে দেখি।' ফিক ক'রে রাইমোহন হেসে ফেলে: 'দুর্বৃত্ত কথাকার !'—ব'লে সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে তার থেকে একটি বিড়ি সে অজিতকে দিলো।

বিড়ি শুধু দিলেই হবে না, ফের ধরিয়েও দিতে হবে। রাইমোহন দেশলাই জ্বাললো, ধরানোর অছিলায় অজিত ফাৎ ক'রে নিশ্বাস ছাড়লো, আগুন নিবে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে রাইমোহন রেগে আগুন, 'দেখলে ? সবাই দেখলে তো ও কত বড়ো খচ্চর। গরীব মানুষের কাঠি ও কেমন লোকসান করে দেখলে তো ব্যোমকেশ ভাই। তোমরাই বিচার করো।'

'আচ্ছা এবার দম বন্ধ ক'রে ধরাব ! আর একটা জ্বালুন।'

'নো।'—ব'লে রাইমোহন গজ গজ করতে করতে পাশের ঘরে নিজের চেয়ারে চ'লে গেলো।

অজিত পিছু নিলো। শেষ পর্যন্ত আরেকটা কাঠি রাইমোহনকে জ্বালতে হ'লো কিন্তু সেটাও অজিতের মত্ত নিশ্বাসে নিবলো। থাবা মেরে অজিত তখন দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে পালালো।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অজিত শুরু করলো, দাদার কীর্তি শুনুন সবাই। দিনকয়েক আগে দাদা রথ দেখবি চ' ব'লে ছেলেপিলে বউ সব্বাইকে নিয়ে শেয়ালদা-বৌবাজারের মোড়ে রথের টান হয় তো তাইতে গেছে। বেজায় ভিড় ঠেলাঠেলি, বউছেলেমেয়ে তাতে কে কোথায় ছিটকে গেছে হুঁশ পর্যন্ত নেই, দাদা পাঁপর আর জিলিপি কিনে নিয়ে রথে চ'ড়ে খাবে ব'লে পড়ি-কি-মরি অ্যাটেম্পট্ নিয়েছে। কোর্টের সামনেটায় আছাড় খেয়ে প'ড়ে তো জিলিপির হাঁড়ি ফটাস। কাদা থেকে জিলিপিগুলি কুড়িয়ে নিয়ে একে-ওকে গলিয়ে রথে কিন্তু দাদা উঠে ছেড়েছে। উঠে একটেরে ব'সে দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে একহাতে জিলিপি একহাতে পাঁপর তো একবার এতে কামড় একবার ওতে কামড় দিচ্ছে। এমন সময় একটা চিল ছোঁ মেরে জিলিপির ঠোঙা কেড়ে নিয়েছে।'

শুনে রাইমোহন খেপলো না। মিটিমিটি চোখে সে টিপিটিপি হাসতে লাগলো।

'দাদা, ইহা কি সত্য ?'—শ্রীবিশ্বনাথ নাটুকে গলায় জিগ্যেস করলো।

'দুর খ্যাপা !'—রাইমোহন ফিকফিক হেসে বললো, 'শয়তানটার প্যাটে প্যাটে এতও থাকে! বেশ বানাতে পারে !'

'বানানো গল্প ?'—পোড়া বিড়ির টুকরোটা রাইমোহনের টেবিলে ফেলে দিয়ে অজিত খাপ্পা হয়ে বলতে লাগলো, 'আচ্ছা তাহ'লে আরো ফাঁক ক'রে দিচ্ছি শুনুন সবাই। এই বর্ষার সিজ্‌নভর দাদা রোজ ধাপা যাচ্ছে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা। সারা মুখে ফোঁটাচন্দন কেটে নিমাই সেজে যায়। বাসে গেলে টিকিট লাগে, সেইজন্তে শেয়ালদা সাউথ টু ধাপা কর্পোরেশনের ময়লা টানার ট্রেন আছে তাইতে চুপিসারে চেপে চ'লে যায়। ধাপার মাঠে চাষীদের খেতে আড়তে গোলায় গোলায় ছ্রক্ ছ্রক্ ক'রে খঞ্জনি বাজিয়ে দাদা কেত্তন গায় ঘুরে ঘুরে। এক কলি দু-কলি গাইতেই চাষীরা কেউ এক পাজা পুঁই শাক, কেউ চারটি নটে শাক, কেউ একটা লাউ, কেউ বা কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, ঢেঁড়স যার যা আছে খয়রাত করে। সমস্ত জিনিস কালেক্ট করার পরে দেখা গেলো পুরো এক ঠেলা-মতো মাল হবে। তখন ওদেরই কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে একটা ঠেলাও যোগাড় ক'রে নেয়। আবার বলে কিনা, ঠেলে নিয়ে যাবার জন্তে দুটো লোক দাও। ঐ করতে করতে রাত দুটো। সেই ঠেলা নিয়ে দাদা রাতারাতি বৌবাজার কোলে বিল্ডিং-এ চ'লে যায়। ভোর চারটে নাগাদ পাইকিরি রেটে সব বিক্রি ক'রে দিয়ে দাদা পকেট বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফেরে !'

রাইমোহন তখন বিড়ি টানছে বুঁদ হয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে।

অজিত গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, 'এই বর্ষার সিজ্‌নে দাদার বাড়িতে কেউ যাবেন তো দেখতে পাবেন দাদা তিনটে চৌবাচ্চা খুঁড়ে রেখেছে। তাতে ক্লাক-ওয়াইজ মাছ জিয়ানো হয়। একটাতে শুধু কই, একটাতে শিং-মাগুর, আরেকটাতে শোল-ল্যাটা। এসব মাছ যোগাড় হয় কোত্থেকে বলুন দিকিন ? ধাপা। ফিরবার আর ছুটির দিনে দাদা ছিপ নিয়ে চললো, সারা বর্ষার সিজ্‌ন। সেখানে গিয়ে ঘাসবনে পা ডুবিয়ে ছিপ নাচিয়ে নাচিয়ে মাছ ধরবে। একদিন একটা কই মাছও টোপ গিলেছে, ওদিকে একটা দাঁড়াস সাপ দাদার পায়ের বুড়ো আঙুলটাকে ব্যাঙ মনে ক'রে কামড়েও ধরেছে। কিন্তু দাদা সাপে কামড়ানো অগ্রাহ্য ক'রে আগে মাছকে তুলছে। বলুক দিকিনি এও বানানো গপ্পো !'

ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে রাইমোহন হাসতেই লাগলো। আজ আর সে কিছুতেই খেপবে না বলে পণ করেছে যেন।

কিন্তু রাইমোহন না খেপলে অজিতের শান্তি নেই। সে এবার বর্ষা ছেড়ে শীতের প্রসঙ্গ তুললো। রসিয়ে রসিয়ে বললো, সারা শীতকাল দাদার হাতে একটা মাথা-বাঁকানো ছড়ি দেখা যায়। তাই দিয়ে নাকি সে ধাপার খেত থেকে অন্ধকারের মধ্যে কপি চুরি করে।

গরম হওয়া দূরে থাক, রাইমোহন এবার রসাবেশে কীর্তন ধরলো :

'কার যেন ভরা খেতে রে আমি দিয়াছিলাম হাত
সেই পাপেতে ছেড়ে বুঝি গেল প্রাণনাথ।
ও-ও-ও আমায় পাগল কৈরা গেলারে প্রাণনাথ—'

শ্রীবিশ্বনাথ নাটুকে গলায় ধমকে উঠলো, 'হোয়াট ইজ দিস ! ইজ ইট নট অ্যান অফিস !'

'অফিসের তো ইজ্জৎ ঢিলে ক'রে দিলে'—ব'লে অজিত হঠাৎ লক্ষ্য করলো রাইমোহনের চেয়ারের পিঠে একটা গামছা। আর যাবে কোথায়, অজিত চেঁচিয়ে উঠলো, অফিসে গামছা শুকনো? গোরুর গা পুঁছে শুকোতে দিয়েছ নাকি অ্যাঁ?'

'অফিসে গোরু কোথায়?'—সতীন জিগ্যেস করলো।

'নিজেই তো একটা। শেডে থাকাকালীন চেয়ার তো দূরস্থান, টুল বা ভাঙা বেঞ্চিও দাদা এন্টাইটেল্‌ড্‌ ছিলো না। ষ্টোরশুদমে ইঞ্জিনের বাক্সর প'ড়ে থাকে তো তাই চেপে বসতে হত। আর অফিসে এসে ফোকটে চেয়ার পেয়ে গিয়ে তাতে গামছা শুকোচ্ছে! মানসম্মান আর থাকলো না কিছু অফিসের!'

'মানের গলায় ছাই ঢেলে দে'—রাইমোহন বললো বড়ো-বড়ো চোখ ক'রে, 'ব'লে গেছেন গুরুসদয় দত্ত। মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে দে!'—ব'লে সে গুরুসদয়ের উদ্দেশ্যে বারংবার নমস্কার ঠুকলো।

বচনে কাজ হচ্ছে না দেখে অজিত হঠাৎ লাফিয়ে প'ড়ে রাইমোহনের আঙুল থেকে ঢলঢলে আংটিটা টেনে খুলে নিয়ে পালালো। অষ্টধাতু বসানো মাঝখানে দেবনাগরী অক্ষরে তান্ত্রিক লেখা পেতলের আংটি, রাইমোহন কালীঘাট মন্দিরে মন্ত্রপুত ক'রে এই আংটি ধারণ করেছে। আংটি নেওয়াতে রাইমোহন চটলো, কিন্তু কী কারণে কে জানে, সে চেঁচামিচি করলো না। গুম হয়ে রইলো।

এবার অজিত আরেকটা গল্প ছাড়লো, 'গৌতমবাবু হিন্দু হয়ে দাদা গোহত্যার পাতকী, জানেন তো? দাদার বকনা গাই ছেলো একটা। পাঁচ-ছ সের করে দুধ দিত। কিন্তু উপযুক্ত রকম খেতেটেতে দিত না সেটাকে, খচ্চা হবে যে। অর্ধাহারে গোরুটা ব্যাধিতে প'ড়ে গেলো। পশু চিকিৎসালয়ে খোঁজ করা হ'লো। বেলগাছিয়ায় কোন বেড খালি নেই আর বালিগঞ্জেরটায় একটা খালি আছে কিন্তু সেটা ফ্রি-বেড নয়কো, দশ টাকা দিলে তবে পেশেণ্ট ভর্তি হবে। দশ টাকার মায়া ছাড়াতে ছাড়াতে গোরুটারই প্রাণের মায়া ছেড়ে গেলো। মরা গোরু নিয়ে দাদার তখন আরেক ফ্যাসাদ। কলকাতায় গোরু ফেলার জায়গা নেই কো, কী করা যায়? কর্পোরেশনের গাড়ীতে জমা করতে গেলে আট-দশ টাকার মামলা। দাদা তখন ডেড অব নাইটে মরা গোরুটা রাস্তার ওপারে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখলো—বেওয়ারিস মাল হয়ে গেলো আর কি!'

'অতো বড়ো ধুমসো মরা গোরু দাদা একাই বইতে পারলো?'—কানাই বোস জিগ্যেস করলো।

'একা কেন। চার ছেলে তিন মেয়ে আর তিন জামাই রয়েছে কী জন্যে? সবাই মিলে ধরাধরি—'

রাইমোহন সহসা রামপ্রসাদী সুরে গান ধরলো:

'যত বানর রূপে এ ভবে জীবের আগমন,
যেমন ইচ্ছে হয়েছে কিম্বা হতেছে পাছে তার মতন—
অঅঅঅঅঅঅন।

যত বানর রূপে—

'বড়োসাহেব! বড়োসাহেব।—হঠাৎ ঘরের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত চিৎকার।

ডি. এম. ই. ততক্ষণে ঘরের একেবারে মধ্যে। রাইমোহনের গানে সবাই (বড়োবাবুসুদ্ধ) এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিলো যে কোন ফাঁকে ডি. এম. ই. ঘরে ঢুকে পড়েছেন, কেউ খেয়াল করতেই পারেনি। অনেকেই রাইমোহনের চারপাশে জমাট বাঁধা অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলো। এ অবস্থায় ডি. এম. ই. দর্শনে

হঠাৎ তড়িতাঘাতে সকলের যেন একসঙ্গে মৃত্যু ঘটলো, যে যেখানে ছিলো সে সেই অবস্থাতেই ফ্যাল-ফেলিয়ে রইলো।

কিন্তু ডি. এম. ই. বেরসিক নন। স্মিত মুখে তিনি রাইমোহনের কাছে এলেন, রাইমোহন তখন রামভক্ত হনুমান অবস্থায় জোড়হস্তে কম্পমান। ডি. এম. ই. বললেন, 'কী থামলেন কেন? চলুক না। কী গান হচ্ছিলো?'

'এই না—আইজ্ঞা একটু সাধন ভজন—আইজ মনটা বড়ো উচাটন ছিলো তাই স্বর'—রাইমোহন জোড়হস্তেই উত্তর দিলো।

'বটে! আপনার নামটি যেন কী?'

'আইজ্ঞা শ্রীরাইমোহন আঢ্য।'

'রাই-মোহন! বটে! সখীটখী আছে নাকি?'

'আইজ্ঞা এখন আর নাই'—বিগলিত বিনয়ে রাইমোহন জানালো।

'নাই কেন? আবার করুন?'—ব'লে ডি. এম. ই. হাসলেন।

সেই হাসি দেখে ঘরের অন্য কেরাণীরা (বড়োবাবু বাদে) ইতিমধ্যে বেঁচে উঠেছে।

ডি. এম. ই. এবার অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান)-এর দিকে ফিরে বললেন, 'এক কাজ করুন, রিক্রিয়েশন ক্লাবের থেকে একটা আসর জমিয়ে দিন একদিন। অফিসেই হবে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে। তাতে রাইমোহন কীর্ত্তন গাইবেন। 'কী?'—রাইমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'খোল-করতাল আছে তো? সব নিয়ে আসবেন।'—ব'লে ডি. এম. ই. হাসতে হাসতে নিজের চেম্বারে চ'লে গেলেন।'

'যত বানর রূপে'—দুহাত তুলে নিমাই হয়ে রাইমোহন ফের সুর ধরলো চাপা গলায়।

সৃষ্টি

বিখ্যাত ভাস্কর গুটজন বর্গলাম-এর অক্ষয় কীর্তি হোল লিঙ্কনের প্রস্তরমূর্তি।

ঐ কাজের উদ্দেশ্যে একটি মার্বেল পাথর আনা হয়েছে। শিল্পী রোজ একটু একটু করে কাজ করেন। একটি নিগ্রো মেয়ে রোজ আসে স্টুডিয়োতে। মেঝেময় ছড়ানো পাথরকুচি কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

মেয়েটি তার কাজের কাজ করে যায় রোজ, সে আর তাকায় না আসল পাথরটির দিকে।

হঠাৎ একদিন তার চোখ পড়ে গেল। তখন কাজ শেষ হয়ে গেছে। নিগ্রো মেয়েটি অবাক হয়ে ছুটে গেল শিল্পীর একান্ত সচিবের কাছে, জিজ্ঞাসা করল অধীর আবেগে: ঐ কি লিঙ্কন?

—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি!

—হয়েছে কি? বর্গলাম মশায় কি করে জানলেন যে ঐ সমস্ত পাথরটার ভেতর লিঙ্কন লুকিয়েছিল?

বিস্ময়ে ফেটে পড়ল মেয়েটি।

সৃষ্টির মন্ত্র জানলে শিলা হয়ে ওঠে শিল্প……

জাল-ওষুধ

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

সঙ্ঘমিত্রাকে বলেছিল মঞ্জুলিকা অসিত সেনের কথা। আর্দ্র চোখ দুটি তুলে বলেছিল, সোনার ঝিনুকে দুধ খাবার ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি মিত্রা। জীবনে দুঃখ কষ্ট সহেছি অনেক। কিন্তু এত বড় দুঃখ আমি ভোগ করিনি কখনও। কিন্তু এর জন্য আমি এতটুকু ক্ষোভ করব না, এ দুঃখ সাধনাকে আমি অঙ্গের ভূষণ বলেই মেনে নেব, যদি জানতে পারি তিনি বিন্দুমাত্রও তৃপ্তি পেয়েছেন আমার এ সাধনায়। মঞ্জুলিকা থামে। তারপর আবার বলে, মনে পড়ে প্রথম যে দিন তিনি এলেন এ অপিসে সে দিনের কথা। সে দিন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কোন দেশের এক রাজপুত্র পথ ভুলে এসে পড়েছেন এখানে। তাই বার বার চুরি করে দেখেছিলুম তাঁকে।

সঙ্ঘমিত্রা মুচকি হেসে বলে, প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রেম।

মঞ্জুলিকা বলে, প্রেম নয়, ভাল লাগা।

সঙ্ঘমিত্রা উত্তর দেয়, ভাল লাগার ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠাই ভালবাসা।

মঞ্জুলিকা সে কথায় কান দেয় না। বলে, এমন পুরুষ আছে যাকে দেখতে সত্যিই ভাল লাগে।

—লাগে! সঙ্ঘমিত্রা তেমনিই মুচকি হেসে বলে, আর তারাই উত্তরকালে হয় পরম পুরুষ।

মঞ্জুলিকা এক মুহূর্ত কথাটিকে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে, জানি না। তবে ভাল লাগত তাঁর ঐ ভাবে ভরা-চোখ দুটি। যেন সংসার বৈরাগ্যের সব কিছু উপকরণকে তার মধ্যে ধরে রেখেছিলেন তিনি।

—তাই তাকে সংসার অনুরাগী করবার এই প্রচেষ্টা তোমার।

—মানুষের বাসনার অন্ত নেই মিত্রা, তার চেষ্টারও বিরতি নেই। তবে মজা এই, সব প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। একটু থেমে আবার বলে, দুবছর আগে এই নভেম্বর মাসে যে চেয়ারখানা আজ অধিকার করে বসে আছ তুমি, সেইখানা অধিকার করে এসে বসলেন তিনি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান রইল দু'হাতি এই টেবিলটা। আর মাঝখানে উঁচু করা এই টাইপ মেসিনটা। দু দিন আলাপাকাঙ্ক্ষী মন অদম্য বাসনা চেপে রইল চুপ-চাপ। কিন্তু তৃতীয় দিনে বাসনা মিটল। তিনিই উঠে এলেন আমার পাশটিতে। আলাপের সূত্রপাত করে বললেন, একই অফিসে যখন কাজ, একই ঘরে যখন বাস, তখন চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকাটা শোভনীয় নয়।

শুনে খুশিই হলুম। প্রত্যুত্তরে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসলুম মাত্র।

অসিত সেন বললেন, দু-দিন জয়েন করেছি অফিসে। কিন্তু এসে পর্য্যন্ত অবাক হয়ে গেছি আপনার কাজের বহর দেখে। দুটি হাতের আর বিরাম নেই। সমানে নেচে চলেছে মেসিনের ওপর। কাজও কম নয়।

এবারও স্মিতমুখে মুখ তুলে তাকাই, কিন্তু বলি না, এ একদিনের কাজ নয়। কামাই করেছি, তাই কাজ জমে উঠেছে।

সেন বললেন, অথচ আমি ঠায় বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি। সময় কাটতে চায় না। যদি আপত্তি

না থাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। এবার বলি, ধন্যবাদ। এতখানি উদারতার কাছে কারো যে আপত্তি থাকতে পারে এ আমি মনে করি না।

তিনি বলেন, টাইপ জানি বলে নিজেকে জাহির করতে চাই না। বাড়ীতে একটা মেসিন আছে, তারই ওপর ঠোকাঠুকি করি মাত্র। মনে মনে একটু গর্বের হাসি হাসি। এ এক আঙুলে সখের টাইপ করা নয়। অফিসের কাজ। ভুলচুক হলেই সর্বনাশ। হয়ত একটু দ্বিধার ভাব মনের মধ্যে জেগেছিল। সেটুকু বুঝতে পেরেই তিনি বললেন, ভাবছেন যদি ভুল হয়। কিন্তু আপনার মত পাকা লোক যখন কাছে আছে, তখন ভুল সংশোধন করে নিতে কতক্ষণ!

এবার সঙ্ঘমিত্রা বলে, কি খোসামুদে লোকরে বাবা। গোড়া থেকেই খোসামোদ! গলে জল হ'য়ে গেলে নিশ্চয়ই?

মঞ্জুলিকা বলে, খোসামোদে ভগবান তুষ্ট মিত্রা, আমি ত ছার। তবুও কুণ্ঠিত হয়ে বলি, আপনাকে কষ্ট দেব আবার।

বলেন, কষ্ট নয়, বরং ইষ্ট। আচ্ছা আপনিই বলুন ত, পুরুষ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে বসে থাকি কি করে? দুদিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এ ঘরে কোথায় যে কি আছে, আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, খড়খড়ি থেকে ইস্তক কড়ি-বড়গাগুলির পর্য্যন্ত অস্তিত্ব সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করুন, আমি গড় গড় করে বলে যাব সব।

বললুম, নতুন লোক, তাই কাজকর্ম্ম এখনও এসে পৌছয়নি আপনার টেবিলে। একবার আসতে সুরু করলে অস্থির হয়ে পড়বেন তখন।

সহাস্যে বলেন, এ রকম সুস্থিরের চেয়ে অস্থিরই আমার ভাল।

সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে, কাজপাগল লোক বল?

মঞ্জুলিকা মাথা নেড়ে বলে, তাই। কিন্তু ভাবনা হ'ল মেসিন ছেড়ে দিয়ে। অফিসের কাজ, ভুল-চুক হলে মুস্কিল হবে আমারই। তাই ফিরে ফিরে দেখছিলুম বার বার। বুঝলুম স্পীড বেশী না হলেও আগ্রহ বেশী। এক এক খানা চিঠি শেষ করেন আর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, দেখুন চলবে কি না।

সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে, কি দেখলে, চলবে?

—না চলে উপায় কি? খুঁত ত নেই কিছু। ভেবেছিনু আনাড়ী লোক, ভুল হবে নিশ্চয়ই। তখনই উপদেশ দিয়ে দেব কিছু। কিন্তু দেওয়া হল না। তাই চিঠি থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলি, চলবে। এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করতে পারেন কর্তৃপক্ষীয়েরা। তারপর কাজের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে হৃদ্যতা বেড়ে ওঠে। সঙ্কোচ কমে আসে।

সঙ্ঘমিত্রা ভাল মানুষের মত বলে, আর মনের সুকুমারবৃত্তিগুলিতে দোলা লাগে।

মঞ্জুলিকা ম্লান হেসে বলে, মেয়ে টাইপিষ্টের জীবনে সুকুমারবৃত্তি বলে কিছু কি আছে মিত্রা? আর যদিও বা থাকে, তারা আবর্জনার স্তূপের তলায় কোথায় যে আত্মগোপন করে থাকে তার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

—যায়। শুকনো আবর্জনা, তার ভার নেই। বসন্তের একটা ফুৎকারেই যখন সব উড়ে যায়, অস্তিত্ব তখন ধরা পড়ে।

—হয়ত পড়ে। কিন্তু সে বসন্ত মেয়ে কেরাণীদের জন্যে নয়। তার পাত্রপাত্রী রূপ রস সব

আলাদা। কিন্তু ও কথা থাক। ভদ্রলোক আমার উপকার করেছেন অনেক, কাজও করে দিয়েছেন অনেক।

—পারিশ্রমিকও নিশ্চয় পেয়েছেন অনেক।

—না। সেইখানেই আমার দুঃখ। চাইলেই পেতে পারতেন অনেক। কিন্তু নিস্পৃহ লোক। চাইবার অবকাশ হ'ল না তাঁর।

—আশ্চর্য্য!

—আমিও কম আশ্চর্য হইনি মিত্রা। সময় সময় নিজের কাঙ্গালপণায় লজ্জিতও হয়েছি। কিন্তু বৈরাগী মনের তল পেলুম না। বড় গভীর।

সঙ্ঘমিত্রা হাসে। বলে, পাকা ডুবুরী নও, তাই তল পাওনি। নইলে পুরুষের মনের তল পায় না মেয়েরা, এ কেমন কথা?

—সত্যি কথা মিত্রা, এ মনের তল নেই। এ অতলান্ত মন। কোন ডবুরীরই সাধ্য নেই এর তল পাওয়া।

সঙ্ঘমিত্রা বড় বড় চোখ মেলে একবার তাকিয়ে দেখে মঞ্জুলিকাকে। তারপর প্রশ্ন করে, তুমি চেষ্টা করছিলে মঞ্জু?

মঞ্জুলিকা উত্তর দেয় না। নত মুখে বসে থাকে।

সঙ্ঘমিত্রা বলে, অতলান্ত মন যাদের, তারা লোক ভাল নয়। মনের মানুষ তারা হতে পারে না কোন দিন।

মঞ্জুলিকা বলে, অভিজ্ঞতামূলক আমার জীবন নয় ভাই মিত্রা, পুরুষ চেনার ব্যাপারে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, অসিত সেন লোক খারাপ নন। তাঁর প্রাণ আছে।

—প্রমাণ পেয়েছিলে?

—পেয়েছিলুম। মণিমালার ব্যাপারে।

—মণি-মালা? সঙ্ঘমিত্রা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মঞ্জুলিকা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। বলে তাকে কেন্দ্র ক'রেই অসিত সেনের এই বিচিত্র কাহিনী। একটা সকরুণ ইতিহাস। এ থেকে মুক্তি না পেলে—।

মঞ্জুলিকা আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে, না পেলে কি হবে মিত্রা, আমি জানি না। তবে সুস্থ জীবন যে আর ফিরে পাবেন না কোনদিন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সঙ্ঘমিত্রা বলে, আশ্চর্য! কিন্তু এমন কি ঘটনা মঞ্জু, যা একজন মানুষের সারা জীবনকে পঙ্গু করে রাখতে পারে?

—মানুষের জীবন বড় বিচিত্র মিত্রা। সহস্র আঘাতে যে থাকে অটল সামান্য ফুলের আঘাতেই সে মূর্চ্ছা যায়। হয়ত মর্মে গিয়ে এ আঘাত বেঁধে বলেই এ হয়ে ওঠে মর্মান্তিক। এমনি এক মর্মান্তিক আঘাত তাঁর জীবনকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে।

সঙ্ঘমিত্রা কোন প্রশ্ন করে না বটে কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

মঞ্জুলিকা বলে চলে, ছোট্ট একটি সংসার—দু ভাই, মা আর বোন। অভাব-অনটনের সংসার হ'লেও আনন্দের সংসার। সারস পাখীর ডানা দিয়ে মা তাদের আগলে রেখেছিলেন। অনটনের কোন কথাই

জানতে দেন নি একটি দিনের তরেও। কিন্তু প্রকাশ পেয়ে গেল যখন বড় ছেলে পাস করলেন বি. এস-সি। তখন থেকেই তাঁকে দাঁড়াতে হ'ল 'অন্নচিন্তা চমৎকারার' মুখোমুখি হ'য়ে। সেন বলেন, আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়, যে দিন মা প্রকাশ করে বললেন সব কথা একটি একটি করে। বিরাট ঋণজালে আবদ্ধ ছোট্ট এই সংসার। ভদ্রাসন যায় যায়। অপগণ্ড দুটি ভাই বোন, অসহায় মা, আর সবচেয়ে অসহায় আমি। অপেক্ষা করতে পারলুম না। ছুটে বেরিয়ে পড়লুম এবং হাতের কাছে যা পেলুম তাই আঁকড়ে ধরলুম।

পেলেন মাড়োয়ারী ওষুধের দোকানে চাকরী। জাল ওষুধ, বিলিতী শিশিতে ভর্তি করা। বিলিতী ওষুধ বাজারে দুষ্প্রাপ্য। চোরা বাজারে এগুলিই বিলিতী ওষুধের চেয়ে চড়া দামে বিকোয়। আর অজ্ঞ মানুষ বিলিতী ভ্রমে এ গুলিকেই কিনে নিয়ে যায় হাসি মুখে। বিবেকহীন মাড়োয়ারী, পরকাল জানে না। ইহকাল নিয়েই তুষ্ট। রামজিকে স্মরণ ক'রে ব্যবসা চালায়। হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা ধরমশালা, অথবা রামজির মন্দির বানিয়ে পাপ স্খালন করে। এরই কাছে বছর দুয়েক কেটে যায়। ব্যবসার যা কিছু খুঁটিনাটি সব জানা হয়ে যায় সেনের। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর প্ররোচনায় নিজেই এই ব্যবসায়ের একটা পত্তনি দেন।

সঙ্ঘমিত্রা শিউরে উঠে বলে, এই জাল ব্যবসার? ছিঃ!

আমিও বলেছিলাম, ছিঃ। তিনি নিজেও বলেছেন, ছিঃ। কিন্তু না করেও উপায় ছিল না। তিনি বললেন, বন্ধুর প্ররোচনা আর সর্বগুণনাশী দারিদ্র্য প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে আমায় ঠেলে দিল ঐ পথে। পৈতৃক বাড়ী গেল বিক্রী হয়ে। যেটুকু সম্বল ছিল, আদালত আর পাওনাদারেরা চেটে-পুটে খেয়ে নিল সব। সে দিন রাত্রে বাইশ তেইশ বছরের যুবক আমি মা, ভাই, বোনের হাত ধরে নিঃসম্বল এসে দাঁড়ালাম রাস্তায়। সেইদিনই আমি বিসর্জন দিলাম আমার মনুষ্যত্বকে, রুচি, শৈলী, বিবেক সব কিছুকে। পত্তনি দিলাম এই অসাধু ব্যবসার।

মঞ্জুলিকা থামে। তারপর আবার বলে, অসাধু ব্যবসা কারো সয়, কারো সয় না। ওনার সইল না। কিন্তু খেসারত দিতে হল অনেক।

—খেসারত মানে লোকসান? সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে।

—না। এ আর্থিক খেসারতও নয়, এ মানসিক। আর এর জন্যে দায়ী মণিমালা। হয়ত তারই অভিশাপের ফল। তাই আজ তিনি উন্মাদাশ্রমে।

সঙ্ঘমিত্রা চমকে উঠে বলে, উন্মাদাশ্রমে? বল কি?

মঞ্জুলিকা শ্রান্ত কণ্ঠে বলে চলে, মণিমালাকেও দোষ দি না। সে আঘাত পেয়েছে, সহে গেছে। প্রত্যাঘাত করেনি, ক্ষমাও করেনি। এই ক্ষমা না পাওয়ার মধ্যে ব্যর্থতা, তাই বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল আর এক জনের পক্ষে। চিত্তের ভারসাম্যে বিশৃঙ্খল ঘটিয়ে, বিপর্যয় ডেকে আনল মনরাজ্যে। আমি চেষ্টা করেছিলাম, মিত্রা, ভারসাম্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যথাসাধ্য করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি।

সঙ্ঘমিত্রা অবাক হয়ে যায়। প্রশ্ন করে, তুমি চেষ্টা করেছিলে দুজনার মিলন ঘটাতে মঞ্জু?

মঞ্জুলিকা বলে, মিলন নয়, সমন্বয়। একের ক্ষমা অপরকে পাইয়ে একটা সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলাম।

—তাতে তোমার লাভ?

—লাভ? আজ এত বড় ট্র্যাজেডি হয় ত ঘটত না মিত্রা। মঞ্জুলিকা থামে। কিন্তু আবার বলে, সেন ব্যবসা ফাঁদলেন। লক্ষ্মী প্রসন্ন হ'লেন। দারিদ্র্য ঘুচল। বাড়ী গিয়েছিল আবার হ'ল। মা, ভাই,

বোনের মুখে হাসি ফুটল। ছোট বোন রমা র বিবাহ দিলেন সুপাত্র দেখে। খরচও করলেন বেশ। কিন্তু সহসা এই ছোট পরিবারটিতে পর পর দুটি অনর্থপাত ঘটে গেল। ছোট ভাই নিশীথ মারা গেল ধনুষ্টঙ্কারে। সেন বলেন, চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। ডাক্তারেরা একমত হতে পারলেন না বলে, আসল রোগ ধরা পড়ল না। সুতরাং রোগের যা ওষুধ তা শিশিতেই ভরা রয়ে গেল। রোগীর ভাগ্যে জুটল না। মাঝখান থেকে ভাইটি মারা গেল।

দ্বিতীয় অনর্থপাত ঘটে গেল এর কিছু পরেই। রমার স্বামী, আদরের ভগ্নীপোতটি মারা গেল কয়েক দিনের জ্বরে। ওষুধ বিপত্তিতেই মৃত্যু হ'ল তার।

সঙ্ঘমিত্রা এতক্ষণ শুনছিল মন দিয়ে। এখন প্রশ্ন করল, ওষুধ বিপত্তি মানে ?

—সেন বলেন, জ্বরের সঙ্গে পেটের মধ্যেও যন্ত্রণা ছিল একটা। ডাক্তার ইন্‌জেকশন্ দিলেন। ইনজেকশনের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল রোগী। সন্দেহ হয় ইনজেকসনের ওষুধটা জাল। হয়ত সে ওষুধই নয়। অন্য ওষুধ শিশিতে ভরা ছিল। তাই রোগী সইতে পারল না, শেষ হয়ে গেল।

মঞ্জুলিকা বলে, দুমাসের শিশু কোলে নিয়ে রমা ফিরে এল। সেই হাস্যময়ী ফুলের মত মেয়ে, মাথার সিঁদুর মুছে সংসারের যাবতীয় ভোগৈশ্বর্যে জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল বিধবার বেশে। মা সইতে পারলেন না। পর পর এত বড় দুটি শোক। ভেঙে পড়ে শয্যা নিলেন একেবারে। সেনের মুখে শুনেছি তাঁর শেষ রাতের ঘটনাটি যেমনি করুণ তেমনি মর্মস্পর্শী। গভীর রাত। মা শয্যায় শুয়ে ছটফট করছেন বুকের যন্ত্রণায়। দম বুঝি বন্ধ হয়ে এল তাঁর। আগে রাতে ডাক্তার পাওয়া ভার। অনেক চেষ্টার পর ডাক্তার এলেন। দেখে শুনে প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে বললেন, অরিজিন্যাল ওষুধটা যদি যোগাড় করতে পারেন, যন্ত্রণারও আশু উপশম হবে, রোগীও এ যাত্রায় রেহাই পাবেন। দুষ্প্রাপ্য ওষুধ। কিন্তু সেন জানতেন, এ ওষুধ আছে তাঁর ডাক্তারখানায়। আসলও আছে, নকলও আছে। রুদ্ধশ্বাসে তিনি নিজেই ছুটে এলেন ডাক্তারখানায়। তারপর ব্যগ্রচোখে খোঁজ করলেন ওষুধটির। কিন্তু কোথায় ওষুধ! স্থান শূন্য। তন্ন তন্ন পাঁতি পাঁতি করে খুঁজেও সন্ধান মিলল না কোথাও। যা মিলল সব নকল ওষুধ। হয়ত আসল ওষুধ বিক্রি হয়ে গেছে নিজেরই অজ্ঞাতসারে। নকল ওষুধের শিশিতে ঘর ছেয়ে আছে। সেদিন তারা যেন সব হাসতে লাগল দাঁত বার ক'রে। সেন সেইখানে ধপ করে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। আর ভীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওষুধগুলির দিকে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। চাকর এসে ডেকে নিয়ে যায় তাঁকে। খবর দেয়, মা মারা গেছেন। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

এ শোক ভোলবার নয়। তাই যেন ভোলেন নি আজও। বুঝলেন, নিজের পাপেই এই সব অনর্থপাত। এ নিজেরই কৃতকর্মের ফল। তাই এ পাপ ব্যবসা তুলে দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন। শুধু অনাথিনী বোন আর তার শিশুপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত ইতস্ততঃ করছিলেন কিছুটা। কিন্তু মা, ভাই আর ভগ্নীপতি করতে পারেন নি যা, তাই করল মণিমালা। চরম আঘাত হানল সেই।

সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে, মণিমালাটি কে মঞ্জু ?

—একটা মেয়ে। মঞ্জুলিকা একটু হাসে।

—সে ত নাম শুনেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তার জাতি-তত্ত্ব আমার জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞাস্য তার পরিচয়।

—বলছি, কিন্তু ক্রমশঃ। সেনের মুখে শুনলাম, মণিমালার সঙ্গে পরিচয়। তার বিয়ের দিন থেকে তবে এ শুধু চোখের পরিচয়, মুখের নয়। যার বৌ হ'য়ে এল মণিমালা, সে থাকত সেনের দোকানের উল্টো ফুটের সামনের ফ্ল্যাটে। মণিমালাকে বিয়ে করে নিয়ে এল এক নব ফাল্গুনের সকালে। সে দিন শঙ্খধ্বনিকে হার মানিয়েছিল কোকিলের বিরামহীন কুহুধ্বনি। কনে নামল গাড়ী থেকে বরের পিছু পিছু। রাঙা বেনারসী শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে দুধেগরদের জোড় এক হয়ে গেছে গাঁটছড়ার বাঁধনে। মাথার সিঁথি মৌড়। ছোট কপালটি ঘিরে, আরক্তিম কপোল দুটি ঘুরে কনে-চন্দনের ফোঁটা। তারই মাঝে এক জোড়া হরিণ কালো চোখ, টিকোল নাক আর অনবদ্য মুখশ্রী। পরনে রক্তাম্বরা বেনারসী শাড়ী। শুভ্র পা দুখানিকে ঘিরে অলক্তের রেখা। যেন শারদলক্ষ্মীর শুভাগমন হ'ল নব ফাল্গুনের সকালে। এ চোখ জুড়ান দৃশ্য। দুচোখ জুড়িয়ে গেল সেনের। নিজের বোনের কথা মনে পড়ে গেল। তাকেও একদিন এমনি ক'রেই সাজিয়েছিলেন তাঁরা।

বিয়ের দিন থেকেই সামনের ফ্ল্যাটের ছোট ঘরখানি বড় মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। এতদিন সামনা-সামনি দোকান ক'রে যে ঘরখানির দিকে তাকাবারও সময় হয়নি এক মুহূর্ত্ত, আজ সেইখানিই আকর্ষণের বস্তু হ'ল সর্ব্বক্ষণ। যেন শত কমল একসঙ্গে ফুটে উঠেছে সে ঘরে। আর তারই মাঝে এক দম্পতি যুগল কপোত-কপোতীর মত নীড় বেঁধেছে সেখানে। ভারী সুখী দম্পতি। কলহাস্যে ঘর ভরে থাকে। মাঝে মাঝে তার রেশ দমকা বাতাসের মত এসে ঢোকে দোকানে। এ বাঁধ-না-মানা-জোয়ার, দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় টানে। কখনও আদর সোহাগ, কখনও মান অভিমান, কখনও বা ছোটখাটো খুনসুড়ি লেগেই আছে তাদের। মাঝে মাঝে মেয়েটি ছুটে আসে জানালার ধারে। হাসি মুখে দুহাতে পর্দাখানি টেনে দিয়ে ছুটে চলে যায় ঘরের ভেতর। মনে হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু খেলায় মাততে চায় তারা। একটার পর একটা দৃশ্য। সেনের ভাল লাগে বেশ।

বছর কেটে যায়। কদিন ধরে মেয়েটির দেখা নাই। সেদিন সকালে জানালার ধারে হঠাৎ মেয়েটিকে দেখে চমকে ওঠেন সেন। কী বিশীর্ণ মুখশ্রী। সারা মুখে যেন কালি ফেলে দিয়েছে কে। সেই ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি সব অন্তর্হিত। মেয়েটি এক মুহূর্ত দাঁড়াল জানালার গরাদে মাথা রেখে, তারপর সরে গেল ধীরে ধীরে।

এরপর কদিন ধরেই লক্ষ্য করেছেন সেন সেই চিরানন্দময় ঘরে কেমন যেন নিরানন্দ নেমে এসেছে। সে ঘরের দীপ্তি নিভে গেছে। সে কপোত-কপোতীর দেখা মেলে না, যেন নীড় ছেড়ে চলে গেছে। কেমন একটা থমথমে ভাব ঘিরে রয়েছে ঘরখানিকে। বিহঙ্গীর দেখা যদি বা মেলে, বিহঙ্গের নয়।

সঙ্ঘমিত্রা মুচকি হেসে বলে, বিহঙ্গ উড়ে গেল নিশ্চয়ই। ও রকমই হয়। অতিবৃষ্টির পরই অনাবৃষ্টি। পুরুষদের বিশ্বাস নেই।

মঞ্জুলিকাও হাসে তবে এক টুকরো ম্লান হাসি। বলে, সব পুরুষ নয়। অন্ততঃ এই মেয়েটির স্বামী নয়।

সঙ্ঘমিত্রা ঠোঁট টিপে বলে, আর তার সঙ্গে আর একজনও নয়। সে তোমার ঐ অসিত সেন। বাবাঃ কী চক্ষেই যে তাকে দেখেছ তুমি জানি না। কিন্তু এখনও সময় আছে মঞ্জু ফেরবার। ও সব লোকের জন্যে জীবনটাকে এ ভাবে পাত ক'র না।

মঞ্জুলিকা একটু চুপ করে থেকে বলে, সব জিনিষেরই দুটো দিক আছে মিত্রা—অন্তর আর বার।

বায়ুটা সব সময় অন্তরের প্রকাশক হয় না। অসিত সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় অন্তরের দিক থেকে। সেই অন্তরের অন্তরে যে পরিচ্ছন্ন শুভ্র মনটি আছে তার সাক্ষাৎ আমি পাই সব প্রথম। তাই আসল মানুষটিকে চিনতে আমার বিলম্ব হয়নি এতটুকু। মণিমালার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বাইরের দিকটা, তাঁর ব্যবসায়ী মনটা, তাই এত বড় ভুল করতে পেরেছিল সে। নইলে সেও চিনতে পারত তাঁকে। মঞ্জুলিকা চুপ করে। তারপর আবার বলে, বিগন্ধের যে দেখা নেই কেন তা বোঝা গেল দু-একদিনের মধ্যেই। সামনের বাড়ীর একটি চাকরকে ইদানীং প্রায়ই দেখা যেত দোকানে প্রেসক্রুপশন হাতে। দামী দামী ওষুধ নিয়ে যায় সে। সেদিনও বিকেলের দিকে সে এসেছিল ওষুধের জন্যে। বড় ডাক্তারের প্রেসক্রুপশন। দেখেই চিনেছিলেন সেন। প্রশ্ন করলেন চাকরটিকে, এত দামী ওষুধ নিয়ে যাচ্ছ কার জন্যে? চাকরটির নাম রাখাল। সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সামনের ফ্ল্যাটটিকে। বলে, ঐ ঘরের বাবুর জন্যে। টাইফাড রোগ। বড্ড বাড়াবাড়ি যাচ্ছে কদিন। রোজ রোজ কত যে ওষুধ নিয়ে গেলুম এখান থেকে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু কিছু ফল হ'ল না। অদৃষ্ট বাবু, সবই অদৃষ্ট। ডাক্তার বলেন, আজকাল এ রোগের ওষুধ বেরিয়েছে, ধন্বন্তরী। কিন্তু বাবুর বেলায় দেখছি, ধন্বন্তরিও হার মানল। ছেলেমানুষ বৌ, পাগলের মত হয়ে গেছে। গয়নাগাঁটি বাঁধা দিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছে। যে যা বলছে তাই করছে। টাকার দিকে গেরোটি নেই। জলের মত খরচ করে যাচ্ছে আর দিনরাত স্বামীর সেবা করে চলেছে। কি যে হবে বাবু জানি না।

চমকে ওঠেন সেন। সর্বনাশ! টাইফয়েডের ওষুধ আজকাল দুষ্প্রাপ্য। কালো বাজারে বিক্রী হচ্ছে সব। প্রকাশ্য বাজারে যা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই জাল। নিজের দোকানের ওষুধগুলিকেও তিনি চেনেন। আসল অনেকদিন অন্তর্হিত হয়েছে নকলের অন্তরালে। সুতরাং যত ওষুধই নিয়ে যাক, ফল হবে না কিছু। তাই ভয়ে ভয়ে রাখালকে প্রশ্ন করলেন আবার, এখন কেমন আছেন তিনি?

রাখাল উত্তর দেয়, বড় ডাক্তার এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। তিনি আশা দিতে পারেননি কিছু। শুধু বলে গেলেন, এইটাই শেষ ওষুধ। এর পরে আর কোন ওষুধ নেই এ রোগের। বলে দোকান থেকে সদ্য কেনা ওষুধটি তুলে দেখাল তাঁকে।

সেন পাথর হয়ে যান। কোন কথাই বার হয় না মুখ দিয়ে তাঁর। শুধু ওষুধটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন এক দৃষ্টে।

রাখাল চলে যেতে চায়। সেন বাধা দেন। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে স্খলিত কণ্ঠে বলেন, শোন, ও ওষুধ রেখে যাও। আমি আরও ভাল ওষুধ, টাটকা ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি তোমায়। তাতে কাজ হবে শীগ্‌গির।

কিন্তু ফল হয় না। জানলা থেকে ডাক আসে, দেরী ক'র না রাখাল, ছুটে চলে এস ওষুধ নিয়ে।

রাখাল দাঁড়ায় না। তাকে পুনরায় বাধা দেবার আগেই সে দোকান থেকে নেমে ছুটে চলে যায়। সেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন ধপ করে।

ঘণ্টাখানেক পর কান্নার রোল ওঠে সামনের ঘরখানি থেকে। বাণবিদ্ধ বিহঙ্গীর মর্মভেদী হাহাকার।

সঙ্ঘমিত্রা ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সে কি! মারা গেলেন ভদ্রলোক?

মঞ্জুলিকার ঠোঁটের কোণ দুটিতে একটুখানি পাণ্ডুর হাসি দেখা দেয়। ঘাড় নেড়ে জানায়, মারা গেলেন ভদ্রলোক।

সঙ্ঘমিত্রা শিউরে উঠে, ইস্! কী অমানুষিক কাণ্ড! এ আমি সমর্থন করতে পারি না মঞ্জু।

—না। কেউ পারে না। তিনি নিজেও পারেননি বলে আজ তাঁর এই দশা। সখেদে তিনি বলেছিলেন আমায়, মানুষ হ'য়ে জন্মেছি যখন তখন মরণকে এড়াতে পারব না জানি। তবে ভগবানের কাছে নিয়ত এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, জ্ঞান বুদ্ধি যখন তিনি দিয়েছেন আমাকে, তখন পাগল হ'য়ে যেন মরতে না হয় আমায়। ভগবান এ প্রার্থনা তাঁর রাখেন নি।

সঙ্ঘমিত্রা চুপ করে থাকে। কিন্তু মঞ্জুলিকা বলে চলে, সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেন নি তিনি। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। আর এক বাণবিদ্ধ বিহঙ্গীর আকুল ক্রন্দন বুককাটা হাহাকারে অস্থির হয়ে পড়েছেন। মনে পড়েছিল তাঁর মহাকবির সেই শাশ্বত বাণী,

মা নিষাদঃ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকম বধীঃ কাম মোহিতম।

হাজার হাজার বছর আগেকার সেই এক করুণতম দৃশ্যের পুনরাভিনয় হয়ে গেল আজ। সেই যুগল ক্রৌঞ্চ মিথুনের দ্বিতীয়টির হত্যাকারী হ'লেন তিনি। সেন বুঝেছিলেন, মহাকবির অন্তরের হাহাকার সে দিন যেমন নিষ্ফলে যায়নি, আজ সতীর হাহাকারও তেমনি নিষ্ফলা যাবে না। সেই দিনই মনস্থির করলেন তিনি, এই হীন ব্যবসার শেষ করে দেবেন অচিরেই।

পরদিন সকালে দেখা পেলেন মেয়েটির। জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ফিরে এল সে। একদিন এক নব ফাল্গুনের প্রথমে সে এসেছিল রাজরাজেশ্বরীর বেশে। আবার এক নব ফাল্গুনের প্রথমে সেই ফিরে এল দীনহীনার বেশে। আজ আর সানাইয়ের সুর কানে ভেসে এল না। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি তাকে স্বাগতম জানাল না। এয়োরা ছুটে এল না বরণ করে নিতে বধূকে, হাতে ধরে তাকে মোটর থেকে নামাতে। আজ সবাই নিথর, নিস্পন্দ। বধূ নিজের চেষ্টাতেই নেমে এল ভাড়া-গাড়ী থেকে। মাথায় নেই সেই সিঁথি মৌড়। কপালখানিকে ঘিরে নেই সেই কনে-চন্দন। পরনের রক্তাম্বর আজ লাজে জলাঞ্জলি দিয়ে শুক্লাম্বর। হরিণ চক্ষু কোটরগত। সূক্ষ্ম সিঁথির প্রান্তে রমণীয় সিঁদুরের রেখা লুপ্ত। চরণের অলক্তক রেখা তার মনোরম আশ্রয়টির মায়া এখনও ত্যাগ করতে পারেনি বলে অবলুপ্তির পথে ম্লান হ'তে ম্লানতর। সেই আনন্দের প্রতিমা আজ পরিণত বিষাদের প্রতিমায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন সেন। ক্ষান্ত বর্ষণ এতক্ষণে ধারাবর্ষণ হ'য়ে নেমে আসে দুচোখ বেয়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে ওঠেন, এর জন্যে দায়ী আমি। ভগবান। এই আনন্দের প্রতিমাকে আজ বিষাদের প্রতিমায় পরিণত করেছি আমি।

কয়েকদিন পর। রাখালকে দেখতে পেয়ে দোকানে ডেকে আনেন সেন। তারই মুখে খবর পান বৌটি চলে যাচ্ছে এ ফ্ল্যাট ছেড়ে। বাপ মা কেউ নেই তার। শ্যামবাজারে মামার বাড়ী থেকে মানুষ হয়েছে, ফিরে যাচ্ছে সেইখানে। মামার অবস্থা ভাল নয়। ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে তার কি, সে নিজেই জানে না।

রাখালকে বললেন সেন, তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই রাখাল। তোমার মাকে বুঝিয়ে বল, এতে উপকারই হবে তার, অপকার হবে না। রাখাল লোক ভাল। প্রভুপত্নীর মঙ্গলই তার কাম্য। সে রাজি হয়ে চলে যায়। পরদিন রাখাল আসে। সেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বলে, মাকে অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি বাবু। তিনি ত বুঝতে পাচ্ছেন না কি উপকার আপনি করতে পারবেন তাঁর। তবুও শেষ পর্য্যন্ত দেখা করতে রাজি হয়েছেন তিনি।

ছোট একখানা ঘর। তারই এক পাশে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। কেমন এক উদাসী ভাব। সেনকে দেখে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিল মাত্র। তারপর তাকিয়ে রইল সেই রকম উদাস দৃষ্টিতে।

এ দৃষ্টি সইতে পারলেন না সেন। যে কথা বলবেন বলে এতক্ষণ রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলেন মনে মনে, অপরাধী মন গুলিয়ে ফেলে সব। কোন মতে শুধু বলেন, রাখালের মুখে শুনলুম এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপনি। তাই একবার দেখা করতে এলুম আপনার সঙ্গে। যে মহাপাপ করেছি, তারই কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সব কথা আপনাকে খুলে বলে।

মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। উদাস দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়ের ঘোর ফুটে ওঠে। বিস্ফারিত চোখ দুটি মেলে সে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক ভাবে।

সেন বলেন, আপনার স্বামীর অকাল মৃত্যুর জন্য হয়ত কিছুটা দায়ী আমি। আপনার জানালার সামনে ঐ যে ওষুধের দোকান, ওখানা আমার। আপনার স্বামীর অসুখের সব ওষুধ যদি গিয়ে থাকে ওখান থেকে তা হলে বলি, আসল ওষুধ একটাও পান নি তিনি।

মেয়েটি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে আসল ওষুধ পান নি মানে ?

মানে, সেন ঢোঁক গিলে বলেন, আসল ওষুধ যেখানে দুষ্প্রাপ্য, সেখানে অসাধু ব্যবসায়ীদের পাপ লালসায় নকল ওষুধ সহজ প্রাপ্য। আমি একজন অসাধু ব্যবসায়ী। তাই মনে হয়, আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য হয়ত এই নকল ওষুধই কতকটা দায়ী।

মেয়েটি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এইবার কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। পরক্ষণেই আর্তনাদ করে উঠল, হা ভগবান, এ কি শুনলাম আমি! সে এক মুহূর্ত কি এক বিষাদ করুণ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে দেখল। পর মুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে, এ কথা অসিতবাবু কি করে স্বীকার করল ভাই মঞ্জু। পুলিসে খবর দিলে যে নির্ঘাত জেল হ'ত তার।

—হয়ত হ'ত। শুধু জেল কেন, ফাঁসি হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু মানুষের বিবেক জিনিষটা বড় দুর্জ্জেয়। তার দংশনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। সেনও হারিয়ে ফেলেছিলেন সেদিন।

—ভাল করেন নি কিন্তু।

—সে কথা তাকে বলেছিলুম আমি। শুনে একটু হেসে বলেছিলেন, অপরের প্রাণ নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে যদি না বাধে, নিজের বেলায় বা বাধবে কেন। কিন্তু তা নয়। ও পাপ যত উদ্গীরণ হয়ে যায়, ততই মঙ্গল। লোকে জানুক আমি কি। এ গুরুভার মনের মধ্যে চেপে রেখে পাগল হয়ে যেতে বসেছি। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, দরদী বন্ধু। তাই সব কথা জানালুম আপনাকে।' বুঝলুম অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হচ্ছেন তিনি দিন রাত। মঞ্জুলিকা থামে।

সঙ্ঘমিত্রা বলে, সেই সঙ্গে তুমিও কম দগ্ধ হচ্ছ না ভাই মঞ্জু।

মঞ্জুলিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, ভুলে যেও না মিত্রা মহাপুরুষদের বাণী। তাঁরা বলে গেছেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।

—এই বাণীকে তুমিও সার্থক করে তুলেছ মঞ্জু।

—তুলেছি এ কথা বলতে পারি না মিত্রা। তবে চেষ্টা করেছি তাকে ঘৃণা না করবার। পুণ্যের পাশে যদি পাপ কিছুটা থাকে, দৃষ্টি শুধু তার ওপর নিবদ্ধ রাখব আর পুণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখব না,

এ আমার নীতি নয় ভাই। যাঁর মধ্যে এত বড় এক মহৎ অন্তঃকরণ লুকান আছে; বলত, কি করে ঘৃণা করি তাঁকে। রত্নাকরের মধ্যেই বাস করছিলেন বাল্মিকী মুনি। তাই ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে তাঁর দস্যু অন্তর দ্রবীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল আদি কবিতে। এ হ'ল তার আত্মশুদ্ধি। এই আত্মশুদ্ধিরই আর এক রূপের পুনরাভিনয় হ'ল এখানেও। যে অন্যায় করেছিলেন সেন, তারই প্রতিকারের জন্য নিজেকে স্বেচ্ছায় ঠেলে দিয়েছিলেন মরণের মুখে, মেয়েটির কাছে সব কথা প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে। হয়ত একটা ভাবোচ্ছ্বাস দু'জনকে মূক করে দেয়। কিন্তু এ নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে পুনরায় প্রশ্ন করে সঙ্ঘমিত্রা, এ ইতিহাসের অকালমৃত্যু নিশ্চয়ই এখানে ঘটে নি মঞ্জু। এরও সমাপ্তি একটা আছে।

—আছে। তবে সমাপ্তি খুব সুষ্ঠু নয়। তিন দিন পর আবার গিয়েছিলেন সেন মেয়েটির কাছে।

—আবার?

—না গিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। বিবেকের জ্বালা তুষানলের জ্বালা। তারই দংশনে অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। দেখা হতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল মেয়েটি। বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে দু'চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে। তার পরই ব্যাধ ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে গেল ঘর ছেড়ে। কিন্তু বাধা দিলেন সেন। বললেন, আপনি ভয় পেয়েছেন বুঝেছি। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস করতে চেষ্টা করুন, যা হয়ে গিয়েছে তার বেশী আর কিছু অন্যায় হবে না আমার দ্বারা।

মেয়েটি এবার ফিরে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ করে ফুঁসিয়ে ওঠে, কি চাই আপনার আমার কাছে। কেন আসেন এখানে বার বার বিরক্ত করতে। বেরিয়ে যান, এখুনি বেরিয়ে যান এ ঘর ছেড়ে। আপনার মুখ দর্শন করতে ঘৃণা করে আমার।

সেন ধীরে ধীরে বলেন, জানি। আমিও যে আপনার কাছে আসতে কতখানি লজ্জিত, সে কথা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। অথচ না এসেও উপায় নেই।

—কেন, কেন উপায় নেই বলুন আপনি। মেয়েটি প্রশ্ন করে সন্দেহ ভরা চোখে।

সেন তেমনি ভাবেই বলেন, সারা জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে গেল আপনার এ আমার অজানা নয়। অথচ কত দীর্ঘ পথই না পড়ে আছে সামনে। এ পথে চলতে হবে কতদিন ধরে। এ চলার মাঝে যে দুঃখ আছে, তা হয়ত একদিন সহে যাবে। কিন্তু দৈন্য? দৈন্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন হবে পাথেয়র।

মেয়েটি বাধা দেয়। জোর দিয়ে বলে, না, হবে না। দরিদ্রের মেয়ে দারিদ্র্যকে ভয় করে না। এত বড় সর্বনাশের পর আর কোন দারিদ্র্যই তার কাছে বড় হ'তে পারে না। সুতরাং কোন পাথেয়রই প্রয়োজন নেই আমার।

মেয়েটির তেজস্বিতায় সেন একটু ভড়কে যান। কিন্তু তার পরই সাহস করে বলেন, আপনার নেবার প্রয়োজন না থাক, কিন্তু আমার দেবার প্রয়োজন আছে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়। দু'চোখ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে, মানে?

মানে, কী জবাবদিহি করব আমি পরকালে? দোকান আমি তুলে দিয়েছি। ওপাপ ব্যবসা আর করব না। এরপর জীবনটাকে সৎপথে চালাতে চেষ্টা করব। হাজার পনর টাকা আমার সম্বল আছে। যাবার আগে সেইটাই তুলে দিয়ে যেতে চাই আপনার হাতে। এর প্রয়োজন আজ দেখা না দিক, ভবিষ্যতে হয়ত একদিন দেবে। সে দিন এর বিনিময়ে আপনি এতটুকু তৃপ্তি যদি পান, বিশ্বাস করবেন

আমার আত্মা তার চেয়ে বহুগুণ তৃপ্তি পাবে। বলতে বলতে পনের হাজার টাকার এক তাড়া নোট সসম্ভ্রমে এগিয়ে দেন তার দিকে। মেয়েটি শিউরে ওঠে। সভয়ে এক পা পেছিয়ে গিয়ে বলে, ঘুষ! আপনি আমাকে ঘুষ দিতে এসেছেন আমার স্বামী হত্যার মূল্যস্বরূপ। আপনি নিয়ে যান, ও-টাকা নিয়ে যান এখান থেকে। ওপাপ আমি স্পর্শ করতে পারব না কিছুতেই। মেয়েটি দু'হাতে চোখ ঢাকে।

সেন দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মত।

মেয়েটি চোখ চেয়েই আবার আর্তনাদ করে ওঠে ; না—না আপনি নিয়ে যান। আপনি শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু আমি পাচ্ছি। ও টাকার ভেতর থেকে আমার মত আরও কত অনাথিনী মেয়ের বুক-ফাটা হাহাকার গুমরে উঠছে। কত মা-হারা পুত্রের আর পুত্র-হারা মায়ের আকুল ক্রন্দন আপনার ঐ টাকার মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে। কত ভ্রাতৃহারা ভগ্নীর, কত ভগ্নীহারা ভাইয়ের ব্যথা লুকান আছে ওর খাঁজে খাঁজে। ঐ সর্বনেশে জিনিষ, স্বামী-হারা পত্নীর উষ্ণ শ্বাসে জর্জরিত জিনিষ, স্পর্শ করতে বলছেন আমাকে। আপনি যান। আমি অর্থের কাঙাল নই। লুব্ধা নারীও নই। আমি ঘৃণা করি ও টাকাকে। বলতে বলতে সে একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সঙ্ঘমিত্রা বলে, আশ্চর্য তেজী মেয়ে ভাই। সাধারণ মেয়ে হ'লে অতো টাকার লোভ ছাড়তে পারত না কিছুতেই।

মঞ্জুলিকা বলে, মেয়েটি সত্যই তেজী। শুধু কথায় নয়, কাজেও। সেই দিনই সে চলে গেল ফ্ল্যাট খালি করে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও হেনে গেল মর্মান্তিক।

আঘাত হেনে গেল মানে ? সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে একটু আশ্চর্য হয়ে।

মঞ্জুলিকা বলে, এ বাস্তব আঘাত নয় ভাই, এ নৈতিক আঘাত। এর প্রতিক্রিয়া দেহে নয়, মনে। এই আঘাতেই মনে মনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেন। তবে সে অর্থ তিনি আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। সেই দিনই দান করে দিয়ে আসেন কোন এক সেবা সদনে। যারা আতুর, যারা দুস্থ, দুর্মূল্য অষুধ কেনবার ক্ষমতা যাদের নেই, শুধু তাদের জন্যে ব্যয় করা হবে ও অর্থ। কিন্তু এতোতেও শান্তি পেলেন না তিনি। কে যেন সব শান্তি হরণ ক'রে নিয়ে গেছে তাঁর। আমায় প্রায় বলতেন, চাকরী করবার ইচ্ছে আমার ছিল না কোনদিন। শুধু ছোট বোনটি আর তার কচি ছেলেটির মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্যেই এ উঞ্ছবৃত্তি আমার। ভারী ধাক্কা খেয়েছি জীবনে। ভেবেছিলুম কালের আবর্তনের প্রভাবে এ ধাক্কার তীব্রতা কমে আসবে একদিন। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। এর তীব্রতা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। আজকাল আর এক উপসর্গ এসে জুটেছে।

প্রশ্ন করি উপসর্গ কিসের ?

বলেন, মেয়েটিকে আমি স্বপ্ন দেখতুম মাঝে মাঝে। কিন্তু এখন দেখি প্রায়ই। হয়ত এ আমার অত্যধিক মানসিক চিন্তার ফল। সে চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় শিয়রে, মুখে একটি আঙুল তুলে দিয়ে যেন ইঙ্গিতে বলতে চায়, আমার স্বামী হন্তা তুমি। তোমায় আমি ক্ষমা করব না কোনদিন। গভীর রাতে। এই নীরব ইঙ্গিত কী যে যন্ত্রণাদায়ক তা আমি বোঝাতে পারব না। দিনের পর দিন এ হ'য়ে উঠেছে অসহনীয়। আমি নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে যাব মিস ব্যানার্জি, যদি মেয়েটির ক্ষমা না পাই। মরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু পাগল হয়ে বেঁচে থাকা—উঃ কী ভয়ানক! আমি কল্পনা করতে পাচ্ছি না।

সহানুভূতিতে মনটা পূর্ণ হয়ে আসে। অন্তরটা হয়ত আর্দ্রও হয়ে ওঠে। চোখ তুলে প্রশ্ন করি, মেয়েটির নাম কি বলতে পারেন ?

—না। তবে তার স্বামীর নাম বলতে পারি। অরুণ ভট্টাচার্য। রাখালের মুখে শুনেছিলাম রেলে চাকরী করতেন ভদ্রলোক।

—জানি। মেয়েটির নাম মণিমালা।

সেন অবাক হয়ে যান। হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন, মণিমালা? আপনি চেনেন তাকে?

বলি, শুধু চিনি না, বিলক্ষণ চিনি। সম্পর্কে আমারই আত্মীয়। কিছুদিন আগে এমনি এক কাহিনী শুনেছিলুম মণিমালার মুখে। সে দিন সে কাহিনী ছিল অসম্পূর্ণ। আজ সম্পূর্ণ হল।

—মিস ব্যানার্জি! সেন আকুল হয়ে ডাকেন। এত কাতর ডাক এর আগে শুনিনি কখনও। বুঝতে পারি কি বলতে চান তিনি। তাই বড় বিচলিত হয়ে বলি, শুনুন, বাপ-মা-মরা মেয়ে মণিমালা। কিন্তু বড় তেজী জেদী মেয়ে। তবে সে আমায় ভালবাসে, আমার অনুরোধ সে অগ্রাহ্য করবে না। যাতে আপনি তার ক্ষমা পান, আমি সেই ব্যবস্থাই করব।

সেন উঠে আসেন চেয়ার ছেড়ে। সহসা দু'হাত দিয়ে আমার একখানা হাত চেপে ধরে বলে ওঠেন, করবেন আপনি? আঃ! আমি চিরদিনের মত আপনার কেনা হ'য়ে থাকব। বড় আকস্মিক ঘটনা। এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। একটা তড়িৎস্পর্শ সারা দেহটিকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিতে হয়ত একটু সময় লেগেছিল। তারপরই আমার মুক্ত হাতখানি দিয়ে তাঁর ডান হাতের মণিবন্ধটি চেপে ধরে মুখের দিকে মুখ তুলে একটু আবেগ ভরা কণ্ঠেই বললুম, করব। শুধু আপনার জন্যেই করব। এই আপনাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি তার ক্ষমা আপনাকে পাইয়ে দেব।

সঙ্ঘমিত্রা আশ্চর্য হয়ে বলে, একথা বলেছিলে তুমি? ধন্যি মেয়ে তুমি মঞ্জু। মণিমালার স্বরূপ জেনেও এ কথা বলতে সাহস পেলে?

—পেলুম। ভেবেছিলুম মণিমালাও আমারই মত মেয়ে। পুরুষের যে দিকটা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তার পরিচয় সে পায় নি। পেলে ক্ষমা না করে সে পারবে না।

—মণিমালা তোমার অনুরোধ রেখেছে মঞ্জু? ক্ষমা সে করেছে? সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে।

—না। কথা দিয়েও কথা রাখে নি সে। সেনের যা আসল রূপ সেইটাই তুলে ধরতে চেয়েছিলুম তার চোখে। কিন্তু হায়রে অন্ধচোখ, তাতে দৃষ্টি ফোটাতে পারলুম না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত তার দুটি হাতে ধরে মিনতি জানিয়েছিলুম, আমি যে তাঁকে কথা দিয়েছি ভাই মণি, গা ছুঁয়ে শপথও করেছি। কথা না রাখতে পারলে কি করে মুখ দেখাব তাঁকে?

মণি বুঝল। দুচোখ ভরা জল নিয়ে বলল, এমন কথা না দিলেই পারতে মঞ্জুদি। এ যে আমার পক্ষে কতখানি কঠিন তা তুমি বুঝবে না ভাই। তবে তুমি অসম্মানিত হও, জীবনে শান্তিহারা হয়ে ঘুরে বেড়াও, এ-ও চাই না আমি। যত কঠিন কাজ হ'ক, কথা দিচ্ছি, শুধু তোমার মুখ চেয়ে, একে সহজ ক'রে নেব।

সঙ্ঘমিত্রা বলে, মণিমালা নিজেকে চিনতে পারে নি মঞ্জু, তাই সে ভুল করেছে।

—শুধু ভুল নয় মিত্রা, মহাভুল। সহজ জিনিষকে জটিল করে দিয়েছে আরও। আর এই জট খুলতে প্রাণান্ত হয়ে গেলাম আমি। ভাবি, সে দিন যদি দুজনার দেখা না হ'ত এ জট পড়ত না।

—কিন্তু এর জন্যে দায়ীও তুমি মঞ্জু।

—আমিই। আর তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি আজও। দুজনকে আমন্ত্রণ করে এনে দেখা

করিয়ে দিয়েছিলুম আমারই ঘরেতে। মণিমালাকে বলে দিয়েছিলুম চুপি চুপি, তুমি যে উপরোধে ঢেঁকি গিলছ না, এটা যে অভিনয় নয়, অকৃত্রিম, এ বিশ্বাসটুকু যেন করতে পারেন তিনি। কিন্তু পাখী পড়ান সার হল শুধু।

—কেন, রাজী হ'ল না মণিমালা?

না হলে ভালই হ'ত। এ নাটকীয় প্রহসনের সৃষ্টি হত না সেদিন। মণিমালাকে হাতে ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলাম। সেন বসেছিলেন। অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে। ভারী বিচলিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। মণিমালা একবার তাকিয়ে দেখল তাঁর দিকে। কিন্তু এই অপরাধ ভারে পীড়িত লোকটির মধ্যে কি যে দেখল, সেই জানে। কিন্তু অকস্মাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল, আমি পারব না মঞ্জুদি, ও আমি পারব না। স্বামীহন্তাকে ক্ষমা করতে পারব না কিছুতেই। আমায় তোমরা ছেড়ে দাও। বলতে বলতে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল উন্মাদনীর মত।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন সেন। মুখ মড়ার মত সাদা। ঠোঁট দুখানি কাঁপছে থর থর করে। অসহায়ের মত বলে উঠলেন, আমি ক্ষমা পেলুম না মঞ্জু। মণিমালা আমায় ক্ষমা করল না।

আঘাতটা বড় গভীরভাবে প্রাণে বেজেছিল। স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর এর প্রতিক্রিয়া আরও গভীরভাবে দেখা দিল। দিন কয়েকের মধ্যেই কেমন হ'য়ে গেলেন সেন। একটু বেসামাল হয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে চমকে উঠে বিড়বিড় ক'রে বলতেন, আমি ক্ষমা পেলুম না মঞ্জু। মণিমালা ক্ষমা করলা না আমাকে।

কখনও কখনও বলতেন, সংসারটা বড় বেদরদী মঞ্জু। কেউ কারও দিকে চায় না। রমাটাও বড় ছেলেমানুষ। ও ঠিক আমায় বুঝতে পারে না। তাই ত বলি, তোমার বড় হিতৈষী, তোমার বড় দরদী বন্ধু আমার কেউ নেই আর।

সঙ্ঘমিত্রা বলে, আমিও মেয়ে, তবুও মণিমালাকে এ ক্ষেত্রে সমর্থন করতে পারি না মঞ্জু। যদি পারবে না তবে কথা দেওয়া কেন, আর এ প্রহসন করাই বা কেন?

—আমিও সেই কথা ভাবি মিত্রা। তবে মণিমালাকে এত লঘু আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখন সব অপরাধই আমার।

—কারণ?

—আমি যদি এ ব্যাপারে মাথা না দিতুম মিত্রা, তা হলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না আর উন্মাদও তিনি হতেন না। পাগল হ'য়ে বেঁচে থাকাটাকে তিনি ভয় করতেন বড় বেশী। সেইটাই ঘটে গেল তাঁর জীবনে। রমা কেঁদে বলে, কি হবে মঞ্জুদি? কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেব কি, নিজেকেই সামলাতে পারি না। চোখের জল মুছে বলি ভয় কি বোন, ভগবানকে ডাক, মঙ্গলময় তিনি। সব মঙ্গল করবেন তিনিই।

রমা আকুল হ'য়ে বলে, আর সামলাতে পাচ্ছি না দিদি। দিনের বেলা তবু বা কিছুটা সজ্ঞানে থাকেন, কিন্তু যত বাড়াবাড়ি যত উৎপাত সুরু হয় রাতে। নিজে ঘুমোন না, কাউকে ঘুমোতেও দেন না। প্রায় তোমার নাম ধরে কাঁদেন আর বলেন, এত বড় দরদী বন্ধু আমার কেউ নেউ রে রমা।

শুনে চুপ করে থাকি। রমা আস্তে আস্তে ডাকে, মঞ্জুদি?

চমকে উঠে উত্তর দি, কি ভাই ?

ভয়ে ভয়ে সে বলে, একটা কথা বলব ?

হেসে ফেলে বলি, এত ভয় কিসের। কি বলবে, বল না ?

—দাদাকে আমি সামাল দিতে পাচ্ছি না দিদি। আমার কোন কথাই শোনেন না তিনি। এতটুকু গ্রাহ্য পর্যন্ত করেন না। যা কিছু ভয় করেন তোমাকে। তুমি কাছে থাকলে আমার কোন ভয় থাকবে না দিদি। সেইত আছ পরের বাড়ীতে। এস না আমাদের এখানে। দু বোনে থাকব বেশ। দাদারও বাড়াবাড়িটা কমে যাবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তাই রাজী না হয়ে পারলুম না। সেই থেকে রমার কাছেই আছি।

—অর্থাৎ নিজের বাড়ীতেই আছ ? সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে দুষ্টুমি হাসি হেসে। মঞ্জুলিকা এ কথায় কান দেয় না। শুধু বলে চলে, তারপর চিকিৎসা করালুম অনেক। কিন্তু ফল হল না কিছু। উর্দ্ধগতি রোগ, না কমে বেড়েই চলে দিন দিন। ডাক্তার বললেন, মানসিক রোগ। এর চিকিৎসা বাড়ীতে সম্ভবপর নয়। পাঠাতে হবে মেণ্টাল হাসপাতালে। তাদের চিকিৎসাধীনে রোগী হয়ত সেরে উঠবে একদিন। তবে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা। রমা কেঁদে ফেলে। বুঝি, ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা, এ করাবার ক্ষমতা তার নেই। সান্ত্বনা দিই, চুপ কর বোন, কাঁদিস নি। হাসপাতালে গেলেই উনি সেরে আসবেন। ঠিক। ব্যবস্থা যা করবার আমি করে দিচ্ছি সব।

সঙ্ঘমিত্রা সাগ্রহে প্রশ্ন করে, করে দিয়েছিলে সব ?

মঞ্জুলিকা একটু হাসে। বলে, আমি করবার কে ভাই। যিনি করবার তিনিই করে দিয়েছেন সব। তবে একমাস হাসপাতালের চিকিৎসায় ফল পাওয়া গেছে আশাতীত। ডাক্তারেরা আশা করেন শীগ্‌গিরই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তিনি। পয়লা ডিসেম্বরেই হয়ত ছেড়ে দেবেন তাঁকে। সঙ্ঘমিত্রা বলে, পয়লা ডিসেম্বরের আর বেশী দেরী নেই মঞ্জু। আর আটদিন মাত্র বাকী।

—জানি। কিন্তু এই আটদিন আমার কাছে আট যুগ ঠেকছে মিত্রা। সত্যিকথা বলতে কি আর পেরে উঠছি না আমি। সব দিক দিয়ে দেউলে হয়ে গেছি আজ। মুখে যত সাহসই দিই না কেন রমাকে, আজ আমি সর্বস্বান্ত। বড় অসহায় বোধ করছি এখন থেকেই। রমার মুখে অন্ন দিতে পাচ্ছি না, পরনে বস্ত্র দিতে পাচ্ছি না। তার কচি ছেলেটাকে কাল যে কি খেতে দেব জানি না। নিজেরও অবস্থা সঙ্গীন। দুখানি বস্ত্র ছাড়া তৃতীয় বস্ত্র কিচ্ছু নেই। এমন সেলাই করা জীর্ণ বস্ত্র আমি পরিনি কখনও। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে কোন মতে দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছি শুধু—কবে পয়লা ডিসেম্বর আসবে সেই আশায়। তারপর আমার মুক্তি।

সঙ্ঘমিত্রা বলে উঠে, মুক্তি তোমার এ জীবনে নেই মঞ্জু। সোনার শিকল পায়ে পরেছ তুমি নিজে। এ খুলতে পারবে না কোন দিন। কিন্তু আমি তোমায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ভাই। প্রেমের তপস্যায় আজ তুমি বিজয়িনী। পার্বতী তপস্যা করেছিলেন শিবকে পাবার জন্যে। তুমি করছ সেনকে পাবার জন্যে। অবশ্য আমি তুলনা করি না। কিন্তু তোমার তপস্যাও নেহাত ফেলনা যায় না মঞ্জু। আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। অসিতবাবুর ওপর আজ আমার রাগ নেই, দ্বেষ নেই। যিনি তোমার মত মেয়ের মন পেয়েছেন তিনি আমার নমস্য।

এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, প্রতিরক্ষার কয়েকটি বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদের ভার নিতে এগিয়ে এলেন জাতীয় বীরবৃন্দ, এমন সময়ে প্রশ্ন উঠল কে নেবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্তৃত্বভার?

১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল—বাংলার কৃতি সন্তান শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয়রূপে এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে নবযুগ এল, পুরাতনের পরিবর্তে এল জেট বিমান।

১৯১১ সালের ৫ই মার্চ কলকাতায় তাঁর জন্ম। এই সহরেই তাঁর প্রথম জীবনের লেখাপড়া।

এল ১৯৫২ সাল। ইংলণ্ডে গেলেন তিনি। বিমান বাহিনীতে ভারতীয়দের তখন গ্রহণ করা সুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি নতুন বৃত্তিগ্রহণ করলেন।

১৯৩৩ সাল—ভারতীয় বিমান বাহিনী গঠিত হোল, তিনি এর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

১৯৩৯ সালে সুব্রত মুখোপাধ্যায় হলেন স্কোয়াড্রনের প্রধান। এই সময়ে উপজাতি আক্রান্ত সীমান্ত ঘাঁটি রক্ষায় দুঃসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দিয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হন।

১৯৪৩ সালে শ্রীমুখার্জি হন কোহাট বিমান ঘাঁটির প্রধান। ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ রাজাকর আন্দোলনে তিনিই ভারতীয় বিমানবাহিনী পরিচালনা করেন।

উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে একটি কর্মময় প্রতিভাদীপ্ত জীবন নিভে গেল—এ বেদনা মুছে যাবার নয়। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, দরিদ্র মানুষের সমব্যথী ও তাদের কাছে সহজলভ্য। বাঙলার গৌরব করবার মত একটি মানুষ অকালে বিদায় নিলেন—এ আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য।

নির্বাচনী পরিহাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কেনেডির বয়স ৪৩ বৎসর কিন্তু তাঁকে দেখায় আরো কম। ঐ বয়সে তিনি এত গুরুদায়িত্ব বহনের উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে ভোটদাতাদের মধ্যে প্রচুর সংশয় ছিল। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

জোসেফ পি কেনেডি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট কেনেডির পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন: জীবনে তুমি কি হতে চাও?

পুত্রের উত্তর: আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই।

তৎক্ষণাৎ পিতার প্রশ্ন: জানি—জানি, কিন্তু তুমি বড় হয়ে কি করতে চাও?

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট

জন এফ কেনেডি আগামী চার বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর বয়স ৪৩ বৎসর। বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন এমন অন্য কেউ আজ পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাসাচুসেটস্ রাজ্যে মিঃ কেনেডির জন্ম। হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভের পর তিনি লণ্ডনস্কুল অব ইকনমিক্সে হ্যারল্ড লাস্কীর ছাত্ররূপে পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে এক টর্পেডো বোটের অধিনায়ক রূপে লেঃ কেনেডি যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন একটি ঘটনায় তাঁর অসমসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ধকার রাতে জাপানী ডেষ্ট্রয়ারের আক্রমণে তাঁর টর্পেডো বোট ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। সঙ্গীসহ পনেরো ঘণ্টাকাল সমুদ্রে চলে তাঁর জীবনমরণ সংগ্রাম। তিনি আহত হন। তা সত্ত্বেও তিনি সঙ্গীদের নিয়ে আসেন বোটের ভাসমান টুকরোর কাছে এবং সেখান থেকে সাঁতার কেটে এক দ্বীপে ওঠেন। পাঁচদিন ধরে নানা সঙ্কেতবার্তার সাহায্যে তিনি তাঁর ইউনিটের সংগে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। অবশেষে নারকেলের ওপর ক্ষোদিত একটি লিপি নিউজিল্যাণ্ড ইনফ্যান্ট্রির কাছে পৌঁছায় এবং প্রহরান্তে দলবলসহ তিনি উদ্ধার পান। এই বীরত্বের জন্য তাঁকে মার্কিন নৌবাহিনীর সম্মানজনক পদক দান করা হয়।

এরপর তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন ও ২৯ বছর বয়সে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ক্যাবটলজকে পরাজিত করে তিনি সেনেটে নির্বাচিত হন।

১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী মিঃ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে অধিষ্ঠিত হবেন।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগে শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণ

নিউ দিল্লীস্থ শিশু-চলচ্চিত্র সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ দিবাকর সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে আমেরিকার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সঙ্গে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শন উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতে শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞবৃন্দ ভারতে আসতে পারেন। ভারত ও আমেরিকার শিশু-জীবন নিয়ে যে চলচ্চিত্র তৈরী হবে তা কেবল মাত্র তথ্যমূলক হবে না, তাতে থাকবে বাস্তব জীবনকাহিনী।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি চিত্রনাট্য রচনায় হাত দেবেন।

গ্রীসের ইতিহাসের একটি উড়ো পাতা···

এজিয়ান সমুদ্রের একটি দ্বীপে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ পাঠানো হোল স্পার্টানদের কাছে।

লোকটি এসে লম্বা বক্তৃতা জুড়লে। তার কথা শেষ হ'লে স্পার্টানরা বললে, আপনি গোড়ার দিকে কি যে বললেন ভুলে গেছি আর তাই শেষের কথাগুলো বুঝতে পারিনি।

অতঃপর তাকে ফিরতে হোলো শূন্য হাতে।

এবার অন্নাভাবগ্রস্ত দ্বীপ থেকে পাঠানো হোল এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে। সে প্রচুর থলে নিয়ে হাজির হোল স্পার্টানদের কাছে। একটা থলি খুলে শুধু বললে: এটা খালি, ভর্তি করে দিন।

উদ্দেশ্য সফল হোল। একটা নয়, সব থলে ভর্তি হয়ে গেল।

যেখানে দরকার কাজ সেখানে বেশী কথায় কি প্রয়োজন!
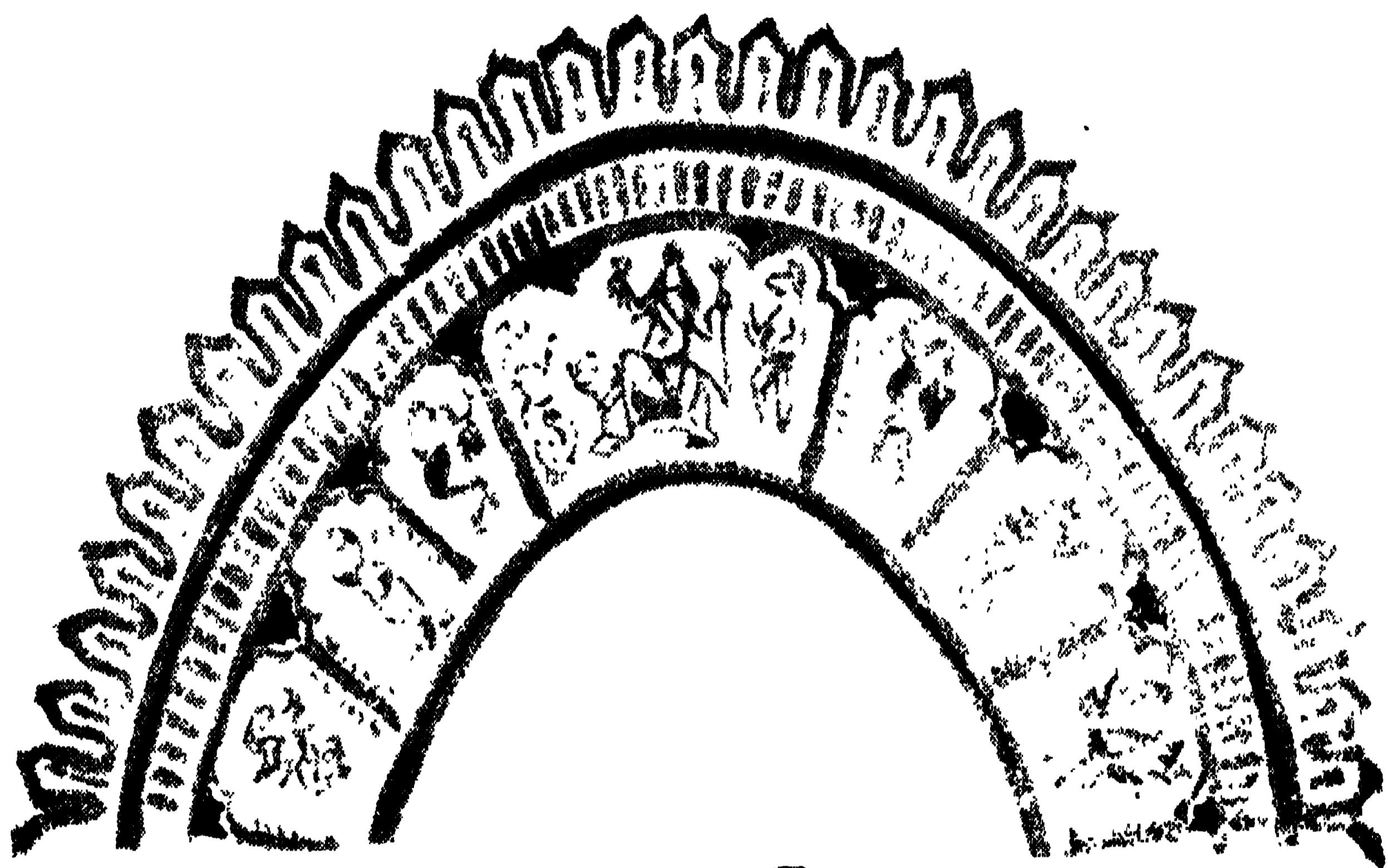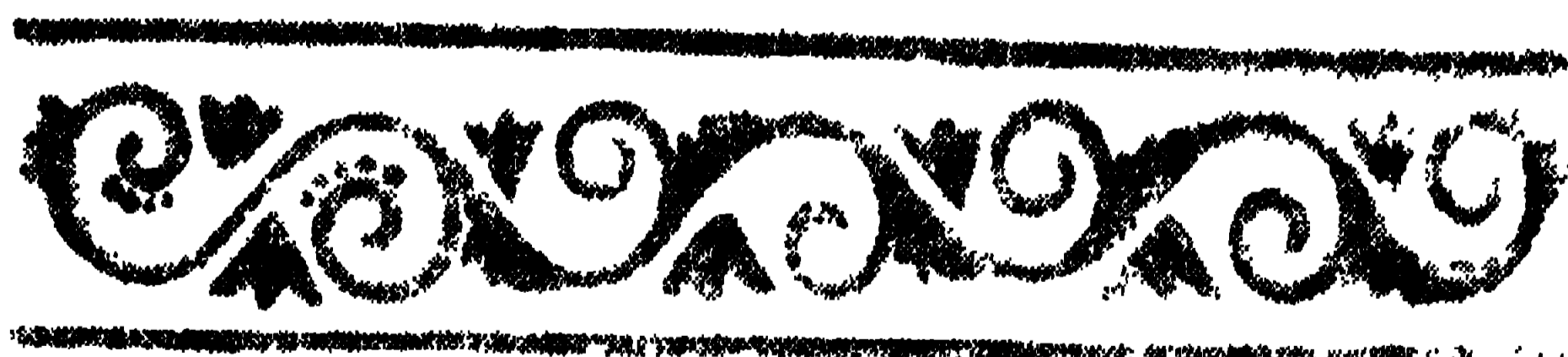
॥ বাংলার চিত্রশিল্প ॥

প্রাচীন বাংলার চিত্রকলা

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার পটচিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা নেই এমন বাঙ্গালী খুব কমই আছে। পটশিল্পের প্রবহমান ধারা আজ শুকিয়ে গিয়ে থাকলেও একসময়ে পটুয়ার আঁকা ছবি দেখা বাংলার গ্রামীন সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ বলেই গণ্য হত। যমপটের ছবি ছাড়াও বীরভূম, বাঁকুড়া আর কালীঘাটে পোটোরা গেরস্থ ঘরের জন্য যে ছবি আঁকত সে ছবির কিছু কিছু এখনও দেখা যায়। বাঙ্গালীর চলিতধারার চিত্রকল্পের আরও পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিমার চালচিত্রের দেবতা অসুর, আর পশুর মূর্তিতে। এই সব নানাধরনের ছবি দেখলে স্বভাবতই অনুভব না করে পারা যায় না যে এই ধরনের ছবি আঁকার প্রচলন নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে হয়নি। অনেকদিনের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এই ধরনের ছবি আঁকার কৌশল এবং রেখা ও বর্ণের স্বাচ্ছন্দ্য কখনও এতটা বিশিষ্টতা লাভ করতে পারত না।

যমপটের ছবিগুলি সাধারণতঃ দু'হাত থেকে তিন হাত চওড়া এবং বারচৌদ্দ হাত বা তারও বেশী লম্বা হয়ে থাকে। চিত্রগুলি উপখ্যানমূলক ; রামায়ন, কৃষ্ণজীবনলীলা, নরমেধ যজ্ঞ, বেহুলা লখীন্দর কাহিনী, এবং চৈতন্যোপখ্যানই অধিকাংশ পটের উপজীব্য। পাটগুলির নিম্নাংশে পারলৌকিক জীবনে যমপুরীতে মানবাত্মার নানাপ্রকার শাস্তিভোগের দৃশ্য থাকায় এগুলিকে সাধারণ ভাষায় যমপট বলা হত। এই নাম বিষয়বস্তু এবং পট দেখাবার রীতিটি যে কত পুরোনো তার পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাসদ বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিতে। পিতার সংকটাপন্ন পীড়ার সংবাদে গৃহপ্রত্যাগমনমুখী হর্ষ নগরদ্বার অতিক্রম করে পথিপার্শ্বে কুতূহলী জনতার সম্মুখে চিত্র ব্যাখ্যানরত যমপট্টিকের অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন। বাংলার পটের মত লম্বাপটের প্রচলন রাজস্থানের জৈনদের মধ্যেও আছে। একধরনের নিমন্ত্রণ পত্ররূপে ব্যবহার করা এই ধরনের পটকে বিজ্ঞপ্তিপত্র বলে। কিছুকাল আগে গুজরাটেও চিত্রকথি নামে এক পট দেখান সম্প্রদায় এমনি পট এঁকে বাংলাদেশের পোটোদের মতই দেখিয়ে বেড়াত। পটচিত্রের এই বিস্তৃত প্রচলন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বেশ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে পটচিত্রের প্রচলন রয়েছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে, মহাকবি ভাসের রচিত নাটকে এবং রামায়ণে প্রাচীন ভারতে শিল্পকলার অস্তিত্বের যে আভাস পাওয়া যায়। অজন্তা ইলোরা তিরুনাল্লিকড়াই ইত্যাদি অঞ্চলের পর্বতগুহায় এবং 'মন্দিরে' যে চিত্র সাধনার পরিচয় আজও উজ্জ্বল রয়েছে তার কিছু অংশ যে বাংলাদেশেও ছিল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে নেপাল থেকে সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিচিত্র থেকে। এই পুঁথিচিত্রগুলির ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং মূল্যবান। এর কয়েকটি পুঁথি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায়, কয়েকটি ইংলণ্ডে, কয়েকটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়ও কিছু পুঁথি আছে। অবশ্য এই পুঁথিগুলির সবই বাংলায়ই লেখা বা আঁকা হয়েছিল তা নয় ; কয়েকটি নেপালের পুঁথিও আছে। তবে ছবির ঢং আর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ছবিগুলি একই শ্রেণীর বা শৈলীর অন্তর্ভুক্ত।

পুঁথিগুলি সবই মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুঁথি ; পুঁথির মধ্যে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতাই প্রধান। কোন কোন পুঁথিতে একাদশ শতকের বাংলায় যে পালরাজবংশ রাজত্ব করত সেই বংশসম্ভূত কোন কোন সম্রাটের নাম ও রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে লিপিতে বইগুলি লেখা সে লিপি সেই যুগে বাংলা দেশে বা পূর্বভারতে চলত। পুঁথিগুলির সবই তালপাতায় লেখা ; আশুতোষ মিউজিয়ামে দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি কাগজের ওপরে লেখা বইও আছে।

ছবিগুলির মূল বিষয়বস্তু বৌদ্ধশাস্ত্রাশ্রিত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী বা বুদ্ধের জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অধিকাংশ ছবিই চৌকো চৌকো খোপের মধ্যে আঁকা ; কোথাও পুঁথির কাঠের তৈরী পাটার গায়ও ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলার পটচিত্রের ছবিগুলি রচনা কৌশল এবং বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে পটুয়ারা কাগজের সঙ্গে কাগজ জুড়ে একটা লম্বা পট তৈরী করে, কাগজের এই চাদরটাকে শক্ত করবার জন্য এর ওপর দিকটাতে কাপড়ের টুকরো জুড়ে দেওয়া হয়। তার উপরে দেওয়া হয় মাটি আর গোবরের প্রলেপ। এই প্রলেপ শুকিয়ে গেলে পাতলা খড়িমাটির প্রলেপও লাগিয়ে ছবি আঁকবার জমি তৈরী করে নেওয়া হয়। পরপর এক একটা বিশিষ্ট ঘটনার ছবি সাজিয়ে আখ্যানভাগ গড়ে তোলা হয় ; মোটা তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে কালোরঙের রেখার বাঁধুনি ; ভেতরের জমি সমান করে ভরিয়ে তোলা হয় হলদে লাল সবুজ আর ফিকে নীল রঙে। সোণালী আর রূপালী রঙের বিন্যাসও দেখা যায় গয়নায় আর কাপড়ের আঁচলে। বড় মোটা রঙ, বেশ ফলাও করে দরাজ হাতে বুলানো। গল্পগুলির আবেদন চমৎকার সোজাসুজি এসে মনের গায় দাগ কেটে যায় যারা দেখে তাদের। মানুষের শরীরের গড়নে আর বসা, দাঁড়ান আর চলার ভঙ্গীতে সুন্দর সচেতনতা আর নাটকীয়তার ভাব। এরা যেন সুদূর অতীতের কোন এক সমাজ থেকে যাত্রার আসরে নেমে এসেছে ; কেউ ভুলে যায়নি তার বিশেষ চরিত্রটি, বিচ্যুতি হয়নি কারো পরে নিতে উপযুক্ত পোশাক আর অলঙ্কার। বিগত দিনের সমাজ ইতিহাসের সুন্দর দলিল এই সব ছবি ; চিত্রকরের অতুলনীয় ধ্যানশক্তির স্বাক্ষর এইখানে, সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবার, বুঝবার এবং বোঝাবার এ এক সুন্দর উপাদান।

এই চিত্রকল্পের প্রবাহ বেয়ে অতীতের দিকে গেলে বাঙালীর অতীত শিল্প কীর্তির বেশ কিছু অস্তিত্বের সঙ্গে এখনও পরিচয় ঘটা সম্ভব। যদিও অধিকাংশই তার হারিয়ে গিয়েছে নিঃশেষে। কোন কোন পুঁথিতে ছবি সাজাবার কৌশলটি বেশ লক্ষ্য করবার মত। কেবল যে ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট বন্ধনিযুক্ত খোপের মধ্যে আঁকা হয়েছিল তা নয়, পুঁথিতে ছবির খোপগুলি ঠিক মাঝখানে এবং একটার পর একটা পাতায় পর পর সাজান। দেখতে গেলেই মনে হয় যেন বন্ধনীযুক্ত খোপে আঁকা ছবিতে সাজান একখানি গুটোনো পটের পাট খোলা হচ্ছে আস্তে আস্তে। এই বিশিষ্টতা থেকে আমার মনে হয়েছে যে এগুলি মন্দিরের গায় সাজান পটচিত্রে যাকে বলা হয় টেম্পল ব্যানার তারই পুঁথিগত সংস্করণ। সুপ্রাচীন যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যেও এই ধরনের পটচিত্রের প্রভাব দেখা যায়।

বুদ্ধের জীবনী মহাযান বা তান্ত্রিক দেবদেবীর আলেখ্যসমৃদ্ধ এই প্রাচীন ছবিগুলি ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের জগতে নিতান্তই তুলনাহীন। দেবদেবীদের দেহ গঠনে শিল্পী যে রেখা ব্যবহার করেছে তা যেমনই সূক্ষ্ম তেমনই নিখুঁত এবং অনবদ্য। ঐ রেখায় যেন দেবী দেহের থেকে দ্যোতনাময় লালিত্য সত্যই মূর্ছিত হয়ে আছে বলে মনে হয় ; শিল্পীর ধ্যান নয়নে পরিস্ফুট অতীন্দ্রিয় জগতের রূপাতীত সুষমা মরলোকের জন্য পটে বিধৃত হয়ে

রয়েছে। এখানেও নানা বর্ণের বিচিত্র ক্রাড়া ; কিন্তু এই বর্ণসম্ভার পরবর্তী যুগের পটচিত্রের মত মোটা বা প্রখর নয়, স্নিগ্ধ এবং কোমল ; অথচ উজ্জ্বল ও নয়নাভিরাম। দেহভঙ্গির বিন্যাসের যে গতিপ্রবণতা দেখা যায় আননে যে স্মিত হাস্যের বিন্যাস পরবর্তী যুগের পটচিত্রের নাটকীয়তার সেইখানেই সূত্রপাত হয়ে থাকলেও এই ভঙ্গি লীলামধুর।

বৌদ্ধ ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের জগৎ অতি প্রশান্ত মনোলোকের জগৎ। এখানে মানুষের চাঞ্চল্য এবং উদ্বেলতা ধ্যানের মহিমায় স্থির ও আত্মসমাহিত। রঙ ও রেখায় এখানে অনুরাগের বর্ণচ্ছটা অপেক্ষাও চিত্তের স্থৈর্য এবং মননের গভীরতাই বেশি পরিস্ফুট। এই ছবিতে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি অপেক্ষাও অতিন্দ্রিয় ধ্যান জীবনেরই আলেখ্য দেখা যায়। এই স্নিগ্ধ নক্ষত্রালোকিত জগতের বিচরণশীল দেবদেবী যেন বিশ্বের নরনারীকে জানাচ্ছে সেই উর্ধ্ব জগতের আমন্ত্রণ, যেখানকার আকাশ ভগবান বুদ্ধের করুণাধারায় আপ্লুত। ধ্যান জগতের প্রতিচ্ছবি এমনভাবে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও চিত্রলোকে, বিধৃত হয় নাই। বাংলার শিল্পীর এই চিত্রলোক সত্যই এক অনবদ্য সৃষ্টি।

শিল্পীর প্রাণ চায় মুক্তি। জীবিকার ঘানি থেকে চিরকালের ছুটি।

সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী প্রাণ। মাঝে মাঝে কাজের তাগিদ আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি সোজা হাঁকিয়ে দেন।

অবশেষে এলেন স্বভার আশুতোষ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

আশুতোষ বললেন—অবনীবাবু, বছরে আপনি ছটি বক্তৃতা দেবেন, আমরা সকলে শুনে ধন্য হব, একে কি চাকরি বলে ?

অবনীন্দ্রনাথ উত্তর করলেন—ঐ যে মাস-মাইনে, ঐটেতেই তো ভয়।

তৎক্ষণাৎ আশুতোষের জবাব—মাইনে কোথায়, ও তো অর্ঘ।

অবনীন্দ্রনাথ ধরা দিলেন, সেই বন্ধনই হোল মুক্তি, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর চিন্তাধারা মুক্তিলাভ করল বাগেশ্বরী বক্তৃতার মধ্যে।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের স্মরণে

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের, তথা সমগ্র এসিয়ার আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে স্বর্গারোহণ করেছেন,—নয় বৎসর গত হোলো, এখনও দেশের মানুষ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাকৃৎ—ভারতের নবযুগের কলা-শিল্পীর পথিকৃত—একজন অলৌকিক প্রতিভাধর ওস্তাদ শিল্পীর চিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে নাই। বিলাতের বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী টার্‌নারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই—জন রস্‌কিন্—টার্‌নারের চিত্রাবলীর বৈজ্ঞানিক সূচী নির্ম্মাণ করে—তাঁহার চিত্রের সমীক্ষণ সমালোচনার পথ সহজ করে দিলেন। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের তিরোধানের ৯ বৎসর পরেও—আমরা জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চিত্রাবলীর সূচী নির্ম্মাণ করিতে পারি নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠচিত্রের উপযুক্ত রঙীন প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়া—তাঁহার কলাকৃতির সঠিক সমালোচনার পথ সুগম করিতেও পারি নাই। তাঁহার অলৌকিক বর্ণ-রচনা—স্থূল সস্তা প্রতিলিপিতে সমালোচকের চক্ষের সামনে উপস্থিত করা যায় না। বহু বৎসর পূর্ব্বে—তাঁহার কয়েকখানি চিত্র উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মুদ্রিত রঙীন প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন এইসব প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। সুতরাং দেশের লোক দেশের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের চিত্ররচনার স্বাদ ও স্মৃতি ভুলিতে বসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্রের আংশিক প্রদর্শনী হয় বটে, কিন্তু, স্বল্প-স্থায়ী কয়েকদিনের প্রদর্শনীতে—তাঁহার মৌলিক কলা-সৃষ্টির স্থায়ী ধারণার সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। রবীন্দ্র ভারতীর ভবনে অবনীন্দ্রনাথের স্থায়ী প্রদর্শনীর প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইলেও তাহা সারা ভারতের রূপরসিকদের চাহিদা পূরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহার চিত্রাবলীর সহজ অনুশীলনের একমাত্র উপায় হইতেছে—তাঁহার কলা-শিল্পের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া—সারা পৃথিবীতে বিকীরণ করা। উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির মারফত য়ুরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ওস্তাদগণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা অনায়াসে অনুশীলন ও সমালোচনা করিতে পারিতেছি। কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির অভাবে—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্তহারী রূপ-সৃষ্টির নমুনা দেশবাসীর নিকট "নিষিদ্ধ ফল" হইয়া, টিনের পেটিকার মধ্যে কারারুদ্ধ আছে। আধুনিক রূপসাধকদের কোনও কাজে আসিতেছে না। তাঁহার চিত্রাবলীর প্রচার ও আস্বাদনের উদ্দেশে—"অবনীন্দ্র-পরিষদ" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহারা এতাবৎ কাল আচার্য্যের সৃষ্টির যথাযথ প্রচারের কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই। আচার্য্যের অনেক সুযোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন—তাঁহারাও এবিষয়ে অনেকটা নিশ্চেষ্ট ও অলস।

আমাদের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিমালা বিস্মৃত হইয়া,—আমাদের বাংলার সংস্কৃতির বড়াই ও আস্ফালন একান্তই হাস্যাস্পদ।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে বাংলার সাহিত্যিকরা এক মূল্যবান সাহিত্যের সম্ভার সৃষ্টি করে তুলেছেন,—বিশেষত, কথা-সাহিত্যের বিভাগে—যার তুলনা বোধ হয়

ফরাসী সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও মেলে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর ও অবাঙ্গালীর দান মহনীয় এবং মহামূল্য। কিন্তু রূপ-চর্চার ক্ষেত্রে,—রূপ-সাধনার পথে আমাদের জাতীয় জীবন এখনও অনেকটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্যান্য সভ্যদেশে, রূপ-বিদ্যার চর্চা, রূপসৃষ্টির আদর, শিক্ষা ও সমাজের একটি অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। কি আধুনিক, কি প্রাচীন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির গুণ গ্রহণ করিবার শক্তি আমরা বহুদিন হারিয়ে বসেছি। তাহার ফলে দেশের চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমাদের মনে কোনও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতে পারে না। কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে ভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা উনিশ শতকের মাঝামাঝি শুষ্ক হয়ে এসেছিল; এবং ইতিমধ্যে বিদেশী ইউরোপীয় শিল্পের মোহ আমাদের পরাধীন মনকে এমন আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন করেছিল যে তার ফলে আমরা আমাদের প্রাচীন শিল্পের গৌরবের ইতিহাস একবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে, ইংরাজের প্রভাব ভারতবাসীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিল যে ভারতের রূপসৃষ্টির প্রতিভা নাই। শিল্প ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, ইন্দ্রিয়-বিদ্বেষী ভারতের দর্শন-শাস্ত্র ভারতের রূপসৃষ্টির পথে বাধা রচনা করেছে। এইজন্য প্রাচীন ভারতে গ্রীক ও অন্যান্য যুগের কলা-সৃষ্টির তুলনার যোগ্য কোনও কলা-শিল্পের ইতিহাস গড়ে ওঠেনি।

ভারতীয় রূপ-সাধনা ও রূপতত্ত্বের ইতিহাসের এই অলীক আরব্য-উপন্যাস আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিতে পারেন নাই। তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতের চিত্রসাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য অবশ্যই আছে—এবং প্রাচীন যুগের চিত্র-শিল্পের নমুনা কিছু না কিছু কোথাও বর্ত্তমান আছে। সেই প্রাচীন নমুনা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পেলে, তাহাকে অবলম্বন করে নূতন যুগের উপযোগী জাতীয় চিত্রপদ্ধতির সূত্রপাত করা সম্ভব হতে পারে। তিনি অনুসন্ধান করিতে সুরু করিলেন—প্রাচীন ভারতের রেখা-রীতি কি জাতীয়, তাহার চরিত্র কি, তাহার ঐতিহ্য কি? মানুষ যাহা একান্তমনে খোঁজে তাহা নিশ্চয়ই লাভ করে। অনেক অনুসন্ধানের পর অবনীন্দ্রনাথ একখানা প্রাচীন চিত্র সমষ্টির সংগ্রহ বা এল্‌বাম্ (মুরক্কা) পেলেন—তাহাতে অনেক প্রাচীন মুঘল "কলমে" লেখা ছবি ছিল। এই ছবিগুলির মারফত তিনি ভারতের মধ্যযুগের রেখা-রীতির পদ্ধতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পেলেন। ক্রমে রাজপুত শৈলীর কয়েকটি ছিন্ন চিত্র তাঁর হাতে পড়ল। ইহার মারফৎ অবনীন্দ্রনাথ হিন্দু চিত্রশৈলীর প্রকৃতি কি তাহার পরিচয় পেলেন। এইরূপে তাঁর চোখের সামনে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের ঐতিহ্যের অনুশীলনের পথ প্রকাশিত হোল। ইতিমধ্যে ই, বি, হ্যাভেল্ মাদ্রাজ থেকে বদ্‌লি হয়ে কলিকাতার সরকারী কলাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হলেন। হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ-ও প্রাচীন চিত্র-শিল্পের নানা নিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করিতে শুরু করিলেন। ভারতের গৌরবময় কলা সাধনার ঐতিহ্যের ইতিহাস এইসব প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইসব নানা নিদর্শন অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে, মধ্যযুগের ভারতের চিত্রলেখার ভাষা অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করে নিলেন, এবং সংকল্প করলেন যে এই প্রাচীন ভাষাকে তিনি নূতন পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কলা-সৃষ্টি থেকেও তাঁর উদ্দেশ্যের উপযোগী নানা উপাদান সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। পক্ষান্তরে চীন ও জাপানের চিত্রাবলী অনুশীলন করে তা থেকে ভারতের নবীন পদ্ধতির চিত্ররচনার উপযোগী উপকরণ ও শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন ভাষায়—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কলারীতির অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হলো। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন ভারতীয় চিত্রের ভাষা প্রাচীন চিত্রের

অনুকরণ বা পুনরাবর্ত্তন নহে,—প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে তাহাকে ভিত্তি করে, নূতন পথে ভারতীয় চিত্রের জয়-যাত্রা।

এই নূতন পদ্ধতিতে চিত্রিত তাঁহার প্রথম চিত্র "শাজাহানের শেষ জীবন" ১৯০৩ সালে লাট কার্জন সাহেবের দিল্লীর দরবারের প্রদর্শনীতে দেখান হোলো,—নানা কোলাহল ও গুঞ্জনের মধ্যে—চিত্রখানি প্রথম পারিতোষিক লাভ করিল।

তারপরে, নবীন পদ্ধতিতে রচিত তাঁর কয়েকখানি চিত্র, "বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী", "মেঘদূত", "বুদ্ধ ও সুজাতা", "অভিসারিকা" ইত্যাদি ছোট ছোট মিনিয়েচার্—বিলাতের বিখ্যাত মাসিকপত্র "ষ্টুডিয়োর" পাতায় রঙীন্ প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হোল। এই প্রকাশের পর বিলাতের রসিক সমাজ ভারতের চিত্র-সাধনার এই নবীন উদ্বোধনকে প্রীতির চক্ষে অভিনন্দিত করিলেন। অনেকেই স্বীকার করিলেন যে, য়ুরোপের রীতির অনুকরণে নহে,—বরং ভারতের নিজস্ব সত্বাকে অনুসন্ধান করে—ভারতের নিজস্ব আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই—ভারতের প্রাচীন সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা নূতন যুগে, নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, এবং সেই পথেই জাতীয় আত্মা, জাতীয় ঐতিহ্য স্বার্থকতা লাভ করিবে। জাতীয়তার পুরোহিত অবনীন্দ্রনাথ—তাঁহার অলৌকিক চিত্রমালার মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁহার চিত্রসৃষ্টিতে ভারতের জাতীয় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নূতন রূপ নিয়ে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে—আমাদের সমসাময়িক রূপসাধকরা—অবনীন্দ্রনাথের চিত্রমালার স্পর্শ হারিয়ে—পশ্চিমে রীতির অনুকরণের পথে, বিপথে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিত্রমালার স্থায়ী প্রদর্শনী ও উপযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির মারফৎ—তাঁহার সাধনার "বাণী"—ব্যাপকরূপে প্রচারিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই সম্বন্ধে আমাদের সমাজের চিত্র-প্রেমীদের এবং জাতীয় সরকারের অনেক কিছু কর্ত্তব্য আছে।

প্রচীন শিল্প এবং সেই সব শিল্পে ওস্তাদ মানুষ সব থাকতে কি উপায়ে কোন রাস্তায় শিল্পকে অধিকার করা চলে তাই ভাবতে বসেছি আমরা, অথচ এই সহরের বুকেই শিল্পী-পাড়া সমস্ত বিদ্যমান, কাঁসারী পাড়া, পটুয়াটোলা, কুমোরটুলি, বাক্সপটি ইত্যাদি! . . ...শিল্প শিক্ষাকে অধিকার করতে চাই তার বিষয়ে উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু তাদের উপরে শ্রদ্ধাও নেই, বিশ্বাসও নেই এমন আমাদের যে তাদের প্রথাও শিক্ষা-প্রণালীকে আধুনিক শিল্প-শিক্ষালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান দিই।

—অবনীন্দ্রনাথ

বাংলার চিত্রশিল্প ॥

বুদ্ধ ও সুজাতা

গন্ধ ভারতী

শিল্পী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রার্থনারত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮৯০)
শিল্পী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে কথকতা (১৮৯২)

পুরী সমুদ্রতীরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদ সংকীর্তন করিতেছেন

বধূ

শিল্পী—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

এ শতকের প্রথমদিকে যে নব্য ভারতশিল্পের সূত্রপাত হয়, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে গগনেন্দ্রনাথের নাম আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। অথচ যে আদর্শবাদ থেকে এই শিল্প আন্দোলনের শুরু, শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ ও শিল্পসৃষ্টি তা থেকে এতো বিভিন্ন যে এই আন্দোলনের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি সত্যই বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে সেদিনের সেই আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই কোলাহলের মধ্যে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের নামও তালিকাভুক্ত হয়েছিলো। এখনো পর্য্যন্ত তাঁকে আমরা সেই আন্দোলনের অন্যতম শিল্পরথী হিসেবেই সম্মান দিয়ে এসেছি, তাঁর একাকীত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ঐশ্বর্য আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গিয়েছে।

আজকের দিনে কোন শিল্পীর পক্ষে পথ নির্বাচনের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তার সম্মুখে রয়েছে বিভিন্ন পথের সুস্পষ্ট পরিচয়। কিন্তু সেই যুগে একদিকে হ্যাভেল-পূর্ব সরকারী শিল্পপদ্ধতি আর একদিকে নব্যভারতীয় শিল্পধারার পরীক্ষণ অবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীকে পথ নির্বাচন করে নিতে হতো। এই দ্বিতীয় পথের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পীর লক্ষ্যে পৌছানোর সম্ভাবনা আছে এই সিদ্ধান্তে গগনেন্দ্রনাথও পৌছেছিলেন। কিন্তু সেদিনের নব্যভারতশিল্পের রাজপ্রাসাদ রচনায় তাঁর আনাগোনা শুধু কর্মী হিসেবেই। তাঁর শিল্পের মহল সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র এবং সেখানে তিনি একান্তভাবে নিঃসঙ্গ। তাঁর শিল্পরচনাকে কোনভাবেই কোন দলভুক্ত করা চলে না।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের প্রাথমিক সাধনার সূত্রপাত নিজের অন্তর্নিহিত তাগিদে। পেনসিল, কলম অথবা তুলি দিয়ে আঁকাজোকা করতে তার ভালো লাগতো। চোখের সামনে যা কিছু প্রাণময় বলে মনে হয়েছে, তাকে রেখা দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু জাপানী শিল্পী টাইক্কান ও আরাই যখন কোলকাতা পরিভ্রমণে এলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় তাঁর শিল্পীচিত্ত এক নতুন রূপে ব্যঞ্জনার সন্ধান পেলো। এই সময় থেকেই গগনেন্দ্রনাথের প্রকৃত শিল্পীজীবনের শুরু। জাপানী প্রথায় তুলি ও কালো রঙ ব্যবহারের মধ্যে তিনি রূপ প্রকাশের এক নতুন ইঙ্গিত পেলেন। কালো রঙের বিস্তারের মধ্যে দিয়ে যে বিভিন্ন বর্ণস্তরের সৃষ্টি হয় তার আবেদন এত বিচিত্র ও সূক্ষ্ম, এই পদ্ধতির মধ্যেই শিল্পদৃষ্টি এক নতুন রহস্যের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভার লক্ষণ প্রভাবের দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়া নয়, তাকে আপন ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করা। এই সময়ে গগনেন্দ্রনাথের অনেক রচনাই জাপানী শৈলাশ্রয়ী, অথচ নিজস্ব পরিবেশ ও ভাবাবেগে তা একান্তভাবে স্বকীয় সৃষ্টির ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এই সময়ের নিসর্গচিত্র, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির চিত্র ও চৈতন্য চিত্রাবলী থেকে তাঁর দৃষ্টির বিশিষ্টতা ধরা পড়বে।

সমকালীন শিল্পীদের রচনা থেকে তাঁর শিল্প রচনার পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যদিও রেখাই তাঁর ছবির প্রধান আশ্রয়, কিন্তু রচনার মেজাজ কোনক্রমেই অজন্তা, মোগল চিত্রকলা অথবা ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুসারী নয়। এই কারণেই পৌরাণিক কাহিনী অথবা সুদূর ইতিহাস তাঁকে কোনদিনই আকৃষ্ট করেনি।

তাঁর শিল্পী মানস দুটি সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। একদিকে মোহমুক্ত বাস্তব অনুভব তার রূপসৃষ্টিকে এক বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর একদিকে এক নিগূঢ় রোমান্টিক চেতনা এক অদৃশ্য রূপজগতকে উদ্ঘাটিত করেছে। প্রথম যুগের চিত্রাবলী শিল্পীর বাস্তব চেতনারই চিত্রসংস্করণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রাবলীর প্রথম পদক্ষেপ দেখা দিল কিউবিজম্ আশ্রয়ী চিত্র রচনার মধ্যে দিয়ে। আমাদের দেশে সাধারণ শিল্পরসিকের কাছে এখনো পর্যন্ত তিনি ভারতশিল্পে কিউবিজমের প্রবর্তক হিসেবেই পরিচিত। অথচ যে মানসিকতা এই সুদূর বিদেশী শৈলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা অনুভব করেছিল তার রহস্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা একেবারে অচেতন এবং য়ুরোপীয় শিল্পে কিউবিজমের উদ্ভব ও শিল্পপ্রয়োগ রীতির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম আশ্রয়ী রচনার যে মূলগত পার্থক্য সে সম্বন্ধেও আমাদের অজ্ঞতা আশ্চর্যজনক।

য়ুরোপীয় শিল্পে জিয়োত্তো থেকে যে শিল্পপদ্ধতির উদ্ভব তার মূলকথা হলো দৃশ্যবস্তুকে যথাযথ ভাবে রূপ দেওয়া। এইভাবেই সুদীর্ঘকাল ধরে শিল্পীরা বস্তুর ও প্রকৃতির যথাস্থিত অবস্থাটি ধরবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশেষে গত শতাব্দীর শেষের দিকে এসে এ সাধনার নৌকা চড়ায় ঠেকে গেল। দর্শকের চোখকে ফাঁকি দেবার মধ্যে যে শিল্পের উৎকর্ষ ও সার্থকতা নেই এই সত্য উপলব্ধি করে অনেক শিল্পী জেগে উঠলেন। নতুন করে নন্দনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে শুরু হলো। সেই নব্য আবিষ্কারের একটা দিক দেখা গেলো ত্রিকোণবাদ বা কিউবিজম্ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এদের মতে দৃশ্যমান বস্তুজগৎ ফর্ম বা গঠনের দিক থেকে কতগুলি ত্রিকোণের সমষ্টি। মানুষ, পশু, প্রাণী, ঘর, বাড়ী, পাহাড় সব কিছুই এই ত্রিকোণ গঠনের আধারে ব্যক্ত। নতুন দৃষ্টিকোণ হিসেবে এই তত্ত্বের মধ্যে অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্প যখন তত্ত্ব ছেড়ে তথ্যের মধ্যে এলো তখন দেখা গেল বস্তুরূপের বহিরঙ্গের দিক একেবারেই অন্তর্হিত এবং শিল্পীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বস্তুরূপ নিছক জ্যামিতিক প্যাটার্ণ সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথ যখন তার শিল্পে ত্রিকোণবাদের সাহায্য নিলেন তখন তার দৃষ্টি কোনক্রমেই বিশ্লেষণী নয়। য়ুরোপীয় কিউবিজমের মধ্যে প্যাটার্ণ সৃষ্টির যে ইঙ্গিত আছে, সেইটুকু তিনি তাঁর শিল্পে আশ্রয় দিলেন। অথচ সে প্যাটার্ণ-সৃষ্টিও গাঠনিক (fromal) নয়। আলোছায়ার রহস্যে ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যে তা শত বিচিত্র। বস্তুতঃ এই প্যাটার্ণ সৃষ্টির রহস্যই গগনেন্দ্রনাথকে কিউবিজমের দিকে আকৃষ্ট করেছিলো। একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেই ধরা পড়বে শিল্পরচনার অন্যতম সৌকর্য রয়েছে প্যাটার্ণ সৃষ্টির মধ্যে। কবিতার সব মাত্রা ও ধ্বনির মূলেও এই প্যাটার্ণ সৃষ্টির বাসনা। চিত্রশিল্পে প্যাটার্ণের উদ্ভব রেখা ও রঙের নির্দিষ্ট অনুবৃত্তিতে যার উদ্দেশ্য একটা সমতাল সৃষ্টি এবং তার মধ্যেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ একটা বিশেষ তৃপ্তি পায়।

গগনেন্দ্রনাথের রচনায় ত্রিকোণবাদের একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করা গেল পরবর্তীকালে। কিউবিজমের একটা অদৃশ্য ছায়া তাঁর রচনায় থেকে গেলেও সব চিত্র যেন আলোর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এ আলো রেমব্রান্টের মতো অন্ধকার পটে আংশিক বিচ্ছুরিত দ্যুতি নয় যা দৃশ্যবস্তুর একটি অংশকেই জ্যোতির্ময় করেছে। গগনেন্দ্রনাথের হাতে এ আলো অনেকটা অনৈসর্গিক চিত্রপট—আলো ও রঙের খেলায় বহুবিচিত্র ফুলকারী। এর মধ্যে যেটুকু ঘটনা ও বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে তা এই আলো ও বর্ণের প্যাটার্ণ সৃষ্টির আশ্রয় হিসেবে এসেছে। ফলে বাস্তব ও কল্পনার এমন অভূতপূর্ব যোগাযোগ ঘটেছে যার অভিনবত্ব কোন শিল্পের ইতিহাসেই লক্ষ্য করা যায় নি। এটা ঠিক শিল্পীচিত্তের খেয়ালী কল্পনা নয়। মনের গভীরে যে উপলব্ধি একটা রূপ পরিগ্রহ করে, অথচ বাস্তব জগতের সঙ্গে তার বিশেষ মিল নেই, সেই অবচেতন মনোজগতের সংহত কল্পনা রঙও রূপের আধারে ব্যক্ত হয়েছে। এই মনোজগৎ সুর রিয়ালিষ্টদের

মনোজগৎ নয়, যা অবচেতন মনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে নির্ভরশীল অথবা ইংরেজশিল্পী ব্লেকের ধর্মীয় কল্পনার অদ্ভুত উল্লাস নয়। গগনেন্দ্রনাথের এ জগৎ সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র—কৈশোরকল্পনার পরীর দেশের সৌরভে ব্যাপ্ত।

গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমেই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি একান্তভাবেই মুক্ত শিল্পী। মুক্ত শিল্পী তিনিই যাঁকে কোন ক্রমেই কোন দল অথবা মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ করা চলে না। আমাদের শিল্প ইতিহাসের যে উত্তেজনার মুহূর্তে গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী জীবনের সূত্রপাত, অনিবার্যভাবে সেই বন্যায় তাঁর ভাসা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পপ্রেরণা একান্তভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কোন দল অথবা মতবাদের জালে আবদ্ধ হবার মতো মানসিকতা তার নয়। সেই কারণে নব্য ভারতীয় শিল্পআন্দোলনের মধ্যে থেকেও তিনি চিত্রে ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবনের নামে মোহগ্রস্ত হননি। আবার চিত্রে ত্রিকোণবাদ আমদানীর মধ্যেও য়ুরোপীয় ত্রিকোণবাদীদের জ্যামিতিক গঠনের নিগূঢ় গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর দৃষ্টিকোণ বিশুদ্ধ ত্রিকোণবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপরীত ভাবে কাজ করেছে। চিত্রে গঠনের অমূর্ততার আমদানিই ত্রিকোণবাদীদের প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু রূপসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য গগনেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেনি। তাঁর লক্ষ্য এক প্যাটার্ণসৃষ্টি এবং সেই প্যাটার্ণের মধ্যে এক স্পর্শাতীত ও রোমান্টিক ভাবজগৎ রচনা। বস্তুত গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক শিল্পদৃষ্টির এটি আর একটি অধ্যায়। প্রথম যুগে জাপানী শৈলীর সংস্পর্শে এসে রঙ্‌ বিস্তারের মধ্যে তিনি যে ভাব-জগতের সন্ধান পেলেন তার পরিচয় আছে বিভিন্ন দৃশ্যচিত্র ও চৈতন্য চিত্রাবলীতে। গগনেন্দ্রনাথের কাছে সমগ্র প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ কল্পনার কোমল আভায় আবৃত। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে চীনা শিল্পীর গভীরতার বিস্ময় ব্যঞ্জনা নেই, অথবা য়ুরোপীয় শিল্পের নাটকীয় উত্তেজনা নেই। গগনেন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতির সমগ্র পরিবেশ একান্ত নিরাসক্ত, কোমল ও স্বপ্নময়। এই প্রথম যুগের রচনা মূলতঃ রেখাধর্মী কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন রোমান্টিক কল্পনাবিলাস রেখাকে অতিক্রম করে আলোছায়ার বিচিত্র ও বিপরীত উৎসবের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তখন অনিবার্যভাবেই তার শিল্প স্বপ্নজগতের সন্ধান দিয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের রোমান্টিক আবেদন ও তদনুসঙ্গী রীতি-পদ্ধতি পরবর্তীকালে চিত্রগঠনে কিছুটা শিথিলতা এনে দিলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি কল্পনাবিলাসের সূক্ষ্মতায় ও রহস্যে এক অপূর্ব রূপজগতের সন্ধান দিয়েছে। তার দৃষ্টির মধ্যে যে অগ্রগামীতা ছিলো সেই দৃষ্টিই তাঁকে স্বদেশ ও বিদেশের রূপের পথে পথে আকর্ষণ করেছে। শিল্পের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ ভারতীয়তার আমদানি এই ছিল নব্য ভারত শিল্প আন্দোলনের আদর্শবাদ। গগনেন্দ্রনাথ বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে এলেও তাঁর শিল্প-প্রতিভার বিশেষত্বে যে পুরোপুরি ভারতীয় এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ

চিত্রকলায় নবযুগের স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা যখন ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্যক্ষেত্রে নবযুগের তপস্যায় রত তখন অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব শিল্পিগুরু রূপে। তাঁর বিরাট প্রতিভার আলোকে শিল্পের নবনব দিগন্ত উদ্ভাসিত।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী তিথিতে অবনীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে তখন সংস্কৃতির চর্চা চলেছে বিপুল উদ্যমে। তিনি সেই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যেই লালিত হন। তিনি ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় সন্তান। প্রথমে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি যোগদান করেন, পরে স্বগৃহে শিল্পচর্চা করেন। মিষ্টার পামার ও বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী সিনর গিলহার্ডির কাছে ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা।

অকস্মাৎ জীবনে একদিন এল পরিবর্তনের পালা।

ঠাকুর পরিবারের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে বসে সেদিন তিনি বইপত্তরের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাতে এল প্রাচীন ইন্দো-পারসীক পুঁথি, কী সুচারুরূপে চিত্রিত, কী বর্ণাঢ্য তার অলঙ্করণ, মুগ্ধ হয়ে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সুপ্ত কল্পনা জেগে উঠল, তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্রাবলী সৃষ্টিতে মগ্ন হলেন। ইউরোপীয় শিল্পের ছাত্র কোথায় হারিয়ে গেল, দেখা দিল চিত্রকলার নবীন স্রষ্টা, বিধাতা তাঁর হাতে সৃষ্টির তুলি তুলে দিলেন।

তখন তিনি তেইশ বৎসরের যুবক।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসঙ্গ সাধক দেখা পেলেন এক সহমর্মীর—ই. বি. হ্যাভেলের মধ্যে তিনি পেলেন সমদরদী সহযোগী এক শিল্পীকে, দুজনে একত্রে ভারতীয় চিত্রকলায় নবযুগের উন্মেষ সাধনে ব্রতী হলেন।

এতদিন তিনি ছিলেন নিভৃতে, এবার এলেন দেশবাসীর সম্মুখে। এতকাল দিল্লী-শৈলী, পাটনা-শৈলী ইত্যাদি নামে পরিচিত দেশী চিত্রকলার গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল, শিল্পীরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ, কারিগরী সুলভ শিল্পচর্চার ফলে চিত্রকলার মান অবনত, এক কথায় শিল্পক্ষেত্রে চলছিল এক অবক্ষয়ের অধ্যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় শিল্পকলার তখন অনুসরণ ছিল না, ছিল নিকৃষ্ট অনুকরণ।

অবনীন্দ্রনাথ এলেন অসামান্য প্রতিভার দ্যুতি নিয়ে, চিত্রকলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সংযুক্ত হোল। ভারতীয় চিত্রের নব জন্মদাতারূপে তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। পরিচিত হলেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একজন নব্য পুরোহিতরূপে, ভারত শিল্পের পথিকৃৎ রূপে।

কিন্তু তাঁর এই পরিচয় সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে।

স্বদেশী যুগে এই কথাটাই তাঁর সম্বন্ধে বড় হয়ে উঠেছিল যে তিনি স্বদেশী শিল্পী, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধার তাঁরই হাতে। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল মৌলিক সৃষ্টির দিকে, অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাবজগৎকে শিল্পে বিধৃত করতে চেয়েছিলেন তিনি, কোন কিছু উদ্ধার করার দিকে তাঁর প্রবণতা ছিল না। 'ছবিতে ভাব দিতে হবে'—এ ছিল তাঁরনন্দনাদর্শ। দেশী ছবির

আলংকারিক কাঠামো আর বিদেশী ছবির নিছক বাস্তবতা দুই-ই তাঁর ছবিতে বিস্ময়কর প্রতিভাবলে মিলিত হয়ে এক অভিনব রূপের জন্ম দিল। আধুনিক চিত্রকলার সূচনা হোল তাঁর তুলিতে।

শিল্পক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন অঙ্কনরীতির অনুসারী নন আবার কোন অঙ্কনরীতির প্রবর্তকও নন, আসলে তিনি একজন মৌলিক গুণলক্ষণাক্রান্ত শিল্পী, মহৎ শিল্পী, প্রথম শ্রেণীর স্টাইলিস্ট। চিত্রে তাঁর স্টাইল ফুটে উঠেছে অঙ্কনভঙ্গীর দ্বারা নয়—মনোভঙ্গীর দ্বারা। চিত্রে তিনি রচনা করেছেন কবিতা—এখানের যা সুর তা হোল গীতিকাব্যের—মন্ময়, রহস্যময়, সুস্নিগ্ধ। তাঁর চিত্রের বর্ণপ্রলেপ অত্যন্ত কোমল, সুষমামণ্ডিত।

আধুনিকতার নামে বাস্তবতা বা জ্যামিতিক মার-প্যাচ, চড়া রঙ, প্রখর বৈসাদৃশ্য বা কোনরূপ ইজম তাঁকে তাঁর মৌলিক সাধনক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বাইরের শিল্পকৌশলের বহু মতবাদ উপেক্ষা করে অন্তরের আলোয় পথ চলেছেন তিনি। তাঁর নিজের কথায়—"সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি, এই হল আর্টিস্টের ভাবুকের রূপ সাধনার প্রথা প্রকরণ। চোখ বুজে ধ্যান নয়, স্বপন দেখা নয়, দৃষ্টি সাধনায় বলীয়ান শিল্পী রূপরাজ্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে সন্ধানে চলে গেল অরূপের, যেখানে রূপেরই প্রদীপ রূপের ঢাকনের মধ্যে জ্বলছে। সেখান থেকে নতুনতর দেখা নতুনতর শোনার খবর এনে পৌঁছলেন শিল্পী যখন, তখনই ঠিক ভাবে পেলাম রূপের পাত্রে রূপাতীত রস—চিত্রে আলোর আর কালোর ছন্দ দুলিয়ে দিলে প্রাণ, সঙ্গীতে সুর মিলল সুরাতীতের রেশটুকুতে, নর্তক দেখিয়ে গেল চলার পথ কোন সে অগম্য দেশে যুগল তারার কাছে গিয়ে ঠেকেছে! রূপসাধনা থেকে রূপমুক্তির সাধনা পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ হল শিল্পীর সিদ্ধিলাভের পথ, নান্যঃ পন্থাঃ!"

এই পথেই তিনি সাধনা করে গেছেন এবং সিদ্ধিলাভ করেছেন। নবজাগরণের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীতে তাঁর যথার্থ পরিচয় উদ্ভাসিত—"আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেয়া যেতে পারে, তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা-দান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাঙলা দেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।" (১৩ই জুলাই ১৯৪১)

অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-মালার কোন উল্লেখযোগ্য চিত্রপঞ্জী ও তালিকা আজও তৈরী হয়নি। সারা জীবনে তিনি যে কত চিত্র এঁকেছেন তার পরিমাপ এখনো হয়নি। বহু চিত্র এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর প্রকাশিত চিত্রের মধ্যে বিখ্যাত হোল 'ভারতমাতা', 'শাজাহানের শেষ জীবন', 'অশোকের রাণী', 'শাজাহানের তাজনির্মাণের স্বপ্ন', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'আলমগীর', 'অভিসারিকা' প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রায়ন বা অন্য লেখকের রচিত পুস্তকের বিষয় অবলম্বনে ইলাস্ট্রেশন অনবদ্য।

'মেঘদূত' অবলম্বনে তিনি কয়েকটি ছোট ছোট ছবি আঁকেন। কালিদাসের 'ঋতু সংহার'-এর চিত্রসমূহ তাঁর শিল্পীজীবনের শৈশবকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'চন্দ্রকলা' এই দুই কাব্যগ্রন্থের জন্ত তিনি কয়েকটি চিত্র রচনা করেন। স্কট ও কোনর সাহেবের 'চার্ম অফ কাশ্মীর' গ্রন্থের জন্ত তিনি ছয়খানি ছবি আঁকেন। যদিও তিনি কাশ্মীর যাননি তবু ধ্যানদৃষ্টিতে কাশ্মীরের যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অপূর্ব। এরপর তিনি ওমর খৈয়াম রচিত "রোবাইয়াৎ"-এর চিত্রায়ন করেন। তারপরে 'বাংলার রূপকথা' ও 'আরব্য উপন্যাসের' চিত্রাবলীতে তাঁর অলৌকিক কল্পনাশক্তি ও আঙ্গিকের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বও প্রকাশিত। তিনি শুধু শিল্পী নন, তিনি ছিলেন শিল্পজ্ঞানী। শিল্পশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। একজন্ই তিনি শিল্পশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরূপে জ্ঞানী গুণীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি গ্রন্থ—'ভারতশিল্প'। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—বাংলার ব্রত। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন'। বাংলা ১৩৫৪ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ'। গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে—'চীন ও ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম করেন এবং এক্ষেত্রে এই আলোচনাই এখনো অদ্বিতীয় হইয়া আছে।' ১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয় 'ভারতশিল্পে মূর্তি'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাণী বাগেশ্বরী' অধ্যাপকরূপে তিনি যে সব বক্তৃতা দান করেছিলেন তাই একত্রিত করে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'। এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'শিল্পায়ন'। (চৈত্র ১৩৬১ সালে প্রকাশিত)

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর যথার্থ শ্রদ্ধা এখনো নিবেদিত হয়নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প আমরা বিস্মৃত হয়েছি। তাঁর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। তাঁর বিরাট সৃষ্টিসম্পদ উদ্ধার করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে, তার মর্মগ্রহণ করতে হবে। তাঁর অমর সৃষ্টিমালা সর্বজন প্রদর্শনযোগ্য করার জন্তে স্থাপন করতে হবে আর্টগ্যালারী—অবনীন্দ্র চিত্র-সংগ্রহাগার, সে সংগ্রহালয় পরিগণিত হবে পবিত্র শিল্পতীর্থরূপে যেখানে কেবল মাত্র বাংলার নয়, ভারতের নয়, পরন্তু সারা বিশ্বের শিল্পরসিকবৃন্দ শ্রদ্ধাসহকারে প্রবেশ করবেন এক অপরূপ আনন্দলোকের পরিচয় লাভ করতে।

—পঞ্চানন সিংহ

১৯২১ সালের একটি অপরূপ স্মৃতি—কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষ, উৎসুক শ্রোতার দল নিঃশব্দে শুনছেন এক শিল্পীর ভাষণ, শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং স্যার আশুতোষ। চলতি কথার কুসুমে গাঁথা হয়ে চলেছে এক শিল্প প্রবন্ধ মালা—সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যার জুড়ি নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিচ্ছেন, পরে তাই একত্র করে প্রকাশিত হয় 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'।

একপোঁছ হাসি

পারস্যের কোন এক শাহ্ এসেছেন লণ্ডনের একটি ষ্টুডিয়োতে। একটি গাধার ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন।

—"এর দাম কত ?" শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—"হাজার পাউণ্ড"—উত্তর দিলেন শিল্পী।

—"হায় খোদা! আমি দেখছি তুমি নিজেই একটি গাধা। তা' না হলে একটা গাধার ছবির জন্য এমন অসম্ভব দাম চাইছ ? আরে, আমাদের দেশে এক পাউণ্ড দিলে একটা আসল গাধাই কেনা যায়!

* * * * *

ছেলেরা তাদের মৃত বাপের ছবি আঁকতে দিয়েছেন কোন শিল্পীকে। ছবিটি শেষ করে শিল্পী সেটি নিয়ে এলেন ছেলেদের কাছে।

বড় ছেলে বললে—"বাবার আসল রং কিন্তু এত ঘোরাল ছিল না।"

মেজো ছেলে বললে—"বাবার মুখও কিন্তু অত কর্কশভাবের নয়।"

ছোট ছেলে বললে—"ছবিতে যে দাগ দেখ্‌ছি, ওরকম দাগ ত বাবার মুখে ছিল না।"

বেচারা চিত্রকর এ সব কথা শুনে কি আর বলবে ? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে, "ভগবানকে ধন্যবাদ! আপনাদের মধ্যে কেউ তো একথা বললেন না যে আপনার বাবার গা দিয়ে কখনো এমন তিসির তেলের গন্ধ বেরোয় নি।"

* * * * *

দুষ্প্রাপ্য ছবির দোকানে গিয়ে এক ভদ্রলোক বিক্রেতাকে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, এ ছবিটার দাম কত ?"

—"আড়াই হাজার টাকা মশাই।"

এই কথা শুনে কিছু না বলেই তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ক'দিন পরে আবার তিনি এলেন সেই দোকানে, দাম জিজ্ঞাসা করলেন সেই ছবিটার।

—"আজ্ঞে, দু'হাজার দু'শ টাকা!"—উত্তর দিল দোকানদার।

—"হা' ভগবান, এযে দেখছি ঠিক গলাকাটা'র মতলব। ক'দিন আগে তুমিই না একশো টাকা কম চেয়েছিলে ?"

—"আজ্ঞে মশাই, দেখলেন না ছবিটার নিচের দিকটা ঝুলে পড়াতে এখন একটা ছাতার ঠেক্‌না দেওয়া হয়েছে। ঐ জন্যেই ত দামটা বেড়ে গেছে। আপনি ত জানেন, ছবি যত পুরানো আর ভাঙাচোরা হবে ততই তার দাম বাড়বে।

—"বটে! তবে নিয়ে এসত বাপু তোমার ছবিখানা একবার আমার কাছে। ঘা' কতক লাথি মেরে ছবিটাকে আরও ভাঙাচোরা করে দি, যাতে তুমি এর দাম লাখটাকা পেতে পার।"—কথাটা বলেই ভদ্রলোক ক্রোধে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

নতুন ভারত রচয়িতা

শিক্ষা বিস্তারে

সর্ব্বশক্তি নিয়োগ

প্রশংসনীয় কাজের জন্য যে শিক্ষকগণ ১৯৫৯ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন, মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ আর্কট জেলার বড়কলপতির, বোর্ড বুনিয়াদী স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীআম্বালাবনন্, তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

গত ৩০ বছর যাবৎ তিনি শিক্ষকতা করছেন এবং একজন শিক্ষকযুক্ত অনেক স্কুলকে, তিনি, বহু শিক্ষকযুক্ত স্কুলে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। এ ছাড়াও বড়ো কথা হ'ল শ্রীআম্বালাবনন্ এই কাজে গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা অর্জ্জন করতে সফল হয়েছেন।

শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিরলস কর্ম্মী শ্রীআম্বালাবনন্ তাঁর স্কুলে একটি মধ্যাহ্নকালীন খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্রও স্থাপন করেছেন।

শ্রীআম্বালাবননের মতো উৎসাহী ও কর্ম্মঠ শিক্ষকগণই জাতির প্রগতির জন্য দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করছেন। তাঁরা নতুন ভারত রচনাতেই সহায়তা করছেন।

পরিকল্পনা আনবে প্রাচুর্য্য

আনবে নিরাপত্তা

এর সাফল্যের জন্য কাজ করুন—সক্রিয় হউন

DA/80/265
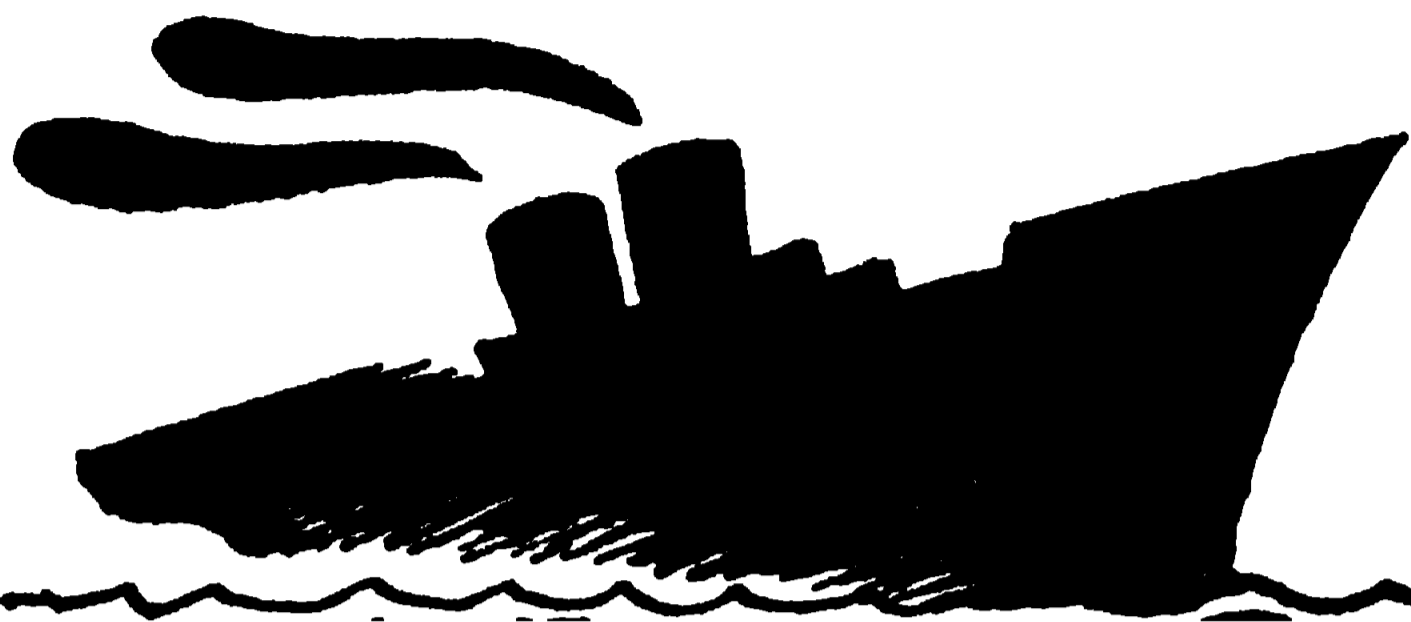
ভারতের হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী এখন, আফ্রিকা, আরব দেশ সমূহ, পূর্ব্ব এশিয়া ও অন্যান্য জায়গার বহু গৃহে সমাদৃত হচ্ছে। গত বছর ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের বস্ত্রসামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়।

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী উচ্চ গুণসম্পন্ন ব'লে এগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। একমাত্র নির্দ্দিষ্ট মানসম্পন্ন বস্ত্রাদি রপ্তানি করা সম্পর্কে যে পরিদর্শন-মূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে তা, এই উন্নতিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এডেন, কলম্বো, ব্যাঙ্কক, কুয়ালালাম্পুর ও সিঙ্গাপুরে সম্প্রতি হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রীর যে সব বিপণী খোলা হয়েছে, সেগুলিও, ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করছে।

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য্য যোগসূত্র

DA 60/347

এ্যাসকো সাবানে কাচাই সহজ

GALPA-BHARATI Bengali Monthly Regd. No C3643 Price Re. 1/- Phone : 55-3294 December 1960

Cover & Art plates printed by:—
KARTICK ART PRESS, CALCUTTA-12.